সাহিত্য ধারা

প্রথম সংস্করণ আগষ্ট ১৯৫৮

প্রকাশক | রমা ভট্টাচার্য | এ-১৮-এ কলেজ স্ট্রীট মার্কেট
কলকাতা-৭০০০০৭

মুদ্রক | পারুল প্রেস | ৩৮সি, রাজা দীনেন্দ্র স্ট্রীট |
কলকাতা-৭০০০০৯

ব্লক | টাইপোগ্রাফিক আর্টস | ৫৪।১বি পটুয়াটোলা লেন।
কলকাতা-৭০০০০৯

প্রচ্ছদ | ও. সি. গাঙ্গুলী
রেখাচিত্র | সর্বজিৎ সেন

সূচীপত্র

জীবনকে ভালবেসে

যাঁরা

জীবন উৎসর্গ করেছেন

সংগ্রামে

তাঁদেরই অমর স্মৃতির

উদ্দেশে

পাঁচটি মহাদেশের গল্পের সঙ্কলন 'অন্য আলো ভালবাসা'-র গ্রন্থন সূত্র ঃ প্রেম। মানুষের জীবনের এই একটি বোধকে কেন্দ্র করে যত চিন্তা-ভাবনা হয়েছে, সাংস্কৃতিক প্রয়াসের যে বিশাল অংশ তার পিছনে নিয়োজিত হয়েছে, আর কোনো বিমূর্ত বোধের বেলায় তা বোধহয় ঘটেনি। এর প্রধান কারণ হল সভ্যতার বর্তমান স্তরে প্রেমের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে আছে যৌন সম্পর্কের প্রশ্ন। ভাষান্তরে যাকে প্রাণসৃষ্টির ও অস্তিত্ব রক্ষার মৌল জৈবিক তাগিদ হিসেবে উল্লেখ করা যায়।

সাংস্কৃতিক জগতে 'প্রেম' শিল্পীর কাছে সর্বাপেক্ষা প্রিয় বিষয় হলেও সমাজ জীবনে তার প্রভাব সর্বদা শুভ হয়নি, অথবা তা যাতে শুভ না হয় তার জন্যে ইচ্ছাকৃত ভাবে প্রয়াস চালানো হয়েছে। এই অশুভ প্রভাব বিস্তারের প্রথম লক্ষণ প্রকাশ পায়, 'প্রেম'-কে সর্বজনীন, শাশ্বত ও সনাতনরূপে প্রতিপন্ন করার মধ্যে। দ্বিতীয়তঃ, প্রেমের প্রসঙ্গ উত্থাপন ক'রে শ্রেণী বৈষম্য লুপ্ত করার প্রচেষ্টায় বুর্জোয়া শাসক শ্রেণী সর্বদাই উদগ্রীব। দীন হীন কৃষক, মজুর জীবনেও যেমন প্রেম আছে, ধনী, জমিদার ও কলের মালিকের জীবনেও তাই আছে, অতএব—মৌলিক মানব চরিত্র এক, সেখানে শ্রেণী ভেদাভেদের অবকাশ নেই। এই ধরনের 'শাশ্বত, শ্রেণী ভেদাভেদহীন সাহিত্য' প্রসঙ্গে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের বলিষ্ঠ উচ্চারণ স্মরণযোগ্য ঃ

'চাষাভুষো নিয়ে গল্প লিখবো বাবুদের মনোরঞ্জনের জন্য, যারা দেহরক্ষার ব্যাপার অনেকটা সহজ করে মন নিয়ে কারবার করার অবসর পায়, এবং ওই অবসর-সোহাগী মনের খাতিরে একেবারে চেপে যাব চাষাভুষো পুরুষটা ও নারীটার অবসরহীন অকথ্য কঠোর দেহরক্ষার সংগ্রাম, অথচ রসসৃষ্টি করবো, একমাত্র ওই তুটি ভুখা

দেহের যৌন সম্পর্কের ভিত্তিতে—সাহিত্য সৃষ্টির এ ফাঁকি আজ অচল না হয়ে গেলেও ধরা পড়ে গিয়েছে।' (লেখকের কথা)

ইতিহাসে 'প্রেম' নামক এক বোধের উন্মেষ সম্বন্ধে সচেতন না হলে বিষয়টি চিরকালই বিভ্রান্তির কারণ হবে। পরিবার, বিবাহ, সম্পত্তি ও প্রেম—অবিচ্ছেদ্য বন্ধনে পরস্পর সম্পর্কিত। একটিকে বাদ দিয়ে অন্যটির স্বরূপ উদ্‌ঘাটন সম্ভব নয়। পরিবার ও সম্পত্তিগত কারণেই মানব ইতিহাসের অসভ্য অবস্থায় লক্ষ্য করা যায় দলগত বিবাহের রেওয়াজ, বর্বর যুগে জোড় পরিবার প্রথা এবং সভ্যতার যুগে একনিষ্ঠ বিবাহ প্রথা। এঙ্গেল্‌সের বর্ণনায়ঃ 'একনিষ্ঠ বিবাহ মূলক পারিবারিক প্রথা থেকে আধুনিক যুগের যৌনপ্রেমের উদ্ভব সম্ভব হলেও এর অর্থ এই নয় যে, কেবলমাত্র তা প্রধানতঃ এই পারিবারিক প্রথার মধ্যেই স্বামী ও স্ত্রীর পারস্পরিক টান ও ভালবাসারূপে আধুনিক যৌনপ্রেম উদ্ভূত হয়েছে। পুরুষ প্রভুত্বের অধীনে একনিষ্ঠ বিবাহে এই প্রেমের অবকাশ খুব কমই মিলতে পারে।···(বুর্জোয়াদের) দাম্পত্য জীবন আসলে বৈচিত্র্যহীন একঘেয়েমিতেই পর্যবসিত হয়, যদিও বিবাহিত জীবনকে ঘর-কন্নার সুখ স্বর্গরূপে কল্পনা করা হয়।···বাজারের সাধারণ বেশ্যা থেকে বিবাহিত নারীর পার্থক্য এই যে সে দিন মজুরের ঘণ্টা হিসাবে দেহ বিক্রয় না করে চিরদিনের জন্যে নিজেকে বিক্রয় করে গোলামে পরিণত হয়।···স্বামী স্ত্রীর মধ্যে যৌন প্রেম কেবলমাত্র নিগৃহীত শ্রেণী-গুলোর মধ্যে অর্থাৎ আজকালকার শ্রমিক শ্রেণীর মধ্যেই দস্তুরে পরিণত হতে পারে এবং হয়েছেও। এখানে চলতি একনিষ্ঠ বিবাহ প্রথার মূল ভিত্তিটাই ধ্বংস হয়ে গিয়েছে। যে সম্পত্তির রক্ষণাবেক্ষণ ও তার উত্তরাধিকার নির্ণয়ের জন্য একনিষ্ঠ বিবাহ ও পুরুষ প্রাধান্যের সৃষ্টি এখানে তার সম্পূর্ণ অভাব দেখা যায়।······

···আধুনিক যুগের ব্যক্তিগত পরিবার স্ত্রীর প্রকাশ্য বা প্রচ্ছন্ন পারিবারিক গোলামির উপরেই দণ্ডায়মান। ব্যক্তিগত পরিবার-গুলোকে অনুরূপে নিয়েই বর্তমান সমাজ সংগঠিত।···পরিবারের

ভিতর পুরুষ হচ্ছে বুর্জোয়া আর নারী গতর-খাটানো শ্রমিক।…
স্বামী ও স্ত্রী যখন পুরোপুরি সমান অধিকার লাভ করবে তখনই
আধুনিক পরিবারে স্ত্রীর উপর স্বামীর প্রাধান্যের বিশেষ রূপ ও
উভয়ের মধ্যে প্রকৃত সামাজিক সাম্যবিধানের প্রয়োজনীয়তা বিশেষ
ভাবে উপলব্ধি করা সম্ভব হবে। তখন সুস্পষ্টভাবে বুঝা যাবে যে
নারীর মুক্তিলাভের প্রধান শর্ত হচ্ছে এই যে, সমগ্র নারী জাতির
আবার সাধারণ শ্রমশিল্পের কাজে পুনপ্রবেশাধিকার লাভ ও তার
ফলে সমাজের অর্থনৈতিক অণু কেন্দ্র হিসাবে ব্যক্তিগত পরিবারকে
ভেঙে ফেলা।'

ফ্রেডারিক এঙ্গেল্‌স্‌-এর 'পরিবার, ব্যক্তিগত সম্পত্তি ও রাষ্ট্রের
উৎপত্তি' (মন্মথ সরকার অনূদিত) থেকে উদ্ধৃতি দীর্ঘ হলেও
তা বিশেষভাবে প্রণিধান যোগ্য। এরই মধ্যে উচ্চারিত হয়েছে
জীবনের সত্য—বর্তমান সমাজে চিরাচরিত জীবন-ধারায় অসহায়
নারীর কাছ থেকে বশ্যতা পাওয়া সম্ভব, প্রেম নয়। প্রেমের
উদ্ভব হয় দুটি অভিন্ন মন ও প্রাণের মধ্যে। যেখানে পারস্পরিক
প্রয়োজন স্বীকৃত। দাঁড়ের পাখি ভালবাসার বুলি কপচায়, আর
আকাশের পাখি জীবনের আনন্দে মধুর গানে মাতোয়ারা করে।
পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ থেকে আমরা যেসব গল্প নির্বাচন করেছি তাতে
এই মুক্তপ্রাণের ভালবাসাই চিত্রিত। ভালবাসা এখানে দৈনন্দিন
জীবনের বেড়াজালে, সঙ্কীর্ণ স্বার্থে জড়িয়ে শুধু জটিলতা আর
যন্ত্রণার মধ্যে বিলীন হয়ে যায় না। এখানে আমরা দেখতে পাই,
সংগ্রামী জীবনে যে গভীর ভালবাসার জন্ম তার শেষ সার্থকতা
শুধু সুখী শান্ত গৃহকোণে নেই, আছে বৃহত্তর জীবনে সংগ্রামের
শরিক হয়ে। এখানে কখনো দেখি রূঢ় বাস্তব, নিষ্ঠুর পরিবেশ টেনে
এনেছে দুটি দগ্ধ হৃদয়কে—জীবনসঙ্গী হিসেবে পরস্পরকে লাভ
করে তাদের সংগ্রামের প্রতিজ্ঞা দৃঢ়তর। আবার অন্যত্র দেখি
সার্থক ভালবাসাও কেমন সমাজ ব্যবস্থার সৌজন্যে তিল তিল
করে মৃত্যুবরণ করেছে। সার্থক কি অসার্থক, প্রতিটি গল্পই প্রেমের

গল্প—সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক সংগ্রামের সঙ্গে অবিচ্ছেদ্য জীবনের অদম্য প্রেমের কাহিনী।

এই ভূমিকা অসম্পূর্ণ থেকে যাবে যদি ইথেল ও জুলিয়াস রোজেনবার্গের বীরত্বপূর্ণ জীবন ও অমর প্রেমের কথা এই প্রসঙ্গে স্মরণ না করা হয়। বস্তুতপক্ষে, 'রোজেনবার্গ পত্রগুচ্ছ,' 'ডায়েরি অফ অ্যানি ফ্র্যাঙ্ক', ভান্দা ভাসিলিয়েভাস্কার 'ভালবাসা', অ্যালবার্ট মাল্ট্স-এর 'জীবন অদম্য' ও চেক শিল্পী ওসতেনসাকের 'রোমিও জুলিয়েট অ্যাণ্ড ডার্কনেস' নামক বইগুলির সঙ্গে এক সারিতে স্থান করে নেবে 'অন্য আলো ভালবাসা', সম্পাদক হিসাবে এই প্রত্যয় আমাদের দৃঢ়।

আমাদের পূর্ববর্তী গ্রন্থ 'প্রতিবেশী সূর্যের রক্তাক্ত দিনগুলি'র অন্যতম সম্পাদক কমলেশ সেনকে সম্পাদক হিসাবে না পেলেও তাঁর সহযোগিতা ও পরামর্শ আমরা সর্বদাই লাভ করেছি। তাঁর কাছে আমরা কৃতজ্ঞ। কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি নির্মল ব্রহ্মচারীকেও সতত অনুপ্রেরণা দেবার জন্য। আর যথারীতি এবারেও আমরা র‍্যাডিকাল বুক ক্লাবের বিমল দা'র কাছ থেকে উৎসাহ পেয়েছি। সর্বজন শ্রদ্ধেয় শিল্পী ও, সি, গাঙ্গুলী সেই ও, সি-দা হয়েই এবারেও আমাদের পাশে এসে দাঁড়িয়েছেন। আর যাঁর কথা উল্লেখ না করলেই নয়, তিনি নন্দদুলাল মণ্ডল। তাঁর ঐকান্তিক ইচ্ছা ও সহযোগিতা ব্যতীত এই গ্রন্থ প্রকাশ সম্ভব হত না। তাছাড়া অনুবাদকরা প্রত্যেকে যে আন্তরিকতা নিয়ে তাঁদের কাজ করেছেন তা সর্বদাই স্মরণযোগ্য।

রাশিয়া

একটি শরৎ সন্ধ্যা

ম্যাক্সিম গোর্কি

শরৎকালের কোন এক সন্ধ্যাবেলা একবার অত্যন্ত মুস্কিলে পড়েছিলাম। একটি শহরে সবেমাত্র গিয়ে পেঁাছেছি, কাউকে চিনি না। একেবারে কপর্দহীন, মাথা গুঁজবার ঠাঁই পর্যন্ত নেই।

প্রথম কয়েকদিনের মধ্যেই বাড়তি জামা কাপড় সব বিক্রি ক'রে শহর ছেড়ে শহরতলীর দিকে রওনা হলাম। শহরতলিটীর নাম উস্তি। জাহাজ চলাচলের মরশুমে উস্তির জাহাজ ঘাটাগুলো কর্মব্যস্ত হ'য়ে ওঠে। কিন্তু এখন অক্টোবরের শেষ—জায়গাগুলো নিস্তব্ধ, জনমানবহীন।

দুই পায়ে ভিজে বালি ঠেলে শূন্য বাড়ি আর দোকানের ভেতর দিয়ে চলেছি; খুব মনোযোগ দিয়ে দেখছি রুটির টুকরো টাকরা যদি কোথাও মেলে; আর যেতে যেতে ভাবছি, পেট ভরে খেতে পাওয়াটা কত বড় ভাগ্যের কথা।

বর্তমানের এই সভ্যতায় দেহের খিদের চাইতে মনের খিদে মেটে অনেক সহজে। রাস্তা দিয়ে হাঁটতে গেলেই চোখে পড়বে নানা ধরনের বাড়ি, বাইরে থেকে দেখতে ভারী চমৎকার, ভেতরটাও নিশ্চয় সেই রকম। ব্যস, এর পর ভাস্কর্য, স্বাস্থ্য বা যে কোন গুরুগম্ভীর বিষয় নিয়ে আপনি স্বচ্ছন্দে বেশ সুখকর চিন্তার জাল বুনে

চলতে পারেন। পথে যেতে যেতে যে সব কেতাদুরস্ত ফিটফাট পোশাক পরা ভদ্রলোক দেখতে পাবেন, তারা কিন্তু আপনাকে এড়িয়েই চলবে, কোনমতে দেখতে না পেলেই তারা খুশী হবে। বাস্তবিকই, একজন সম্পন্ন লোকের চাইতে ক্ষুধার্ত লোকের চিন্তার খোরাক জোটে অনেক বেশী। এ থেকে সম্পন্ন লোকদের স্বপক্ষে একটা মনোমত সিদ্ধান্ত টানা যায়।···

সন্ধ্যা ঘনিয়ে আসছে। বৃষ্টি পড়ছে তখনও। উত্তরে দমকা বাতাস সোঁ সোঁ শব্দে শূন্য দোকান পাটের ভেতর দিয়ে বয়ে গিয়ে হোটেলের বন্ধ জানালাগুলির ওপর আঘাত করছে। সমুদ্রের বালু-বেলায় সশব্দে আছড়ে পড়ছে বিক্ষুব্ধ নদীর ঢেউগুলি। পরস্পর সংঘর্ষে ফেনিল ঢেউগুলি ছুটে চলেছে দূরের অন্ধকারে। যেন বুঝতে পেরেছে শীত আসছে ; তাই ভয় পেয়ে পালাচ্ছে, কি জানি যদি উত্তুরে বাতাস সেই রাতেই তাকে বরফ দিয়ে বেঁধে ফেলে! কেমন যেন ভারী হয়ে নুয়ে পড়েছে আকাশটা, আর সমানে বৃষ্টি হচ্ছে গুঁড়ি গুঁড়ি।

জরাজীর্ণ, শুকনো, বাঁকাচোরা উইলো গাছগুলি আর তাদেরই গুঁড়ির কাছে টেনে তোলা একটি নৌকো···আমার চারপাশে কেমন একটা ম্লান পরিবেশ।

তলাভাঙা নৌকো আর শীতের বাতাসে মরমরিয়ে ওঠা করুণ প্রাচীন গাছ···সমস্ত কিছুই জীর্ণ, নিষ্ফল, মৃত। আকাশ কেঁদে চলেছে অবিশ্রান্ত। চারপাশে শুধু বিষণ্ণ শূন্যতা, মনে হ'ল, এই মৃত পরিবেশে আমিই একমাত্র প্রাণময়। আমিও যেন অনুভব করলাম প্রতীক্ষমাণ মৃত্যুর হিমশীতল স্পর্শ!

আমার বয়স তখন সবেমাত্র সতেরো, যাকে বলে দীপ্ত যৌবন! ঠাণ্ডা আর ভিজে বালির ওপর দিয়ে হেঁটে চললাম। শীতে আর খিদের চোটে দাঁতে দাঁত লেগে কেমন কড় কড় শব্দ হচ্ছে। খাবারের জন্য মিছিমিছি খোঁজাখুঁজি করতে গিয়ে হঠাৎ নজরে পড়ল,

মেয়েদের পোশাক পরে গুটিসুটি মেরে কে যেন বসে আছে। তার আনত গ্রীবায় বৃষ্টিতে ভেজা কাপড় লেপটে রয়েছে। তার ওপর দিয়ে ঝুঁকে পড়ে দেখতে চেষ্টা করলাম, কি করছে সে। দেখলাম, কোন একটা দোকানের তলায় নাগাল পাবার জন্য দু'হাত দিয়ে বালি খুঁড়ছে।

'এ্যাই! ওকি হচ্ছে?' ঝুঁকে পড়ে জিজ্ঞাসা করলাম।

একটা অস্ফুট আর্তনাদ ক'রে লাফিয়ে উঠল সে। তার আয়ত ধূসর চোখ মেলে কেমন ভয়ার্ত দৃষ্টিতে আমার দিকে তাকাল। দেখলাম, আমারই সমবয়সী একটি মেয়ে। বেশ সুন্দর মুখখানি। কিন্তু তিনটি গভীর ক্ষত সে মুখের সমস্ত সৌন্দর্য নষ্ট ক'রে দিয়েছে। ক্ষতগুলি কিন্তু বেশ মানানসই, দুই চোখের নীচের দুটি একই ধরনের; আর একটি নাকের ওপরে—কপালে, একটু বড়। যেন মানুষের মুখ কুৎসিত করার কাজে দক্ষ কোন শিল্পীর হাতের কাজ।

মেয়েটি আমার দিকে তাকাল। মনে হল ভয়ের ভাবটা কেটে গেল আস্তে আস্তে। হাতের বালিগুলো ঝেড়ে ফেলল। তারপর মাথার রুমালটা ঠিক ক'রে ঘাড়টা একটু নাড়িয়ে প্রশ্ন করল ঃ

'তোমারও বুঝি খিদে পেয়েছে? তুমিও খোঁড়ো না! ব্যথা হ'য়ে গিয়েছে আমার হাত দুটো। এখানটায় নিশ্চয়ই রুটি আছে। দোকানটা এখনও উঠে যায়নি।'

খুঁড়তে শুরু করলাম আমি। কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে ও দেখল। তারপর আমার পাশে বসে সাহায্য করতে লাগল।

নিঃশব্দে কাজ ক'রে চললাম আমরা। বিচার, নীতিবোধ, সম্পত্তির অধিকার, বা অন্য কোন বিষয়—প্রাজ্ঞ ব্যক্তিরা জীবনের প্রতি মুহূর্তে যা স্মরণ রাখতে বলেন তার কোন কিছু সে সময় আমার স্মরণে ছিল কি না, আজ আর তা বলতে পারব না। সত্যি কথা বলতে কি, অস্বীকার করব না, সে সময় এত মনোযোগ দিয়ে বালি

খুঁড়ছিলাম যে কোন কিছুই মনে ছিল না, শুধু একমাত্র চিন্তা, দোকানটাতে কি পাওয়া যেতে পারে।

আর একটু সন্ধ্যা হতেই আমার চারপাশে অন্ধকার গাঢ় হ'য়ে এল ; ঠাণ্ডা, স্যাঁতসেঁতে আর গা ছমছমে অন্ধকার। ঢেউগুলির গর্জন যেন মন্দীভূত হয়ে এসেছে বলে মনে হল। কিন্তু দোকানের ঝাঁপগুলোর ওপর বৃষ্টি পড়ছে অবিশ্রান্তভাবে, আরও জোরে, আরও শব্দ ক'রে।···এর মধ্যেই রাতের পাহারাওয়ালার হাঁক শোনা গেল।

সঙ্গিনীটি অস্ফুটস্বরে জিজ্ঞাসা করল : 'মেঝে আছে তো ?'

বুঝতে পারলাম না কি বলছে, চুপ ক'রে রইলাম।

'মেঝে! দোকানটার মেঝে আছে তো? যদি না থাকে আমাদের সমস্ত খাটুনিই জলে গেল। গর্ত তো খুঁড়লাম। কিন্তু তারপর যদি দেখি শক্ত শক্ত ভারী ভারী পাটাতন, সেগুলো আলগা করব কেমন ক'রে? তার চেয়ে বরঞ্চ তালাটা ভেঙে ফেলি। তালাভাঙা কি আর এমন ব্যাপার!'

মেয়েমানুষের মাথায় ভাল মতলব বড় একটা আসে না ; কদাচিৎ মাঝে মাঝে আসে। ভাল মতলবের কদর আমি চিরকালই ক'রে এসেছি, আর যতদূর সম্ভব তার সুবিধাটুকু নেবার চেষ্টা করেছি।

তালাটা ধরে জোরে টান দিতেই কড়া সুদ্ধ খুলে এল। সঙ্গিনীটি তৎক্ষণাৎ ঝুঁকে পড়ে সাপের মত তরতরিয়ে খোলা দরজা দিয়ে ঢুকে গেল। পরক্ষণে ভেতর থেকে উৎসাহিত কণ্ঠ ভেসে এল : 'ঠিক আছে!'

পুরোনো বক্তাদের সমস্ত পারদর্শিতাও যদি কোন পুরুষের থেকে থাকে, তার স্তুতিগানের চাইতেও আমার কাছে কোন মেয়ের অতি তুচ্ছ প্রশংসা ঢের বেশী কাম্য। কিন্তু এখনকার মত এতখানি মর্যাদা তখন আমি তাদের দিতাম না। তার বাহবায় কান না দিয়ে রূঢ় ব্যগ্র কণ্ঠে প্রশ্ন করলাম : 'কিছু আছে ?'

গড়গড় ক'রে সে তার আবিষ্কারের ফিরিস্তি দিতে শুরু করল ঃ

'একঝুড়ি বোতল, খালি থলে, একটা লোহার বাটি।'

কিন্তু এগুলো খাবার জিনিস নয়! সমস্ত আশাই গেল বুঝি। হঠাৎ সে উত্তেজনায় চেঁচিয়ে উঠল ঃ 'আঃ, এই যে—!'

'কি ?'

'রুটি।···পাউরুটি। একটু ভিজে শুধু···এই নাও!'

পায়ের কাছে একটা পাউরুটি গড়িয়ে এল। পেছনে পেছনে এল আমার দুঃসাহসী সঙ্গিনী। ততক্ষণে এক টুকরো রুটি ছিঁড়ে চিবোতে শুরু ক'রে দিয়েছে।···

'আমাকে এক টুকরো।···এবার এখান থেকে বেরুনো উচিত। কিন্তু কোথায় যাবো ?'

চারদিকে উঁকি মেরে মেয়েটি সিক্ত শব্দময় অন্ধকারের দিকে তাকাল।

'পাড়ের ওপর একটা নৌকো তোলা আছে। যাবে সেখানে ?'

'চল।'

পথে যেতে যেতে আমাদের লুটের মাল ছিঁড়ে মুখে পুরতে লাগলাম।

মুষলধারে বৃষ্টি পড়ছে। দূরে নদীর গর্জন। বহু দূর থেকে একটানা শিসের শব্দ ভেসে আসছে, বিদ্রূপের মত ; কোন বেপরোয়া দানব যেন ব্যঙ্গ করছে পৃথিবীর সমস্ত কিছুকে, শরতের এই হতভাগা সন্ধ্যাকে—তার এই দুটি নায়ক-নায়িকাকে। কেমন যেন খচখচ ক'রে উঠল বুকের ভেতরটা। আমি ও আমার সঙ্গিনীটি তবু আকণ্ঠ খেলাম। আমার বাঁ পাশে হেঁটে চলেছে সে।

'কি নাম তোমার ?' কি জানি কেন তাকে জিজ্ঞাসা করলাম।

শব্দ ক'রে চিবোতে চিবোতে উত্তর দিল ঃ 'নাতাশা।'

তার দিকে তাকাতেই সমস্ত বুকটা যেন ব্যথায় মোচড় দিয়ে উঠল। সামনের অন্ধকারের দিকে চোখ ফেরালাম ; মনে হ'ল

আমার নিয়তির ব্যঙ্গমুখ, আমার দিকে চেয়ে দুর্বোধ্য আর নিষ্ঠুর হাসি হাসছে।

নৌকোর ওপর বৃষ্টির অবিশ্রান্ত করুণ শব্দ ; মনটা বিষণ্ণ হ'য়ে উঠল। নোকোর তলে একটা ভাঙা গর্তে বাতাস ঢুকে কেমন হিস্‌হিস্ শব্দ হচ্ছে ; অশান্ত করুণ শব্দে কেঁপে কেঁপে উঠছে একটা আলগা কাঠের টুকরো। একঘেয়ে আর হতাশ গর্জনে ঢেউগুলি তীরের ওপর আছড়ে পড়ছে ; যেন ভীষণ পরিশ্রান্ত এক ভগ্নদূত, —বিরক্তিকর আশাভঙ্গের কাহিনী গোপনের ইচ্ছা সত্ত্বেও না শুনিয়ে যেন উপায় নেই।

নদীর গর্জন আর বৃষ্টির শব্দ মিশে পৃথিবীর একটানা দীর্ঘশ্বাসের মতো শোনাতে লাগল। উষ্ণ উজ্জ্বল গ্রীষ্মের পরেই স্যাঁতসেঁতে কুয়াশাচ্ছন্ন শরৎ—অনাদি অনন্তকালের এই নিয়মে বিষণ্ণ, ক্ষুব্ধ হয়ে উঠেছে যেন পৃথিবী। শূন্য তীর, ফেনিল নদীর ওপর দিয়ে বাতাস বয়ে চলেছে ম্লান বিষণ্ণ গান গেয়ে।

নোকোর ভেতর আস্তানা নিয়ে একটুও আরাম পেলাম না। কেমন সংকুচিত আর স্যাঁতসেঁতে। তলার ফুটো দিয়ে বৃষ্টির ঠাণ্ডা ছাঁট আর বাতাস আসছে। নিঃশব্দে বসে শীতে ঠক্‌ঠক ক'রে কাঁপতে লাগলাম। ঘুম পাচ্ছে ভীষণ। নৌকোর ধারে পিঠ দিয়ে বসল নাতাশা। কুঁকড়ে গোল হ'য়ে একেবারে এতটুকু হ'য়ে গিয়েছে। হাঁটু দুটো জড়িয়ে ধরে তার ওপর থুতনিটি রেখে আয়ত চোখে নদীর দিকে তাকিয়ে রইল। ক্ষতগুলির জন্য তার পাণ্ডুর মুখে চোখ দুটি মস্ত বড় বড় মনে হচ্ছে। নিশ্চল স্থাণুর মত বসে রয়েছে নাতাশা, কেমন যেন ভয় ভয় করল আমার। ভাবলাম, কথা বলি, কিন্তু কি বলে আরম্ভ করব বুঝতে পারলাম না।

সে-ই প্রথমে কথা বলল।

'কী অভিশপ্ত জীবন!' বেশ পরিষ্কার, ভেবে-চিন্তে অখণ্ড বিশ্বাসে সে তার মত ব্যক্ত করল।

নালিশ নয়। গলার স্বরে বেশ নির্লিপ্ততা ফুটে উঠল। এ বিষয়ে চিন্তা ক'রে একটা স্থির সিদ্ধান্তে সে পোঁছেছে মাত্র। তার কথায় সে সেটাই ব্যক্ত করল। তার কথা অস্বীকার করতে গেলে নিজেরই বিরুদ্ধতা করতে হয়, তাই চুপ করে রইলাম। স্থাণুর মত বসে রইল সে, আমাকে লক্ষ্যই করেনি যেন।

'যদি মরতে পারতাম!'

আবার কথা বলল নাতাশা। বেশ শান্ত ও চিন্তিত সুরে। এবারও কথার সুরে নালিশের চিহ্নমাত্র নেই। স্পষ্টই বোঝা গেল, জীবন সম্বন্ধে চিন্তা ও নিজের কথা বিবেচনার পর এই সিদ্ধান্তই সে করেছে। জীবনের ব্যর্থতা থেকে বাঁচতে হ'লে তার কথামত মৃত্যু ছাড়া আর অন্য পথ নেই।

তার এই চিন্তার স্বচ্ছন্দতায় রীতিমত পীড়িত হ'য়ে উঠলাম। মনে হ'ল, আর যদি চুপ ক'রে থাকি তাহ'লে নিশ্চয় কেঁদে ফেলব। একজন স্ত্রীলোকের সামনে খুব কেলেঙ্কারি ব্যাপার হবে সেটা, বিশেষতঃ, সে যখন কাঁদছে না। ঠিক করলাম, কথাবার্তায় ব্যস্ত রাখব তাকে।

'তোমায় মারল কে?' নাতাশাকে জিজ্ঞাসা করলাম। এর চাইতে ভাল কিছু বলার পেলাম না।

'পাশকা।' কেমন শান্ত স্বর, প্রতিধ্বনির মত শোনাল।

'কে সে?'

'আমার প্রেমিক। এক রুটিওয়ালা।'

'প্রায়ই মারে নাকি তোমাকে?'

'মাতাল হলেই মারে।'

হঠাৎ আমার কাছে ঘেঁষে এল সে। তারপর বলতে শুরু করল তার নিজের কথা, পাশকার কথা, তাদের দু'জনের সম্পর্কের কথা। নাতাশা এক সাধারণ গণিকা। লাল গোঁফওয়ালা সেই রুটিওয়ালা খুব চমৎকার হারমোনিয়াম বাজাতে পারত। তাদের বাড়িতে যেত

সে। নাতাশা তাকে খুব পছন্দ করত। ভারী হাসিখুশি আর ফিটফাট। গায়ে পনেরো রুবলের কোট, আর পায়ে জরির কাজকরা জুতো ; এই জন্যই নাতাশা তার প্রেমে পড়ে গেল। পাশকা তার পুরুষ হ'ল। এর পর থেকেই নাতাশাকে মিষ্টি খাবার জন্য কেউ পয়সা দিলে, তা ছিনিয়ে নিতে শুরু করল। তাই দিয়ে সে মদ খেত। নাতাশাকে ধরে ধরে মারত। সব চাইতে জঘন্য ব্যাপার, নাতাশারই চোখের সামনে অন্য মেয়ে নিয়ে সে ফুর্তি শুরু ক'রে দিল।

'দুঃখ হয় না এতে ? আমি কি কারও চাইতে কম ? বদমাইসটা আমাকে স্রেফ বোকা বানিয়েছে। পরশু বাড়িউলীর কাছ থেকে বেড়াবার ছুটি নিয়ে তার বাড়িতে এলাম। দেখি মদে চুর হ'য়ে ছুকা বসে আছে তার সঙ্গে। পাশকারও একই অবস্থা। চিৎকার ক'রে উঠলাম—বদমাইস, জোচ্চর ! বেদম মার দিল আমায়, লাথি মেরে চুল টেনে নানা রকমে নির্যাতন করল। এতেও কিছু মনে করতাম না আমি, কিন্তু আমার জামা-কাপড়গুলো ছিঁড়ে দিল। এখন আমি কি করি ? কেমন ক'রে বাড়িউলীর কাছে যাই ? আমার সমস্ত কিছু ছিঁড়ে দিয়েছে সে ···জামা···জ্যাকেট···একেবারে নতুন ! মাথা থেকে রুমালটা টেনে নিয়েছে। ভগবান। কি হবে আমার !'

অসহ্য যন্ত্রণায় নাতাশা ভাঙা গলায় ফুপিয়ে কেঁদে উঠল হঠাৎ।

বাতাসের গর্জন কানে এল। আগের চাইতেও ঠাণ্ডা আর ধারালো বাতাস। আমার এত কাছে ঘেঁষে বসল নাতাশা যে সেই অন্ধকারেও তার জ্বলে ওঠা চোখ জোড়া স্পষ্ট দেখতে পেলাম।

'কী শয়তান তোমাদের এই পুরুষ জাত। ইচ্ছে করে দুই পায়ে মাড়িয়ে একেবারে পঙ্গু ক'রে ফেলি। চোখের সামনে কোন পুরুষকে মরতে দেখলেও দয়া করব না এতটুকুও, তার মুখে থুথু দিয়ে দেব। জঘন্য ছোটলোক ! ঘৃণ্য কুকুরের মত লেজ নেড়ে তোমরা আমাদের মন ভোলাও। তারপর বোকার মত যখন তোমাদের কাছে ধরা

দিই, তখন আমাদের দুই পায়ে মাড়িয়ে চলে যাও। ছোটলোক। লম্পট।'

প্রচুর গালাগাল দিল। কিন্তু মোটেই ঝাঁজ ছিল না সে-গালাগালে। যা শুনলাম তাতে 'ছোটলোক লম্পট'দের ওপর তার দ্বেষ বা ঘৃণা আছে বলে মনে হ'ল না। তার বক্তব্যের সঙ্গে গলার সুরের কোন সঙ্গতি ছিল না। কেমন শান্ত, একটানা সুরে সে বলে যাচ্ছিল। তখনকার দিনে দুঃখিনী বারবনিতা সম্বন্ধে বাকচাতুর্যে জোরালো বই বা বক্তৃতা অনেক পড়েছি এবং শুনেছি ; কিন্তু তাদের চাইতে নাতাশার কথা আমায় স্পর্শ করল বেশী। তার কারণ, একেবারে হুবহু, সাহিত্যোচিত মৃত্যু বর্ণনার চাইতে সত্যিকারের মৃত্যু আরও বেশী স্বাভাবিক, আরও বেশী সংবেদনশীল।

আমার অবস্থা এ-দিকে সাংঘাতিক, সঙ্গিনীর কথায় নয়, শীতে। অস্ফুটস্বরে গোঙাতে গোঙাতে দাঁতে দাঁত ঘষতে লাগলাম।

প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই দুটি নরম ঠাণ্ডা হাতের স্পর্শ অনুভব করলাম ; একটি গলায় আর একটি মুখের ওপর নেমে এল ; সেই সঙ্গে কানে এল ব্যাকুল কোমল স্নেহের সুর ঃ 'কি হয়েছে ?'

অন্য কেউ জিজ্ঞাসা করলে বিশ্বাস হ'ত। কিন্তু নাতাশা! এই মুহূর্তে যে বলল সমস্ত পুরুষই শয়তান, তারা নিঃশেষ হ'লে সে খুশী হয়!

কিন্তু ব্যস্ত হ'য়ে সে প্রশ্ন শুরু ক'রে দিল, 'কি হ'ল, এ্যাঁ? ঠাণ্ডায় জমে যাচ্ছ নাকি ? কী অদ্ভুত ছেলে বাবা! প্যাঁচার মত চুপচাপ বসে আছে। এতক্ষণ বলনি কেন ঠাণ্ডা লাগছে ? এস···শুয়ে পড়··· হাত পা ছড়িয়ে দাও ; আমিও শুচ্ছি···এই তো! ব্যস্, এবার দু' হাত দিয়ে আমায় জড়িয়ে ধর—জোরে। এইবার গরম হয়ে উঠবে ঠিক···তার পর আবার আমরা পেছন ফিরে শোবো এখন। কোনমতে রাতটা কাটিয়ে দেওয়া আরকি! আচ্ছা, মদ খেয়েছিলে

বুঝি তুমি ?··· চাকরি থেকে তাড়িয়ে দিয়েছে ?···কি আর হয়েছে তাতে ?’

সান্ত্বনা দিল আমায়, উৎসাহ দিল।

কী লজ্জার কথা। সমস্ত ঘটনাটাই যেন আমার প্রতি একটা বিদ্রূপ। মানুষের ভবিষ্যৎ নিয়ে আমি রীতিমত চিন্তা করি সে সময়; সমাজ ব্যবস্থার পুনর্গঠন আর রাজনৈতিক উত্থানের স্বপ্ন দেখি; লেখকরাও যে সব অদ্ভুত পাণ্ডিত্যপূর্ণ বইয়ের গভীরতার হদিস পেতেন না, সব পড়ে ফেলেছি তখন! সক্রিয় ও গুরুতর এক শক্তি হিসাবে গড়ে তুলেছি নিজেকে; আর আমাকে কি না এক সাধারণ গণিকা তার দেহের তাপে গরম ক’রে তোলবার চেষ্টা করছে! নামহীন, গোত্রহীন, কদর্য বিতাড়িত এক জীব। আগে সাহায্য না করলে তার সাহায্যের কথা আমি ভাবতেও পারতাম না; যদি ভাবতামও, সাহায্য আমি কিছুতেই করতে পারতাম না। আঃ, সমস্ত ব্যাপারটাকে একটা অদ্ভুত দুঃস্বপ্ন বলে যদি ভাবতে পারতাম!

কিন্তু হায়, কেমন ক’রে ভাবব? বৃষ্টির ঠাণ্ডা ফোঁটা গায়ে এসে পড়ছে, একটি মেয়ের বুক সজোরে চেপে রয়েছে আমার বুকে, মুখের ওপর তার গরম নিঃশ্বাস···ভদকার মৃদু গন্ধ···কী প্রাণমাতানো! বাতাসের গর্জন, বৃষ্টির ঝম্‌ঝমানি, ঢেউএর আছড়ে পড়া শব্দ আর পরস্পরকে প্রাণপণে জড়িয়ে ধরেও শীতে কাঁপছি আমরা! এ সবই নিদারুণভাবে বাস্তব। তবু আমি ঠিক জানি, এই বাস্তবকে ভয়ংকর দুঃস্বপ্নেও কেউ কোনদিন কল্পনা করেনি।

নাতাশা কথা বলে চলল মমতা আর দরদ দিয়ে; এমন মমতা আর দরদ মেয়েরাই শুধু দেখাতে পারে। তার সেই সরল আন্তরিক কথার গুণে মনের কোথায় যেন একটু আগুন জ্বলে উঠল; মনের অনেক কিছুই গলে গেল সে আগুনে।

চোখ দিয়ে অঝোরে জল পড়তে লাগল। সেই রাত্রির অনেক

আগে থেকে, মনের মধ্যে যত কিছু পাপ, মূঢ়তা, অস্থিরতা আর নোংরামি জমে উঠেছিল, সমস্ত ধুয়ে মুছে গেল সেই চোখের জলে।

নাতাশা আমায় সান্ত্বনা দিতে লাগল।

'এই যে, লক্ষ্মীটি, চুপ···চুপ ; কেঁদো না। ঈশ্বরের করুণায় ঠিক হয়ে যাবে সব···আবার একটা চাকরি জুটে যাবে।'

অজস্র উষ্ণ চুম্বনে নাতাশা ভরে দিল আমায়।

নারীর চুম্বন—জীবনে সেই প্রথম ও শ্রেষ্ঠ চুম্বন! পরে যা পেয়েছি তার জন্য নিদারুণ মূল্য দিতে হয়েছে, কিন্তু প্রতিদানে মেলেনি কিছুই।

'কাছে এস! চুপ···চুপ···বোকা! কাল যদি যাবার জায়গা না থাকে, আমি দেখব তখন!···'

অস্ফুট কোমল মিনতি কানে এল, মনে হ'ল যেন স্বপ্ন!

ভোর পর্যন্ত পরস্পরকে জড়িয়ে ধরে শুয়ে থাকলাম আমরা।

সকাল হ'লে নৌকো থেকে গুড়ি মেরে বেরিয়ে শহরে চলে এলাম। বিদায় নিলাম বন্ধুর মত। তারপর কোনদিনও আর দেখা হয়নি তার সঙ্গে।

পরে নোংরা অলিতে গলিতে ছ মাস ধরে প্রিয় নাতাশাকে খুঁজে বেড়িয়েছি, যার সঙ্গে সেই শরতের রাত্রি কাটিয়েছিলাম আমি।

যদি তার মৃত্যু হয়ে থাকে, সব চাইতে তাই-ই ভাল তার পক্ষে, তার আত্মা শান্তি পায় তাহলে। আর যদি আজও সে বেঁচে থাকে, যেন সুখে থাকে ; তার পদস্খলনেব কথা কোনদিনও যেন মনে না জাগে। অযথা কষ্টই সার হয় তাতে, কোন লাভ হয় না জীবনে।

অনুবাদ। নীহার দাশগুপ্ত

জারোস্লাভ হাসেক

—হুম্, এখন বুঝছ তো ? ম্যাজিস্ট্রেট মারিক খুব নরম সুরে বললেন অ্যাডেমেককে।

অ্যাডেমেক এক যুবতী, যথেচ্ছ ভাবে রাস্তায় ঘুরে বেড়ানোর অপরাধে পনের দিনের জন্য ওর সাজা হয়েছিল। আজ ও ছাড়া পাবে।

—শোনো অ্যাডেমেক, ম্যাজিস্ট্রেট মারিক কথার খেই ধরেন, তুমি যদি ওই বাউণ্ডুলে র‍্যাকের সঙ্গে দিনের পর দিন এমনি উদভ্রান্তের মত রাস্তায় রাস্তায় ঘুরে বেড়াতে তাহলে কোথায় গিয়ে তোমাকে আজ দাঁড়াতে হত বলতো ? তোমার ছাড়পত্র তৈরী। ভুলে যেওনা এখনো তোমার বয়স আছে। ইচ্ছে করলেই কিন্তু বর্তমান অবস্থাটাকে তুমি পালটাতে পার। থাক ওকথা। বলতো, র‍্যাকের সঙ্গে তোমার সম্পর্কটা কি ?

আমি ওকে ভালবাসি হুজুর—অ্যাডেমেক উত্তর দিল।

—তুমি র‍্যাককে ভালবাস ? বেশ বেশ। খুব সুবিবেচকের মত ব্যাপারটাকে দেখেছ দেখছি। গম্ভীরভাবে বললেন ম্যাজিস্ট্রেট। তবু সব অবস্থাটাকে আরো একবার ভাল করে ভেবে দেখতে বলছি। ও নিশ্চয় তোমাকে বিয়ে করতে যাবে না। কেননা তোমার বয়স প্রায় তিরিশ আর ওর হল মাত্র কুড়ি বছর। এছাড়া অন্য দিকেও

অনেক কিছু ভাববার আছে। আচ্ছা, কখনও কি ভেবে দেখার চেষ্টা করেছ, র‍্যাক কি ধরনের লোক? এর মধ্যেই ডাকাতি করার অপরাধে ওর দু'বছরের সাজা হয়েছে। এ কথা তুমি নিশ্চয়ই বিশ্বাস করবে, ওর মত লোকের সঙ্গে জীবন জড়িয়ে কারুর ভবিষ্যৎ কখনও উজ্জ্বল হতে পারে না। তুমি জান, আমি তোমার প্রতি একটু বেশিই স্নেহপ্রবণ, যদিও এই বয়সেই তুমি তিন তিনবার জেল খেটেছ। তবু যতখানি সম্ভব আমি তোমাকে বোঝানোর চেষ্টা করব যে, কোন কিছুই নষ্ট হয়ে যায় না। সত্যিই যায় না। তবে র‍্যাকের সঙ্গে জীবন গাঁথলে সেটা একেবারেই ভিন্ন ব্যাপার। আর একথা জানতে তোমার নিশ্চয়ই বাকি নেই অ্যাডেমেক যে র‍্যাকের ব্যাপারটাকে আমি কিছুতেই ভাল চোখে দেখব না। তোমরা দুজনেই এখানে এক সঙ্গে এসেছ। তোমার পনের দিনের সাজা হয়েছে আর ওর তিন সপ্তাহের। তুমি নিশ্চয়ই বুঝতে পারছ আমি তোমার ব্যাপারে একটু বেশী রকমই সদয়। তবু তোমাকে সাবধান করছি, র‍্যাকের সঙ্গে আর কোন রকম ভাবে মেশার চেষ্টা করো না। তুমি কাজ করতে পার, পরিশ্রম করতে পার। জানতো, শ্রমই মানুষকে সত্যিকার সুখের সন্ধান দিতে পারে। রাস্তায় একবার নামো, দেখবে কত কাজ ছড়িয়ে রয়েছে চারদিকে। মানুষের প্রয়োজন সর্বত্র। জীবনটাকে গড়ে তোলার প্রয়োজন যে কতখানি খুব সহজেই বুঝতে পারবে। মনে রেখো, প্রত্যেক মানুষই একদিন বুড়ো হবে। তুমিও হবে। তখন যদি তুমি কারো বোঝা হয়ে দাঁড়াও, কি করবে ভেবে দেখেছ কি? আর লোকেই বা বলবে কি তোমায়?

—হুজুর, আপনার এই উপদেশের জন্য আপনাকে ধন্যবাদ। আপনার অশেষ করুণা। উত্তর দিল অ্যাডেমেক।

—তাহলেই দেখতে পাচ্ছ, ম্যাজিস্ট্রেট বলে চললেন—কোন কিছুই নষ্ট হয়ে যায় না। আবার কাজকর্ম শুরু করো। দেখবে কিছু না কিছু ফল পাবেই। তুমি গ্রাম থেকে এসেছ, তাই না?

—হ্যাঁ হুজুর, আমার জন্ম একটা ছোট গাঁয়ে।

—বেশ। তাহলে তো তুমি খেত খামারের বিভিন্ন ধরনের কাজের ব্যাপারে মোটামুটি কিছু জান। এছাড়া গাই বাছুর চরানোর কথাও ধরা যেতে পারে। না না, এতে লজ্জা পাবার মত কিছু নেই! উদ্দেশ্য-হীনভাবে রাস্তায় রাস্তায় ঘুরে বেড়ানোর চেয়ে এ অনেক ভালো। র‍্যাকের সঙ্গে তোমার সম্পর্কটা তো একটা মামুলী ভাললাগার ব্যাপার। মনে রেখ অ্যাডেমেক, ইচ্ছের জোরে মানুষ সব কিছুকে উপেক্ষা করতে পারে। আর যার কাজ করার ইচ্ছে প্রবল, তার কাছে সব কাজই সমান। কাজের সন্ধান যে করে, কাজ সে একদিন ঠিকই পায়। তাছাড়া তুমি তো বেশ শক্ত সমর্থ যুবতী। খুব সহজেই তুমি একটা কাজ জুটিয়ে নিতে পারবে। তোমাকে আগেও একবার বলেছি অ্যাডেমেক, কাজই মানুষের সবচেয়ে উপকারী বন্ধু। কাজই তোমার মনের সব দুঃখকে লাঘব করতে পারে। আর সত্যি যখন তুমি কাজের মধ্যে একেবারে ডুবে যাবে, তখন দেখবে তোমার আগের দিনের এলোমেলো জীবনটার কথা একেবারেই ভুলে গেছ; আর তুমি নিজেই নিজেকে বোঝাচ্ছ—আগের সেই নিরর্থক দিনগুলোকে আমি এখন পেরিয়ে এসেছি। কি ঠিক বলিনি?

—এর চেয়ে সত্যি আর কি হতে পারে হুজুর? অ্যাডেমেক নড়ে চড়ে বসল।

—চমৎকার! চমৎকার! ম্যাজিস্ট্রেট উৎফুল্ল হয়ে বললেন, আমি খুব খুশী হয়েছি। আজ আমার হাতে তেমন কোন কাজ ছিল না তাই তোমার সঙ্গে বেশ প্রাণ খুলে কথা বলে সময়টুকুর সদ্ব্যবহার করতে পারলাম। দেখ অ্যাডেমেক, অপরাধীকে পালটানোর ব্যাপারে শাস্তি দেওয়ার চেয়ে সৎ পরামর্শ ও আন্তরিক প্রচেষ্টা অনেক বেশী কার্যকরী হয়। আমি জানি, তুমি কি ভাবছ। আমি তোমাকে সাহায্য করতে চাই। আচ্ছা, তুমি কি একটুখানির জন্যেও ভাবতে পারছ না যে তোমাকে বোঝাতে পেরে আমি কত খুশী হয়েছি!

বারের অন্যান্য ম্যাজিস্ট্রেটরা কিন্তু দীর্ঘদিনের শাস্তির ফতোয়া জাহির করেই সন্তুষ্ট হয়। শাস্তি দিয়ে যে কোন অপরাধীর আত্মিক সংস্কার সাধন নিশ্চয় করা যায়, তবু মিষ্টি কথায়, সদয় ব্যবহারে কোন অপরাধীকে পাল্টানোর ব্যাপারটি আরো বেশী সফল হতে পারে। আমি এই পদ্ধতিতেই বিশ্বাসী। তোমার ব্যাপারটিই ধরো না কেন। আমি তো বলতে পারতাম—'ঠিক আছে, ওর শাস্তি পাওয়াই দরকার। এর বেশী আমি ওর ব্যাপারে আর কিছুই করতে পারি না। সেটা কি ঠিক হত? শোন অ্যাডেমেক, ভালো করে তোমার সমস্ত জীবনটার ওপর একবার চোখ বুলিয়ে দেখো। আজ এই মুহূর্তে তুমি তোমার কৃত অপরাধের জন্য এই কোর্টে দাঁড়িয়ে আছ। অথচ তোমার সামনে অপেক্ষা করছে এক সুন্দর নতুন জীবন। সেখানে কাজ আছে, পথ চলার একটা সত্যিকার লক্ষ্য আছে, যে লক্ষ্য তোমার সমস্ত অশুভ চিন্তার বিরুদ্ধে প্রতিরোধের স্তম্ভ স্বরূপ মাথা তুলে দাঁড়িয়ে আছে। কি পাবে তুমি ওই বাউণ্ডুলে নিষ্কর্মা র‍্যাকটার সঙ্গে জীবন জড়িয়ে? ছাড়া পেলেই র‍্যাক আবার লুঠেরাদের দলে যোগ দেবে। শুধু একবার ভাবো তো অ্যাডেমেক। যে লোকটার সঙ্গে তুমি এখানে এসেছ ইতিমধ্যেই চুরির অপরাধে সে দু'বছরের জন্য জেল খেটেছে। ওর সঙ্গে তুমি একবার যদি পথচলা শুরু কর, কিছু আঁচ করার আগেই দেখবে ও তোমাকে ওর দলে টেনে নিয়েছে। ব্যাপারটাকে কিন্তু ছোট করে দেখনা।

তুমি এখন মাত্র পনের দিনের জন্যে এখানে এসেছ। তখন দেখবে বছরের পর বছর তোমাকে গরাদের মধ্যে দিন কাটাতে হচ্ছে। আর এর পর সত্যিই যেদিন তুমি পুরোপুরি ছাড়া পাবে দেখবে শুধু বাঁচার তাগিদেই তোমাকে অন্য সঙ্গীদের দিকে লোভীর মতো তাকাতে হচ্ছে। কেননা এছাড়া তো তুমি আর কোন শিক্ষাই লাভ করনি। একথা আমি আমার দীর্ঘদিনের অভিজ্ঞতা থেকেই বলছি। এখন তুমি নিশ্চয় বুঝতে পারছ যে আজকের এই র‍্যাকই একদিন তোমার

সবচেয়ে বড় শত্রু হয়ে উঠবে। অন্যদিকে দেখ, আজ যখন তুমি ছাড়া পাবে তখন যে কোন একটা কাজ তুমি খুঁজে নিতে পারবে। এবং সৎকর্মের দ্বারাই তুমি একদিন এমন এক সুখের সন্ধান পাবে যা আজও তোমার কাছে অজানা। তুমি দেখতে পাবে নিজের রুটি নিজে যোগাড করায় আনন্দ আর তৃপ্তি কতখানি। কেউ তখন তোমায় অবজ্ঞার চোখে দেখবে না। প্রত্যেকে শ্রদ্ধার সঙ্গে তোমার ব্যক্তিত্বকে সম্মান দেবে। তোমার যে বিশ্রী আর নোংরা একটা অতীত ছিল কেউ তা আর মনেও রাখবে না। তুমি তখন এমন কোন সং পরিশ্রমী লোকেরও সন্ধান পেতে পার যে তোমার মতই মাথার ঘাম পায়ে ফেলে তার অন্নসংস্থান করছে। হয়তো এমনও হতে পারে সেই লোকটি তার পরিচয় আর সবল দুটি বাহুর দৃঢ়তা নিয়ে তোমার পাশে দাঁড়ানোর ইচ্ছাও প্রকাশ করতে পারে। যেদিন এই লক্ষ্যে পৌঁছবে সেদিন তুমি নিশ্চয় মনে মনে বলবে, যাই হোক না কেন, ম্যাজিস্ট্রেট মশাই ঠিকই বলেছিলেন। জীবনটাকে উপভোগ করার শিক্ষাও তুমি এর থেকে পাবে। আর এদিকে র‍্যাকের সঙ্গে তুমি যে পথে চলেছ, সে পথে আছে শুধু এলোমেলো ঘুরে বেড়ানো, প্রতিটি মুহূর্তে ভিক্ষাবৃত্তি, বনে জঙ্গলে রাত্রি যাপন, পুলিশের নজর এড়িয়ে চলা আর অহরহ হাজত বাসের ভীতি। সেই জন্যেই আমি বারবার তোমাকে সাবধান করছি অ্যাডেমেক। র‍্যাকের সঙ্গ তুমি ত্যাগ করো। তুমি আজই ছাড়া পাবে কিন্তু র‍্যাককে এখনও এক সপ্তাহ থাকতে হবে। আমার কথা শোন, র‍্যাককে তুমি একেবারে ভুলে যাও। মনে কর না কেন, র‍্যাকের সঙ্গে তোমার সমস্ত সম্পর্কটা একটা দুঃস্বপ্ন বই আর কিছু নয়। সুখী উজ্জ্বল এক ভবিষ্যতের আশা নিয়ে তুমি আজ এই স্থান পরিত্যাগ করো। তারপর কাজের মধ্যে নিজেকে বিলিয়ে দাও। জানো, ল্যাটিনে একটা প্রবাদ আছে—প্রার্থনা করো আর কাজ করে যাও। কথা কটা স্মরণে রেখ। ভুলেও আর পুরোনো জীবনে ফিরে যেও না অ্যাডেমেক। এমন কাজ কখনও করো না,

যাতে তোমার অপরাধের বোঝা আরো বাড়ে, আর তার জন্যে তোমাকে আবার এখানে ফিরে আসতে হয়। আমি জোর দিয়ে বলছি তুমি তোমার আগামী জীবনের প্রতিটি মুহূর্তকে পুরোপুরি উপভোগ করতে পারবে। আর খেটে খাওয়া মানুষ গুলোর মধ্যেই তুমি তোমার সত্যিকার বন্ধুদের খুঁজে পাবে। আমি যে-যে কথাগুলো এতক্ষণ ধরে তোমায় বললাম, আশা করি বুঝেছ ?

—হ্যাঁ হুজুর। বিনীত ভাবে উত্তর দিল অ্যাডেমেক।

—সত্যি অ্যাডেমেক, ম্যাজিস্ট্রেট মারিক বললেন, আমি খুব খুশী হয়েছি। তুমি আমার কথাগুলোর অর্থ পুরোপুরি ধরতে পেরেছ। তুমি এখন মুক্ত স্বাধীন, যেখানে খুশী যেতে পার, যে কোন কাজ গ্রহণ করতে পার। তোমার নতুন জীবনই প্রমাণ করবে আমার পরিশ্রম বৃথা যায়নি। সেদিন আমি সত্যি সুখী হব। তোমার কি আর কোন বিশেষ অনুরোধ আছে অ্যাডেমেক ? না না, কুণ্ঠার কোন কারণ নেই। এখন আর আমি তোমার কাছে একজন ম্যাজিস্ট্রেট নই। একেবারে তোমার আপন জনের মতো তুমি নির্ভয়ে তোমার ইচ্ছের কথা আমায় খুলে জানাতে পার। আমার উপদেশ চাইতে পারো। জানো অ্যাডেমেক, যখন দেখি লোকে আমার ওপর আস্থা রাখছে তখন এত উৎসাহিত হই না !

—হুজুর, আমি আপনাকে একটা কথা বলতে চাই। অত্যন্ত নম্রভাবে অ্যাডেমেক বলল।

—হ্যাঁ, নিশ্চয়ই। বলো—বলে ফেল। যদি সম্ভব হয় আমি আনন্দের সঙ্গে তোমার আর্জি মঞ্জুর করব। ম্যাজিস্ট্রেট অ্যাডেমেককে উৎসাহ দিতে লাগলেন।

—অপরাধ নেবেন না হুজুর। আমি মোটেও আপনার অবাধ্য হতে চাই না। অনুনয়ের সুরে অ্যাডেমেক বলতে লাগল।

শুধু একটি অনুরোধ করছি হুজুর—দয়া করে ওদের বলুন, ওরা যেন আমাকে আরো এক সপ্তাহের জন্যে আটকে রেখে দেয়। যাতে আমি র‍্যাকের সঙ্গে ছাড়া পেতে পারি। আমরা প্রতিজ্ঞা করেছিলাম হুজুর, আমরা কেউ কাউকে কখনও ছেড়ে থাকব না। তার মানে এই নয়, আমি আপনাকে কোন রকম-ভাবে উত্যক্ত করতে চাইছি··· আপনার অশেষ দয়া হুজুর, অসীম করুণা······

অনুবাদ। রমা ভট্টাচার্য

জিজ্ঞাসা

জ্যাক লণ্ডন

ডাওসনে মিসেস সিথারের আচমকা পদক্ষেপ ও সংক্ষিপ্ত প্রবাস-জীবন বেশ খানিকটা আলোড়ন সৃষ্টি করল। এক বসন্তদিনে হঠাৎ একখানা কুকুরটানা স্লেজগাড়ি ও কয়েকজন ক্যানাডীয় নাবিকের সঙ্গে মিসেসের শুভাগমন মাসাধিককাল সেখানে খুব চমক লাগিয়ে দিল। সচরাচর ডাওসনে মহিলাদের বড় একটা দেখা যায় না, তাই মিসেসের এত তড়িঘড়ি চলে যাওয়ার কারণটা লোকে বুঝে উঠতে পারল না। ফলে ডাওসনের শ'চারেক বাসিন্দা নোম-ধর্মঘটের নতুন পরিস্থিতি না-আসা পর্যন্ত কেমন যেন চিন্তাছন্ন হয়ে রইল। এই ছোট্ট এলাকাটি মিসেস সিথারকে পেয়ে হঠাৎ বেশ উৎফুল্ল হয়ে ওঠে এবং তাঁর থাকাটা জনগনের কাছে ছিল আকাঙ্খিত। তিনি ছিলেন রূপসী ও মনোরমা, তদুপরি বিধবা; অল্পদিনেই তাঁর মেয়েলি সুন্দর পোশাকের বাহারে ও সঙ্গসুখলিপ্সায় অনেক বিত্তশালী, পদস্থ কর্মচারী ও উদ্‌ভ্রান্ত যুবক তাঁর পিছু নিয়েছিল।

তাঁর স্বামী প্রয়াত কর্ণেল সিথার ছিলেন খনি ইঞ্জিনিয়ারদের খুব শ্রদ্ধার পাত্র। কিন্তু খনি-পরিচালকবর্গ তাঁর লেন-দেন সংক্রান্ত

নাতির প্যাঁচ ও ব্যবসা পরিচালনার কোশলকে বেশ ভয়ের চোখেই দেখত। সারা দেশে খনি বিশেষজ্ঞ হিসেবে তাঁর সুনাম তো ছিলই, লণ্ডনে তাঁর খ্যাতি ছিল আরও বেশি। তাই সাধারণ মহিলার কথা তো নয়, কর্ণেলের বিধবা পত্নীর মত সম্ভ্রান্ত মহিলার এই অখ্যাত স্থানে হঠাৎ আগমনের কি কারণ থাকতে পারে, এই ছিল সেদিনের সবার জিজ্ঞাসা।

নর্থল্যাণ্ডের লোকজন ভাবালুতাকে প্রশ্রয় দেয় না, যে কোন জিনিসকে সরাসরি বুঝতে চায় বলেই তারা বাস্তববাদী। তাই মিসেস সিথারের আগমনের কারণটা তাদের অনেকের কাছেই ছিল তাৎপর্যপূর্ণ। কিন্তু মিসেস সিথার এমন অসংকোচে ও সহজ ভাবে সকলের সঙ্গে মেলামেশা করলেন এবং কথাবার্তায় সংগতি রেখে চার চারটে সপ্তাহ কাটিয়ে দিলেন, তাতে মনে হয় বাসিন্দাদের তীব্র কৌতূহল তিনি যেন ধরতেই পারেননি। তাঁর প্রস্থানে এই কৌতূহলের সাময়িক প্রশমন ঘটলেও, আগমনের কারণটা কিন্তু বিরাট প্রশ্ন হিসেবেই রয়ে গেল।

দৈবক্রমে এর সদুত্তরের কিছুটা হদিশ পাওয়া গেল। জ্যাক্ ক্যাফরান নামে এক ব্যক্তি মিসেস সিথারের সান্নিধ্যলাভের চেষ্টায় ব্যর্থ হয়ে মিসেসের নাবিক সর্দার পিয়ের ফঁতেনের সঙ্গে বেশ ভাব জমিয়ে নিল। এক রাতে দুজনেই বেশ মাতাল হয়ে ওঠার পর, পিয়ের নেশার ঝোঁকে বলতে লাগল—'ম্যাডাম সিথার এ দেশে কেন এসেছে? তুমি বরং তাঁকেই জিজ্ঞাসা করো, আমি এর বিন্দু বিসর্গও জানি না। তবে তিনি প্রায়ই একজন লোকের খবর জানতে চান।'

'বন্ধু, মিসেসের সঙ্গে আমার কথা বলার একটা উপায় করে দাও, আর দয়া করে যে লোকের খবর ম্যাডাম জানতে চান, তার পরিচয়টা দাও। তোমাকে ট্যাঁক ভর্তি টাকা দেব। হাজার ডলার বকশিশ! সত্যি বলছি দেবো।'

'লোকটার নাম ডেভিড পেন, আরে মশাই, ডেভিড পে-ন। মিসেসের মুখে নামটা যেন জপমালা। আমি সবসময়ই চারদিকে নজর রাখি, কাজের ফাঁকেও ছাড়ি না; কিন্তু এই পোড়া নামের লোকটাকে আজও দেখলাম না। জাহান্নামে যাক তোমার হাজার ডলার।…ওহো, একবার সার্কেল সিটি থেকে ডেভিডের খবর নিয়ে কে যেন এলো, অমনি ম্যাডামের মুখখানা খুশিতে উজ্জ্বল। তিনি লোকটার কুশল জিজ্ঞাসা করেই আমায় ডেকে বল্লেন 'পিয়ের, কুকুরগুলো শ্লেজে জুড়ে দাও; ওঁর সন্ধান বোধহয় মিলেছে। আমাদের তাড়াতাড়ি রওনা হবার ব্যবস্থা কর—হাজার ডলার বকশিশ।' আমি চটপট উত্তর দিলাম—হ্যাঁ ম্যাডাম, এখনই যাচ্ছি। মনে মনে ভাবলাম হু'হাজার ডলার আমদানি হল। কিন্তু হায়, সার্কেল সিটি থেকে ফের খবর এলো—না, ডেভিড পেন্ ডাওসনের দিকে এসেছে। তাই আমি আর ম্যাডাম সেখানে গেলামই না। আরে মশাই, সেদিনই ম্যাডাম বলে উঠলেন—পিয়ের, নাও পাঁচশ ডলার, আজই ডিঙি কিনে আন। কাল নদীর উজানে রওনা হব—হ্যাঁ, হ্যাঁ কালই। শালা শুঁটকে চার্লি ডিঙি বাবদ পুরো পাঁচশ ডলারই আদায় করে ছাড়ল?'

মিসেস সিথার চলে যাওয়ার পরদিন যখন জ্যাক কাফরান এই কথা প্রকাশ করে দিল তখন ডাওসনের অধিবাসীরা অবাক বিস্ময়ে আঁচ করতে লাগল, কে এই ডেভিড পেন্! মিসেস সিথারই বা কি করে তার সান্নিধ্যে এল।

কিন্তু পিয়ের ফঁতেনের কথামতই দেখা গেল মিসেসের চাষাড়ে নাবিক দল নদীর পূর্ব তীর ধরে তাঁর ডিঙিখানা গুণ টেনে নিয়ে গেল ক্লোনডাইক শহর পর্যন্ত, তারপর নদীর খাড়া তীর পেছনে ফেলে ক্রমে ক্রমে দক্ষিণের দ্বীপগুলির মধ্যে অদৃশ্য হয়ে গেল।

২

'ম্যাডাম এই হল সেই জায়গা। স্টুয়ার্ট নদীর নিচের এক, দুই, তিন নম্বর দ্বীপ।' পিয়ের ফঁতেন বলল। সঙ্গে সঙ্গেই তীরে লগি ঠেকিয়ে, ডিঙির পেছনটা স্রোতের আড়াআড়ি করে দিল। স্রোতের ধাক্কায় ডিঙি ভিড়ে গেল তীরের গায়ে। সঙ্গে সঙ্গে একজন ডাঙার ওপর লাফিয়ে নেমে শক্ত করে বাঁধল নৌকোটা। 'ম্যাডাম, পারটা একবার দেখে আসি।'

কয়েকটা কুকুরের একঘেয়ে চিৎকারে বোঝা গেল কিনারা অতিক্রম করে পিয়ের অদৃশ্য হয়ে গেছে : কিন্তু ফিরে আসতেও সময় লাগল না তার।

'ম্যাডাম, খুঁজে দেখলাম ঘরে লোকজন নেই কিন্তু কুকুরটা আছে। মনে হল মালিক খুব দূরে যাননি। একটু আগেই বেরিয়েছেন এবং তাড়াতাড়ি ফিরবেন, নইলে কুকুর রেখে যেতেন না।'

'পিয়ের একটু ধরতো আমায়, ঝাঁকুনিতে আমার দফা-রফা হয়ে গেছে, একটু আস্তে যদি চালাতে ভাল হত।' ভারী লোমশ কম্বলের আরামদায়ক শয্যা ছেড়ে তন্বী কারেন সিথার অপরূপ দেহ সৌষ্ঠব নিয়ে সোজা উঠে দাঁড়ালেন। স্বাভাবিক লাবণ্যের আভায় ফুটে উঠছে এক স্নিগ্ধ, চিকন দুর্বলতা। কিন্তু খাড়া তীর বেয়ে, পিয়েরের হাত ধরে ওঠবার সময়ে শরীরের দেহভারে ফুটে উঠল বাহুমূলের পেশী। কমনীয়তার মধ্যেও তাঁর স্বল্প মাংসল, নিটোল দেহ ছিল যথার্থই শক্তির আধার। যদিও তিনি খানিকটা অসতর্কভাবে পিয়েরের হাতে গা এলিয়ে তীরে উঠে এসে রক্তিম মুখে দ্রুত শ্বাস-প্রশ্বাস ছাড়লেন, পর মুহূর্তেই যখন সশ্রদ্ধ কৌতূহল এবং সংযত পদক্ষেপে কুটিরের দিকে এগিয়ে গেলেন, তাঁর চোখমুখে কেমন আশঙ্কার ত্রস্ত ভাব ফুটে উঠল।

কয়েক টুকরো অগোছালো চেলা কাঠ দেখিয়ে পিয়ের বলে উঠল,

'সবে ফেঁড়েছে। তুই কি বড় জোর দিন তিনেক আগে—তার চেয়ে পুরনো নয়।' মিসেস মাথা নাড়লেন। একবার চেষ্টা করলেন জানলা দিয়ে উঁকি দিতে, কিন্তু চর্বি মাখানো পাতলা চামড়ার পর্দাটা আলোক স্বচ্ছ হলেও, মানুষের দৃষ্টির পক্ষে দুর্ভেদ্য। অগত্যা ফিরে গেলেন দরজায় ; চেষ্টা করলেন পুরনো কাঠের খিলটা আলগা করে ভিতরে ঢুকতে, কিন্তু কি ভেবে ছেড়ে দিলেন। হঠাৎ মিসেস হাঁটু গেড়ে মাটিতে বসেই দরজার এবড়ো খেবড়ো চৌকাঠে চুম্বন করলেন। ব্যাপারটা পিয়েরের চোখ না এড়ালেও, এ সম্বন্ধে সে কোন উচ্চবাচ্য করল না।

ঠিক পরক্ষণেই মাঝিদের একজন যখন নিশ্চিন্তমনে পাইপে আগুন দিচ্ছে, পিয়েরের কর্কশ স্বর তাকে চমকে দিল।

'ওই! ওরে লা গয়ের, আরও, আরও নরম কর ; বেশি বেশি কম্বল আর ভালুকের চামড়া দে। ···গদি যেন ভাল হয়।'

তৎক্ষণাৎ মিসেসের শয্যা এলোমেলো ভাবে ডিঙি থেকে তীরে পড়তে লাগল।

শেষে পুরুষ্টু গদি তৈরি হলে মিসেস আরামে শরীর এলিয়ে অপেক্ষারত অবস্থায় সময় কাটাতে লাগলেন। কাৎ হয়ে চোখজোড়া মেলে দিলেন বহুদূর বিস্তৃত ইউকোনের ওপর দিয়ে পরপারের সীমান্তে দীর্ঘ পর্বতশ্রেণীর ওপরে। আকাশ তখন অদৃশ্য দাবানলের ধোঁয়ায় ধূসর, অপরাহ্নের সূর্যালোকে কোন বস্তুর ছায়াই স্পষ্ট নয়। চারিদিকের ধূসর দিগন্তের পটভূমিকায়, ছায়া ঢাকা দূরবর্তী দ্বীপপুঞ্জ, কালো জলরাশি এবং তুষার খচিত শৈল-শিখরগুলি অনুর্বর প্রান্তরের মত প্রতীয়মান। এই ভয়ঙ্কর নির্জনতার বুকে কোথাও কোন মানুষের অস্তিত্বের কথা মনে আসে না। ক্ষুদ্র একটি শব্দও সেই নিবিড় স্তব্ধতা ভঙ্গ করছে না। মনে হয় পৃথিবীটা যেন মহাকাশের কোন রহস্যের মায়ায় জড়িয়ে গেছে।

সম্ভবতঃ এই অনুভূতিই মিসেস সিথারকে কেমন বিচলিত করে

তুলল। তিনি ক্রমাগত এপাশ ওপাশ করতে লাগলেন। সন্তর্পণে দৃষ্টি ঘুরতে থাকল নদীর উজানে, ভাটায়, পরক্ষণেই ক্ষীণালোকিত নদীকূল বরাবর লুকোনো সরু খালের মোহানাগুলোর দিকে। ঘণ্টা খানেক পরে রাত্রিযাপনের তাঁবু গাড়তে নাবিকরা তীরে উঠে এলেও, পিয়ের রয়ে গেল মিসেসের পাহারায়, তাঁর ঠিক পাশেই।

দীর্ঘ নীরবতার পর দ্বীপের অদূরেই দৃষ্টি নিক্ষেপ করে পিয়ের হঠাৎ বলে উঠল, 'বোধহয় উনি ফিরে আসছেন।'

স্রোত ঠেলে ফিরে আসছিল ছোট্ট একটি শালতি। তার দু'পাশে দু'খানা বৈঠা তালে তালে ওঠা-নামা করছে। একজন পুরুষ, আর এক জন নারী। মিসেস প্রথমে নারীটির দিকে নজরই দিলেন না কিন্তু শালতি কূলে ভিড়তে এক বন্যরূপ মিসেসের চোখ দু'টিকে টেনে নিল।

মেয়েটির গায়ে চামড়ার আঁট-সাট ব্লাউজ: তার ওপর এলো-পাতাড়ি পুঁতি গাঁথা। দেহখানি নিটোল। সুন্দর ঝালর দেওয়া রেশমি রুমালে কটা চুলের ঢল আংশিক ঢাকা। সিথার চকিতে তার তামাটে বর্ণের মুখখানা দেখে নিলেন। তীক্ষ্ণ, কৃষ্ণ ও আয়ত চোখ জোড়া তির্যক এবং ভ্রূ-যুগল সুস্পষ্ট এবং ধনুকের মত বাঁকা। মুখখানা পুরোপুরি বিশ্রী না হলেও গালের উঁচু হাড় এসরাজের মত হঠাৎ বেঁকে ওষ্ঠপ্রান্তে পৌঁছে যাওয়ায় ভাল দেখাচ্ছে না। কিন্তু ঠোঁট জোড়া পাতলা, নরম এবং তেজী। মুখের গড়নে এবং আকারে প্রাচীন মঙ্গোলীয় ছাপ। ঈষৎ চাপা নাক, নাসারন্ধ্র স্ফীত। তাতার রমণীর মত মুখ চোখের ভঙ্গিতে একটা বেপরোয়া ভাব। বলতে গেলে রেড ইণ্ডিয়ান জাতির সৌভাগ্য যে বিশ পঁচিশ পুরুষ পরে চেহারার মৌল আকৃতির এরকম বিশ্বস্ত পুনরাবর্তন ঘটে।

পুরুষটির সঙ্গে তাল রেখে মেয়েটি শক্ত হাতে দাঁড়ের সাহায্যে শালতিটি ঘুরিয়ে দিল স্রোতের আড়ে এবং কূলে ভিড়িয়ে নিমেষের মধ্যে ডাঙায় উঠে-দাঁড়ি টেনে তুলে নিল নিহত বুনো হরিণের দেহটা।

শেষে পুরুষটির সাহায্যে মুহূর্তের মধ্যে শালতিখানা ওপরে টেনে তুলল। গর্জনরত কুকুরগুলোর গায়ে হাত বুলিয়ে শান্ত করছে, এমন সময় পুরুষ মানুষটির দৃষ্টি পড়ল মিসেস সিথারের দিকে। মিসেস তখন উঠে দাঁড়িয়েছেন। লোকটি একবার তাকিয়ে নিজের অজান্তেই চোখ রগড়ে নিল। ভাল করে দেখতে গিয়ে মনে হল দৃষ্টি বিভ্রম ঘটছে। একটু এগিয়ে হাতটা বাড়িয়ে দিয়ে শান্তভাবে বলল, 'কারেন! মনে হল স্বপ্ন দেখছি; গেল বছরে তুষার ছোঁয়ায় চোখে আঘাত লেগেছিল, এখন দূরের জিনিস ভাল দেখতে পাই না।' মিসেসের রাঙা মুখ আরো রাঙা হয়ে উঠল, আবেগের আতিশয্যে তাঁর বেদনা বোধ হল, কারণ তিনি এই নিরুত্তাপ হস্তপ্রসারণের অধিক কিছু প্রত্যাশা করেছিলেন। মুহূর্তেই, কোশলে নিজেকে সংযত করে, অন্তরের সঙ্গে প্রসারিত হস্তটি নিজের হস্তে টেনে নিলেন।

'তুমি জান ডেভি, আমি এসে পড়ব বলে তোমায় জানিয়েছিলাম, এবং এসেও পড়তাম,—কেবল—কেবল—'

'কেবল আমি মত দিইনি—এইত?' হেসে বলল ডেভিড্ পেন। কথার ফাঁকে চোখ ঘুরিয়ে দেখে নিল রেড ইণ্ডিয়ান মেয়েটি কিভাবে কুটিরের মধ্যে অদৃশ্য হয়ে গেল।

'ওঃ! ডেভি, আমি সব বুঝি। তোমার অবস্থায় পড়লে আমাকেও ঠিক এমনটিই করতে হোত। ওকথা থাক, আমি তো এসে পড়েছি এখন!' মিসেসের চাপা মেয়েলি আবেদনটি উপেক্ষার ভান করে অমায়িক ভাবে ভদ্রলোক উত্তর দিলেন, 'তাহলে, আর কয়েক পা এগিয়ে কুটিরের মধ্যে এসে খানা-পিনা করো। এত দূর পথ এসে নিশ্চয়ই ক্লান্ত, কিছুটা বিশ্রামের দরকার! কোন দিকে যাচ্ছিলে? উজানের দিকে? তাহলে শীতটা কি ডাওসনে কাটিয়েছিলে না বরফ গলার কটা দিন শুধু? এখন তোমার আস্তানা কোথায় ফেলেছ?' কথা শেষ করে মাঝি-মাল্লাদের দিকে তাকিয়ে দেখল খোলা আকাশের

নিচে তখন তারা আগুনের কুণ্ড ঘিরে বসে আছে। ডেভিড পেন এগিয়ে কুটিরের দরজাটা ঠেলে মিসেসকে ঢুকবার সাহায্য করতে করতে বলে চললেন, 'গত শীতটা সার্কেল সিটিতে কাটিয়ে বসন্তের শুরুতে এখানে এসে উঠেছি। আশা করছি হেণ্ডারসন খাঁড়ির ওখানে চেষ্টা করে লাভই হবে, যদি না পারি এবার বর্ষায় চলে যাব সোজা স্টুয়ার্ট নদীর উজানে।' মিসেস আলোচনার মোড় ঘুরিয়ে নিজের প্রসঙ্গ অবতারণার জন্য কিছুটা বেখাপ্পাভাবে জিজ্ঞেস করলেন, 'তুমি আগের মতই রয়েছ—ঠিক বলিনি? দেহের মেদগুলো ঝরে, পেশীগুলো শক্ত-সমর্থ হয়েছে মাত্র—কি বল?' কথার ফাঁকে মিসেস ঘাড় নেড়ে আবছা আলোয় রেড ইণ্ডিয়ান মেয়েটার দিকে একবার তাকিয়ে নিলেন। সে তখন বুনো হরিণের বড় বড় মাংসের টুকরো এবং শুয়োরের মাংসের সরু সরু ফালি একের পর এক ভেজেই চলেছে। পুরনো, নড়বড়ে একটা কুড়ালের বাঁটে কাঠের টুকরোর গোঁজ ঠুকতে ঠুকতে, মাথা না-তুলেই ভদ্রলোক জিজ্ঞেস করলেন, 'ডাওসনে কি অনেকদিন কাটিয়েছ?' প্রশ্নটার বিশেষ গুরুত্ব না দিয়ে, মেয়েটির দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ রেখেই মিসেস বললেন, 'মাত্র কয়েকটা দিন,—হ্যাঁ, ডাওসনের কথা কি যেন বলছিলে? ডাওসনে এক মাসও থাকতে পারলাম না, পালিয়ে এসে হাঁপ ছেড়েছি। জীবনের গ্রহ শুধু তাড়িয়ে নিয়েই বেড়াচ্ছে, কারুর জন্য তার ক্ষমা নেই।'

'হ্যাঁ, পৃথিবীতে দুষ্টগ্রহ এ রকমই হয়; মানুষের সুখ-স্বপ্নকে মুহূর্তে তছনছ করে দেয়, সে যা হোক, ঠিকসময়েই ডাওসন ত্যাগ করে বুদ্ধির পরিচয় দিয়েছ। বীভৎস মশার উৎপাত শুরু হবার আগেই এই এলাকা পেরিয়ে যেতে পারবে। মশার খপ্পর এড়াতে পারছ—এ তোমার দারুণ সৌভাগ্য। ও অভিজ্ঞতা যার নেই সে বুঝতে পারবে না।'

'অত বুঝি না। বাদ দাও ও কথা, তোমার কথা বল। বর্তমানে

কেমন আছ? প্রতিবেশীরা কেমন? নাকি কোন প্রতিবেশীই নেই?'

কথাবার্তার ফাঁকে ফাঁকে মিসেসের দৃষ্টি ছিল রেডইণ্ডিয়ান মেয়েটির যাঁতাকলে কফির দানা গুঁড়ো করার দিকে। যেভাবে মেয়েটি পুরনো পদ্ধতিতে নিপুণ ও শক্ত হাতে দানাগুলো পিষছিল, তাতে তার দৈহিক সামর্থ্য ও স্নায়ু শক্তির প্রশংসা করতে হয়। অতিথির দিকে চোখ পড়তেই, ডেভিডের ঠোঁটে মৃদু হাসির ঝিলিক খেলে গেল। উত্তরে বললেন, 'প্রতিবেশী হিসেবে গুটিকয়েক মিশৌরীর ছোকরা এবং দু'জন কর্ণওয়ালের লোক ছিল। কিন্তু তারা সোনার খনিতে কুলির কাজ পেতেই সরে পড়েছে।'

মিসেস সিথার মনে মনে কিন্তু রেড ইণ্ডিয়ান মেয়েটির প্রশংসা না করে পারলেন না। ভাবলেন এ ধরনের মেয়েতো ধারে কাছে প্রচুর রয়েছে। কিছুকাল পূর্বেও ডাওসন পর্যন্ত এলাকাটা ছিল রেড ইণ্ডিয়ানদের। এখন উইনাপোল ছাড়া আর কোথাও এই আদিম অধিবাসীদের অস্তিত্ব টের পাওয়া যায় না। সম্ভবতঃ এই মেয়েটি রেড ইণ্ডিয়ানদের 'করোকুক' শাখারই একজন—এই নদীর উৎস থেকে প্রায় হাজার মাইল দূরবর্তী কোন স্থান থেকে এসেছে।

হঠাৎ মিসেস সিথারের মাথাটা ঘুরতে লাগল। মুখে তাঁর মৃদু হাসি লেগে রইল বটে কিন্তু মনে হল বর্তমানের ডেভিড তার থেকে দূরে সরে গেছে। বহুদূরে কুটিরের কাঠের দেওয়ালগুলো উন্মত্ত নেশা-খোরের মত তাঁর চোখের সামনে নৃত্য জুড়ে দিল।

একটু পরে খাওয়ার টেবিলে ডাক পড়লে, সেখানে মিসেস কিছুটা আত্মস্থ হলেন বটে কিন্তু বিশেষ কোন কথা বললেন না। যে দু'চার বার মুখ খুললেন তাও মামুলী আবহাওয়ার বিষয়ে। ডেভিড পেন তখন সবিস্তারে বর্ণনা করে চলেছেন নদীর উজান ভাটিতে শীত গ্রীষ্মের প্রাবল্য সম্বন্ধে। এক সময়ে মিসেস বলে উঠলেন, 'তুমি তো এখনও

আমার এই উত্তরের দিকে আসার কারণটা জিজ্ঞেস করলে না? তাহলে নিশ্চয়ই জান তুমি।'

উভয়েই এবার টেবিল ত্যাগ করলেন। ডেভিড ব্যস্ত হয়ে পড়ল কুঠারের হাতল তৈরির কাজে।

'আমার চিঠি পেয়েছিলে ডেভি?'

'শেষেরটা? না, মনে হচ্ছে পাইনি। খুব সম্ভব ওটা এখনও বার্চ খাঁড়ির উপকূলবর্তী এলাকাটাতে ঘুরে বেড়াচ্ছে। অথবা কোন ক্ষুদে ব্যবসায়ীর ছোট চালাঘরে ধুঁকছে। এখানে ডাক চলাচলের ব্যাপারটাই লজ্জাকর—না আছে শৃঙ্খলা, না আছে কোন নিয়ম—কানুন—কিছুই নেই।'

'ডেভি, তুমি এমন নিষ্প্রাণ কাঠের মতো হয়ে যেও না, আমায় খানিকটা সাহায্য কর'—মিসেস বললেন। কোন অতীত সম্পর্কের দাবিতে হঠাৎ যেন তার কণ্ঠস্বর উগ্র হয়ে উঠল।

'আমার সম্পর্কে তোমার কি কোন কথাই জানার নেই? আমরা যাদের ইতিপূর্বে জানতাম বা চিনতাম তাদের বিষয়েও কি তোমার সব কৌতূহলের অবসান ঘটেছে? জগতের কোন ব্যাপারেই তোমার ঔৎসুক্য নেই! সব কিছুই কি ভুলে গেছ? আমার স্বামী যে আর ইহ জগতে নেই, সে খবর কি তুমি জান?'

'তাই নাকি!'—ক্ষোভ ও অভিমানে মিসেস কান্নায় ফেটে পড়তে গিয়েও কণ্ঠস্বরে ভৎর্সনার অভিব্যক্তির কথা মনে আসায় কোন প্রকারে নিজেকে সামলে নিলেন।

'আমার কোন চিঠিই তোমার হাতে আসেনি? নিশ্চয়ই দু' একটা পেয়েছ, কিন্তু কোন উত্তর দাওনি।'

'দেখ, শেষেরখানা পাইনি বলেই তোমার স্বামীর মৃত্যুর খবর জানতে পারি নি; আর আমাদের বাসস্থানের অনিশ্চয়তার কারণেও কতগুলো চিঠি নিশ্চয় এধার ওধার হয়ে গেছে, তবে কয়েকটা চিঠি আমি পেয়েছিলাম। সেগুলো উইনাপিকে পড়ে শুনিয়েছি, পাছে সে

তার শ্বেতবর্ণের বোনদের মত অবিশ্বাসী ও শঠ না হয়ে ওঠে, বুঝলে? আমার বিশ্বাস তাতে তার যথেষ্ঠ উপকারই হয়েছে, কি বলো?'

মিসেস সিথার এই প্রচণ্ড খোঁচা উপেক্ষা করে বলে উঠলেন, 'তোমার অনুমান ঠিক। আমার শেষ চিঠিখানাতেই কর্ণেল সিথারের মৃত্যু সংবাদ ছিল। তাও প্রায় বছর খানেক হয়ে গেল। সেই চিঠিতেই স্পষ্ট তোমায় জানিয়েছিলাম যদি তুমি আমার খোঁজ না নাও, আমিই তোমার কাছে চলে আসব। আমি আজ সেই প্রতিশ্রুতি পালনে তোমার কুটিরে উপস্থিত হয়েছি।'

'কই, তোমার কোন প্রতিশ্রুতির কথাই'ত আমার মনে পড়ছে না।'

'কেন, আগের চিঠিগুলোতেই সব আছে—'

'ও হ্যাঁ! তুমি প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলে! ঠিক বটে—কিন্তু আমি যখন তা চাইনি, চিঠির জবাবও দিই নি। যে প্রতিশ্রুতি আমার অনুমোদন লাভ করে না, তা আমার কাছে মূল্যহীন, অনাবশ্যক। চিঠির ব্যাপারে একটু আগে তোমাকে বলছিলাম—আমি জানি না। কিন্তু একটা চিঠির কথা আমার বেশ মনে আছে, তোমারও থাকতে পারে—সে অনেক, অনেক আগের কথা'— কুঠারের হাতলটা মাটিতে ফেলে মাথা সোজা করে ডেভিড বলে চললেন, কথাটা পুরনো কিন্তু আমার স্মৃতিপটে এখনও এর দিন ক্ষণ ও প্রতিটি খুঁটিনাটি উজ্জ্বল হয়ে আছে। এক সুন্দর গোলাপ বাগানে তখন আমরা দু'জন প্রাণী— তুমি আর আমি। বাগানটা ছিল তোমার মায়ের। চার ধারের সব কিছুই তখন প্রস্ফুটিত হচ্ছে, ফুলগুলি'ত বটেই— আমরাও। আমাদের রক্তে তখন বসন্তের ছোঁয়াচ, তোমাকে কাছে টেনে জীবনে সেই প্রথম তোমার সুন্দর কোমল ঠোঁটে এঁকে ছিলাম গাঢ় চুম্বন—ভুলে গেছ প্রেমের সেই প্রথম পরশ?'

'ডেভি! ও সব কথার পুনরাবৃত্তি করো না, না-না। সে

লজ্জাজনক কাহিনীর বিন্দু-বিসর্গও স্মৃতি থেকে মুছে যায় নি। এর পর কত দিন সে সব চিন্তা আমার চোখে অশ্রু টেনে এনেছে, কত ব্যাথা গুমরে উঠেছে, কি নিদারুণ দুঃখ ও গ্লানি আমার অন্তরটাকে পীড়িত মথিত করেছে—হায়! যদি একবার তুমি তা অনুভব বা উপলব্ধি করতে পারতে তো একথা আজ বলতে না!'

'তুমি সেদিন প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলে, এরপরেও সেই সুন্দর দিনগুলোর হাজার বার পুনরাবৃত্তি ঘটিয়েছিলে—তোমার সুন্দর চাউনিতে, স্নিগ্ধ হাতের স্পর্শে, তোমার প্রতিটি মধুর শব্দেই ছিল ঐ প্রতিশ্রুতির প্রতিধ্বনি। তারপর—তারপর যা ঘটল, কি করে তা প্রকাশ করা যায়! একদিন তোমার জীবনে এল এক নতুন মানুষ—বয়সে তোমার পিতৃতুল্য, আর রূপের কথা না হয় বাদই দিলাম। তবে সমাজের দৃষ্টিতে সে হিসেবী, পরিচ্ছন্ন—এ কথা মানতেই হয়। তিনি কোন অন্যায় করেন না, আইনকে শ্রদ্ধা করেন এবং তাঁর কাছে নিয়ম-কানুনের কোন ব্যতিক্রম ঘটে না। ফলে জীবনে তিনি যথেষ্ঠ সম্মান লাভ করেছেন। প্রাসঙ্গিক আর একটা কথা বলছি, তিনি প্রায় গোটা বিশের মত ছোটখাট খনির মালিক ছিলেন। শুধু তাই নয়, কয়েক বর্গমাইল জমির মালিকানা, লেনদেনএর কুপন কাটা, আরো কত কি কাজ ছিল তাঁর। তিনি—'

মিসেস বাধা দিয়ে উঠলেন, 'সেদিন আমার দিকের অসুবিধার কথাও ভুলে যেওনা। চাপ, আর্থিক অভাব, আমার আত্মীয়স্বজন এবং অন্য অসুবিধা! তুমি সেই জঘন্য পরিস্থিতি পুরোপুরি হৃদয়ঙ্গম করতে পেরেছ, আমার এতে বাধা দেওয়ার ক্ষমতা ছিল না। আমার মনের কথা ছিল সম্পূর্ণ ভিন্ন, কিন্তু আমি ছিলাম অসহায়, তারা আমায় বলি দিল—বলতে পার আমিই আত্মাহুতি দিলাম। তুমি যে ভাবেই এটা ব্যাখ্যা করতে চাও করতে পার। কিন্তু হায়, ডেভি! আমি কি তোমায় ত্যাগ করেছিলাম? তুমি কখনও আমার

প্রতি সুবিচার করনি ! ভেবে দেখ, কি অস্বস্তিকর অবস্থায় আমার দিন কেটেছে !'

'কেবলই কি চাপের কাছে নতি স্বীকার ? তোমার ইচ্ছা ও সম্মতি কোনটাই কি ছিল না ? এই বিশাল পৃথিবীতে এমন কোন শক্তিই ছিল না যা আমার এবং ওই লোকটার মধ্যে যে কোন একজনকে বেছে নেওয়ায় তোমার সর্বাঙ্গীন ব্যক্তিগত ইচ্ছাকে জোর করে বাধ্য করাতে পারত।'

'কিন্তু আমি তো সর্বদা তোমার কথাই ভাবতাম'—মিসেস বলে উঠলেন।

'দেখ, ভালবাসা সম্বন্ধে আমাদের উভয়ের ধারনার যথেষ্ট পার্থক্য। তোমার ভালবাসার পদ্ধতিতে আমি অভ্যস্ত নই, তাই তার সঠিক গভীরতা বুঝতে আমি অক্ষম।'

'কিন্তু এখন, এই অবস্থায় ?'

'তুমি যাকে বিয়ে করার উপযুক্ত মনে করেছিলে আমরা তাঁর কথাই আলোচনা করছিলাম। তিনি কি ধরনের লোক ছিলেন ? তোমার হৃদয়ে তিনি কিভাবে স্থান পেলেন ? তাঁর কি কি সংগুণ তোমার মন কেড়েছিল ? এটা সত্য যে তিনি প্রভূত অর্থের মালিক —বলতে গেলে ধনকুবের ছিলেন। তীক্ষ্ণ বুদ্ধি ছিল তাঁর, সব কিছুতেই সুদক্ষ। মানুষের দুর্বলতা ও হীনমন্যতার সব খবর জানতেন বলেই সুকৌশলে অপরের অর্থ আত্মসাৎ করায় তিনি ছিলেন দক্ষ। এবং এ কোশল ছিল মহামান্য আইনের চোখে সম্পূর্ণ নির্দোষ। তাই তিনি ধার্মিক, এমনকি খৃষ্টান ধর্মের নৈতিক অনুমোদনও লাভ করে ছিলেন। হ্যাঁ, সামাজিক দিক থেকে তাঁকে মন্দ লোক বলা চলে না। কিন্তু কারেন,—তোমার আমার বিচারে—গোলাপ বাগানের প্রণয়ী যুগলের বিচারে—তিনি কি ধরনের লোক ছিলেন ?'

'কিন্তু, আজ এ সবের বিচারে কি লাভ ? তিনি তো আর এ জগতে নেই।'

'কিন্তু, তাতে বাস্তব পরিপ্রেক্ষিতের কোন পরিবর্তন ঘটেনি। তিনি কেমন ধারা লোক ছিলেন? না, একটা স্থূল দেহী জ্যান্ত প্রাণী মাত্র—যাঁর মধ্যে না ছিল গান, সৌন্দর্যবোধ বা কোন রসানুভূতি! তার আধ্যাত্মিক সত্তাই বা কোথায়? জড়তায় আড়ষ্ট মেদবহুল শরীর, স্থূল দু'টি গণ্ড এবং ভোজন সর্বস্ব মস্ত এক উদার মানুষ—এই তো ছিল সেই মানুষটা।'

'কিন্তু তিনি তো এখন পরলোকে, এ জগতে আছি শুধু আমরা। বর্তমান তো আমাদেরই হাতে—তাই বলছি অতীত ভুলে গিয়ে বর্তমানের কথা বল। মেনে নিলাম আমি ভুল করেছি, একনিষ্ঠতা হারিয়েছি, পথভ্রষ্ট, পাপী। কিন্তু তুমি? কেন বলতে পারছনা, তুমিও পাপ করেছ? আমি যদি প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করে থাকি, তুমিও কি তোমার প্রতিশ্রুতি রক্ষা করেছ! গোলাপ কাননে তুমি তো স্পষ্টই বলেছিলে তোমার প্রেমনিবেদন চিরকালীন? এখন তা কোথায়?'

বুকে সজোরে মুষ্ট্যাঘাত করে ডেভিড বললেন, 'সে প্রেম এখানেই —এই বুকেই চিরকাল রয়েছে।'

'তোমার প্রেম ছিল সত্যিই মহৎ, তাই তুমি গোলাপ বাগানে নির্দ্বিধায় তা নিবেদন করেছিলে। আজ মনে হচ্ছে তোমার প্রেম এত ব্যাপক ও গভীর নয় যে আমার মত সামান্য প্রেমভিখারিণীর অপরাধ ক্ষমা করতে পারে।'

ডেভিড ইতস্তত করলেন, এর কোন জবাব খুঁজে না পাওয়ায়, তাঁর মুখের কথা মুখেই রয়ে গেল। তাঁর অজান্তে যে পাপ বুকের মধ্যে সঙ্গোপনে লুকিয়েছিল, মিসেসের করুণ শ্লেষোক্তিতে তা আত্মপ্রকাশে বাধ্য হল। স্বাভাবিক সৌন্দর্য-দীপ্ত, অতীত স্মৃতিবিজড়িত, সম্মুখে দণ্ডায়মান সিথারের মহিমময় দৃষ্টি থেকে ডেভিড মুখ ফিরিয়ে নিলেন; কিন্তু মিসেস ঘুরে গিয়ে ডেভিডের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে বললেন, 'ডেভিড আমার দিকে দেখ, আমার মুখের দিকে একবার

তাকাও ; আমি যা ছিলাম আজও তাই আছি, এবং তোমারও কোন পরিবর্তন হয়নি। একবার চোখ মেলে দেখ, আমরা একই রকম আছি।' মিসেস তার কোমল বাহু যুগল ডেভিডের কাঁধে রাখতেই মাথাটা তার একটু হেলে পড়ল ; সবিস্ময়ে সিথারের মুখে কোমল দৃষ্টি বোলাতেই আচমকা একটা শব্দ শুনে শিউরে উঠল। খস্—স্। উইনাপি অদূরেই দেশলাই জ্বালিয়ে প্রদীপ ধরাচ্ছিল। অন্ধকার পশ্চাদপটে তার মূর্তি ফুটে উঠল, সদ্যোদীপ্ত প্রদীপের আলোয় মুখের তামাটে রংটা সোনার মত উজ্জ্বল। ডেভিড থতমত খেয়ে ক্ষীণ কণ্ঠে বললেন, 'সিথার এটা অসম্ভব — কিছুতেই সম্ভব নয়'—আস্তে ক'রে কাঁধ থেকে হাত সরিয়ে দিতে, অবিচল ভাবেই সিথার অনুযোগ করলেন, 'ডেভিড, আমি তো আর বালিকা নই, ও বয়সের স্বাভাবিক মোহ আমার কেটে গেছে। আজ আমি পূর্ণ নারী হিসেবেই সব অনুধাবন করতে পারি। পুরুষ পুরুষই থাকবে—দেশ কাল নির্বিচারে এটাই প্রচলিত রীতি। আমি বিচলিত হইনি, প্রথম থেকে আঁচ করে প্রস্তুত হয়েই এসেছি। কিন্তু এটা তোমার প্রচলিত প্রথামত বিবাহ, প্রকৃত বিবাহ নয়।'

ডেভিড ক্ষীণ কণ্ঠে উত্তর দিলেন, 'আলাস্কায় আমরা এ ধরনের কথা বলি না।'

'আমি তা জানি—কিন্তু...'

'বেশ, তাহলে এটি এ দেশের রীতি অনুযায়ী বিয়ে, এর চাইতে বেশী কি হতে পারে?'

'কোন ছেলেপুলেও হয়নি?'

'না'—

'অথবা...'

'না, না, কিছুই না—কিন্তু তুমি যা বলছ অসম্ভব।'

'অসম্ভব হবেই বা কেন?'—বলতে বলতে সিথার আবার ডেভিডের গা ঘেঁষে দাঁড়িয়ে নীরব স্নেহে রোদে পোড়া পিঠটায় হাত

বোলাতে লাগলেন। 'আমি এ অঞ্চলের রীতি ভালভাবেই জানি। আমাদের পুরুষেরা প্রায়ই এমন কাজ এখানে এসে করে কিন্তু, সারা জীবন তারা এখানে কূপমণ্ডুক হয়ে থাকে না। তারা পি, সি, সি কম্পানিতে ওদের এক বছরের খোর-পোশের ব্যবস্থা করে দেয় আর হাত খরচার কিছু টাকা দিয়ে দেয়। তাতেই মেয়েরা খুশী হয়। তারপর ওরা আবার একজন পুরুষ—' একটু থেমেই ঘাড়টা ঘুরিয়ে মিসেস আবার শুরু করলেন, 'এ মেয়েটার বেলাতেও সে কথা খাটতে পারে। আমরা কম্পানিতে ওর খোর-পোশের বন্দোবস্ত করে দেব—কেবল এক বছরের জন্য নয়, দরকার হলে সারা জীবনের জন্য। প্রথম যখন তুমি ওকে দেখ, কি অবস্থা ছিল ওর ? স্রেফ কাঁচা মাংস খেকো বুনো একটা মেয়ে, গরমের ঋতুতে মাছ আর শীতের দিনে বুনো হরিণের মাংস যার আহার্য, তাও যখন প্রচুর মেলে তখন ভূরি ভোজন, যখন মেলে না—উপোস। তোমাকে যদি ও না পেত, এভাবেই থাকতে হত সারা জীবন। জীবনে ও সুখের আস্বাদ পেল তোমার সান্নিধ্যে এসে। তাই এখন যদি খাওয়া-দাওয়া চলা-ফেরার আরও স্থায়ী সুব্যবস্থা করা যায়, তুমি ছেড়ে চলে গেলেও আগের চেয়ে সুখে ও আরামেই ওর জীবন কাটবে, কখনই তোমার অভাব অনুভব করবে না—'

ডেভিড প্রতিবাদের সুরে বলে উঠল, 'না, না, একথা ঠিক নয়।'

'দেখ ডেভিড তোমার বোঝা উচিত, এ মেয়েটি তোমার শ্রেণীর বা তোমার মতো সভ্য সাংস্কৃতিক জগতের মেয়ে না, জাতিগত মিলও নেই। ও নিছক একটা আদিম অধিবাসী, এ অঞ্চলের মাটিতেই ওর জন্ম, এই মাটির সঙ্গেই ও যুক্ত। ওর দেহমন স্বভাব এই মাটি আঁকড়ে রয়েছে। সেখান থেকে ওকে তুলে আনার চেষ্টা করা মানে পণ্ডশ্রম। স্বভাব-প্রকৃতিতে, চালচলনে, সব বিষয়েই যে বুনো, আজীবন সে বুনোই থাকে, ওই বুনো অবস্থাতেই শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করে। কিন্তু

তুমি বা আমি—আমরা তো ওরকম নই। আমরা সভ্য, উন্নততর স্বভাব ও মানসিক শক্তি সম্পন্ন জাতি। আমরা রুচি ও সংস্কৃতিবান মানুষ, পৃথিবীর সেরা প্রাণী বলেই এই পৃথিবীতে কর্তৃত্ব এখন আমাদের হাতে। আমরা আমাদের জন্যই সৃষ্ট। কাজেই শুধু মানুষ বললেই সব বোঝা যায় না; সুখ ও উন্নত জীবন যাপনের জন্য সর্বাগ্রে বিশ্লেষণ করে বুঝতে হয় মানুষের শ্রেণী বা ধরন। ওটা একমাত্র যুক্তি ও অনুভূতি দিয়ে বোঝা যায়। তোমার প্রতিটি স্বাভাবিক বৃত্তি ও প্রবণতা তাই চায় নিজের শ্রেণীর লোককে। তুমি এটা অস্বীকার করতে পার না। এটা তোমার পিতৃপুরুষের চিন্তারই উত্তরাধিকার। সে ঐতিহ্য তুমি কেমন করে অস্বীকার করে নিজেকে বিচ্ছিন্ন করে রাখবে? তোমার পূর্বতন পুরুষরা শুধু হাজার হাজার নয়, লক্ষ লক্ষ বছর ধরে টিকে আছে, ও এগিয়ে চলেছে। তুমি নিশ্চয়ই সে ধারাকে রাতারাতি লোপ বা রোধ করে দিতে পার না। সভ্যতার অগ্রগতি স্তব্ধ হতে পারে না। তোমার পূর্ববর্তীরা তা অনুমোদন করবে না। ব্যক্তিগত বাসনা বা ইচ্ছার চেয়ে সহজাত বৃত্তিগুলোর শক্তি অনেক বেশী। জেনে রাখো, তোমার জাতীয় ঐতিহ্য ও ধর্ম তোমার ব্যক্তিগত ইচ্ছা-অনিচ্ছার ঊর্ধ্বে, এবং তারা অনেক শক্তিশালী।··· তাই বলছি ডেভি, চলে এস আমার সঙ্গে, আমরা বয়সে তরুণ, সত্যিই আমাদের জীবনটা বড় সুন্দর—চলো, আর দেরি করো না, লক্ষ্মীটি!'

ওদিকে কুটিরের বাইরে উইনাপি কুকুরগুলোকে খাবার দিচ্ছে দেখে ডেভিড নিজের ঘাড়টা সোজা করতে গিয়েই বুঝল তার কণ্ঠ এখনও সিথারের কোমল বাহুপাশে আবদ্ধ। সিথার ইতিমধ্যে নিজের গাল ডেভিডের গালে সজোরে চেপে ধরেছেন। মুহূর্তের মধ্যে ডেভিডের নীরস জীবনের বিগত বছরগুলির বেদনা ও দুঃখ মূর্ত হয়ে উঠল; নিষ্করুণ প্রতিকূল শক্তির সঙ্গে ব্যর্থ সংগ্রামের গ্লানি, রক্ত-জমাট করা শীত, খাদ্যাভাব, নির্দয়

প্রকৃতির হিংস্র প্রচণ্ডতায় অসহনীয় দুঃখ এবং জৈব প্রয়োজনের ধরা ছোঁয়ার বাইরে অন্তর্লোকের মর্মদাহী গ্লানি; আর ঠিক সেই মুহূর্তেই তার পাশে দীর্ঘ আকাঙ্খিত জীবনের হাতছানি, রৌদ্র-করোজ্জ্বল কবোষ্ণ ভূমির আহ্বান, হাসিগান আনন্দের সুস্পষ্ট প্রতিশ্রুতি এবং ফুটন্ত যৌবনের ভ্রষ্ট সুখ-স্বপ্নের পুনরায় হাতছানি। ডেভিড বিহ্বল হয়ে দেখলেন ছায়াছবির দৃশ্য পটের মত চলেছে বিস্মৃত অতীতের কত দৃশ্য, কত ঘটনা, কত ছবি, শুনলেন সঙ্গীতের মূর্ছনা, নূপুরের ঝঙ্কার এবং হাসির হিল্লোল। নিরালা কুটিরে তখন মিসেস সিথারের আকুল আবেদন তার কানে এলো, এসো ডেভি, চলে এস। আমরা আছি; পরস্পরকে সুখী করার জন্যই আমরা আছি। আমাদের পায়ের তলায় থাকবে মুক্ত উদার পৃথিবী, তার সমস্ত আনন্দ, সব গান ও সুখ। আকণ্ঠ পান করে ভরিয়ে দেব এই রিক্ত জীবন। আর দেরি না ডেভি, চলে এস, চলে এস। মিসেসের মৃদু কম্পিত তনু দেহটি তখন ডেভিডের বাহুপাশে দৃঢ়বদ্ধ। ডেভিড আরও ঘন হয়ে উঠতেই হঠাৎ বাইরের ক্ষুধার্ত কুকুরগুলোর গোঙানি, চিৎকার এবং উইনাপির অনুশাসনের কর্কশ কণ্ঠ কাঠের দেয়ালের ফাক-ফোকর দিয়ে ক্ষীণ হয়ে ডেভিডের কানে বাজতে লাগল। হঠাৎ তার সম্মুখে আর এক দৃশ্য ফুটে উঠল।

অদূরে এক ঝোপের মধ্যে ধস্তাধস্তি, লড়াই—প্রলয় কাণ্ড। একদিকে বিকট চেহারার, ঝাঁকড়া লোমশ এক পা ভাঙা ভয়ংকর ভাল্লুক, অপর দিকে কুকুরের পালের কান ফাটানো চিৎকার। উইনাপি তীব্র শিস দিয়ে কুকুরগুলো লেলিয়ে দিচ্ছে, আক্রমণের মুখোমুখি শরীরের শেষ শক্তিটুকু দিয়ে প্রাণপণে রুখছে রক্ত পিপাসু প্রাণীটাকে। মাজাভাঙা, পেটফাটা কুকুরগুলোর যন্ত্রণা-সূচক আর্তনাদের সামনেই পশু ও মানুষের রক্তে পবিত্র শুভ্র বরফ লালে লাল হয়ে উঠছে।

দুর্দান্ত হিংস্র ভাল্লুক কখনও নিচু হয়ে, কখনও বা ঘাপটি মেরে সক্রোধে ঝাপটা ঝাপটি করছে উইনাপির সঙ্গে এবং সেই মারাত্মক আক্রমণের মুখে এলোকেশী, বিস্ফারিত রক্তচক্ষু নিয়ে উইনাপি লম্বা ছুরিখানা বেপরোয়া চালিয়ে যাচ্ছে ভাল্লুকের শরীরে।

কথাটা মনে পড়া মাত্র ডেভিডের কপালে বিন্দু বিন্দু স্বেদ দেখা দিল। এক ঝটকায় দেহলগ্না মিসেসকে সরিয়ে দিয়ে নিজেই দেয়ালের দিকে টলে পড়ল। মিসেস বুঝলেন শুভলগ্ন এসেছিল কিন্তু ডেভিডের অন্তরে কি ভীষণ দ্বন্দ্ব চলছিল তা অনুমান করতে না পেরে ধরে নিলেন তাঁর জয়ের মুহূর্তেই চূড়ান্ত পরাজয় ঘটে গেছে।

'ডেভি! ডেভি!'—চিৎকার করে উঠলেন মিসেস, 'আমি তোমায় ছাড়বনা। যদি আমার সঙ্গে যাওয়ার ইচ্ছে না থাকে, আমিই এখানে থেকে যাব। আমার কাছে এখন বিশাল পৃথিবীটা তোমার তুলনায় নিতান্তই ছোট। এই উত্তরাঞ্চলেই, রেড ইণ্ডিয়ান পত্নী হয়েই তোমার কাছে থেকে যাব। তোমার খাদ্য আমিই তৈরি করব, কুকুরগুলোকে স্বহস্তে খাওয়াব, তোমার জন্য দানা ভেঙে কফিগুঁড়ো করব এবং তোমার সঙ্গে তালে তালে বৈঠা ফেলব—আমি পারব, সবই পারব—বিশ্বাস করো, এ সব কাজের পর্যাপ্ত শক্তি আমার শরীরে আছে।'

সিথারের আবেগের দৃঢ়তা দেখে ডেভিড বুঝলো সে যথার্থই পারবে। তবু সিথারকে তিনি একটু দূরে ঠেলে দিলেন। ইতিমধ্যেই ডেভিডের মুখে ভাবের স্পষ্ট পরিবর্তন এসেছে। চোখমুখে একটা রুক্ষ পাণ্ডুরতা ক্ষণকাল পূর্বের প্রেমের অরুণ-আভাকে গ্রাস করে ফেলেছে। তবুও মিসেস সিথার আগ্রহে দৃঢ়কণ্ঠে বলতে লাগলেন, 'আমি পিয়ের ও অন্যান্য মাঝিদের মজুরি মিটিয়ে বিদায় করে তোমার সঙ্গে, তোমার সুখদুঃখের অংশীদার হয়ে থেকে যাব। ছোট বড় কোন যাজক না

পেলেও কিছু আসে-যায় না, তোমার সঙ্গে খুশী মত যাওয়া আসা করব। ডেভি! ডেভি! আমার কাতর আবেদনে একবার অন্তত সাড়া দাও! তুমি বলছ অতীতে আমি তোমার প্রতি অন্যায় করেছি—সত্যিই করেছি, আমাকে তার প্রায়শ্চিত্তের সুযোগ দাও। যদি অতীতে তোমার প্রেমের সঠিক মূল্যায়নে ভুল করে থাকি, যথার্থ মূল্যায়নের একবার—একবার মাত্র সুযোগ দাও আমাকে। আমি দেখতে চাই সে শক্তি আমার আছে কি না।' বলতে বলতে মিসেস ধপ করে মেঝের ওপর বসে পড়ে ডেভিডের পা জড়িয়ে ফোঁপাতে ফোঁপাতে বললেন—'আবার মিনতি করছি, তোমার বুকে আমায় জায়গা দাও, দয়া করে আর একবার! ভেবে দেখো, বছরের পর বছর আমি প্রতীক্ষা করে আছি, তোমার জন্য! কি অসহ্য মনকষ্টে দিন যাপন করেছি, তা তোমার ধারণার অতীত।' ডেভিড মাথা নিচু করে সিথারকে ধরে খাড়া করলেন এবং দরজা খুলে বাইরে গিয়ে বললেন, 'অসম্ভব! তা হতে পারে না। এখানে শুধু আমাদের দুজনকে নিয়েই বিচার করলে চলবে না। আমাকে অবশ্যই বিদায় নিতে হবে। আমি তোমার নিরাপদ প্রস্থান একান্ত কামনা করি। ষাট মাইল পাড়ি দেবার পর, তোমাকে বেশ দুর্যোগের মুখে পড়তে হবে, কিন্তু ভরসার কথা তোমার সঙ্গের মাঝিরা সুদক্ষ এবং নামকরা। আমার বিশ্বাস তারা অনায়াসে এ বিপদ কাটিয়ে যেতে পারবে। বিদায় সিথার—'

মিসেস ইতিমধ্যেই নিজেকে সংবরণ করে নিলেও ডেভিডের দিকে শূন্য দৃষ্টি মেলে বললেন, 'যদি—যদি—উইনাপি—' হঠাৎ কেঁপে উঠে তিনি থেমে গেলেন। কিন্তু না-বলা কথাটি বুঝে নিতে ডেভিডের কোন অসুবিধা হল না। তাই উত্তরে বললেন, 'হ্যাঁ, তাই হবে।' কিন্তু বলে ফেলেই কথাটার অর্থ অনুধাবন করে আবার বললেন, 'এ অসম্ভব কল্পনা। কোন সম্ভাবনা নেই। এ ধারণা করা বৃথা।'

মিসেস সিথারের মুখমণ্ডল প্রশান্ত উজ্জ্বলতায় দীপ্ত হয়ে উঠল, তিনি মুখটি উঁচু করে বললেন, 'একটিবার আমায় চুমু খাও।' পরমুহূর্তেই মুখ ফিরিয়ে প্রস্থান করলেন। নাবিকদের মধ্যে কেবল পিয়েরই তাঁর ফিরে আসার অপেক্ষায় জেগে আছে। তিনি তাকে হুকুম দিলেন, 'তাঁবু গুটিয়ে নাও, আমরা এক্ষুনি রওনা দেব।' আগুনের আলোয় মিসেসের ম্লান মুখে হতাশার কালো ছাপ পিয়েরের তীক্ষ্ণ দৃষ্টি এড়িয়ে গেল না। তবুও অসময়ের কড়া আদেশ স্বাভাবিকভাবে মেনে নিয়েই জিজ্ঞেস করল, 'কোন দিকে রওনা দেব ম্যাডাম ? ডাওসনের দিকে ?' মিসেস সহজ গলায় জবাব দিলেন, 'না উজানে, ডিয়ারের দিকে নৌকা ছাড়ো।'

আদেশ মুহূর্তের মধ্যে বলবৎ হল। ঘুমন্ত মাঝি মাল্লাদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে, কিল ঘুষি ধাক্কা দিয়ে, কারও বা গায়ের কম্বল টেনে হিঁচড়ে জাগিয়ে দিল পিয়ের। অস্থির অতিব্যস্ত পিয়েরের কাজ সমাধা করার কড়া আদেশে অন্যান্য মাঝি-মাল্লারা ভেতর ভেতরে ফুঁসতে লাগল।

দেখতে দেখতে তাঁবু গোটান হয়ে গেল। হাঁড়ি, কড়াই, ভাঁজকরা কম্বল লোকের হাতে হাতে নৌকোয় উঠে গেল। যতক্ষণ না সেগুলো সরিয়ে জায়গা করে মিসেসের নরম গদীর বিছানা হল, সিথার ঠায় তীরে দাঁড়িয়ে রইলেন।

পিয়ের মাল্লাদের বোঝালো, 'আমাদের নৌকো প্রথমে যাবে সোজা এই দ্বীপগুলোর প্রান্তে, তারপর পাশের খাল বেয়ে যাব। স্রোত কম বলে এগোতে বেশী দেরি হবে না।' ঘাসের ওপরে হঠাৎ সড় সড় আওয়াজ হতেই ওরা ঘাড় ফিরিয়ে দেখল, রেড ইণ্ডিয়ান মেয়েটি একপাল নেকড়ে ধরার কুকুর নিয়ে তাদের দিকেই আসছে। মিসেস দেখলেন মেয়েটির চোখে মুখে কুটিরে থাকাকালীন বিরক্তির ছাপের পরিবর্তে এখন উত্তেজিত ও ক্রুদ্ধ ভাব ফুটে উঠেছে। এসেই মিসেসকে সে সোজা প্রশ্ন করল, 'আমার লোকটার কাছে কেন

এসেছ? ওকে নিয়ে তোমার কি দরকার? ওকে কাছে বসিয়ে সারাক্ষণ তো কুমতলব নিয়ে তাকিয়েছিলে, বলি ব্যাপারটা কি? জিজ্ঞেস করলাম ডেভি, তোমার কি অসুখ করেছে? কোন উত্তরই পেলাম না। পরে অবশ্য বলল—উইনাপি, তুমি এখন চলে যাও। আমি ভাল আছি। তুমি কি করতে চাও ওকে? তুমি বড় খারাপ মেয়েছেলে।' ডেভিডের এই অসভ্য জীবন সঙ্গিনীর দিকে উৎসুক দৃষ্টিতে তাকিয়ে তাঁর মনে হল ঘন অন্ধকারের মধ্যে তিনি একাকী যাত্রা শুরু করেছেন।

বিদেশী ভাষার অপরিচিত শব্দ দ্রুত মুখে আসছেনা বলে নিয়ম মাফিক কায়দায় উইনাপি ধীরে ধীরে বলল, 'আমি তোমাকে নষ্ট স্ত্রীলোক মনে করি। ভালয় ভালয় বিদেয় নাও; আর এদিকে এসো না। কি ভাবছ? শোনো নারী, দেখতে তুমি রূপসী, তোমার তো কত পুরুষ জুটবে। চোখ তোমার আকাশী রঙের, চামড়াও নরম আর সাদা'—বলতে বলতে পাটকিলে রঙের শক্ত তর্জনীটা দিয়ে সে মিসেসের গালে মৃদু খোঁচা দিল। কারেন সিথার কিন্তু অবিচলিত। পিয়ের আশঙ্কায় কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে দ্রুত এগিয়ে আসছিল কিন্তু মিসেসের ইশারা তাকে থমকে দিল। পিয়ের ছ'পা পিছিয়ে এমন ভাবে দাঁড়াল যাতে ছজনের কথাবার্তা কানে না আসে কিন্তু মনে মনে ভাবতে লাগল তেমন দরকার পড়লে মিসেসের সামনে পৌঁছতে কটা লাফ লাগবে।

মিসেসের অপর গালটিও উইনাপি খুঁটতে খুঁটতে স্বগতোক্তি করল, 'ইশ্ কী ধবধবে সাদা! শিশুর মত নরম বটে!' তারপর হাত তুলে নিয়ে আগের কথার জের টেনে বলল, 'বিস্থির নামকরা মশার কামড়ে এ চামড়ায় দাগ পড়বে, ফুলেও যাবে! বাব্বা! আমার শরীরটা তো বলতে গেলে একেবারে ঝাঁঝরা হয়ে গেছে, ব্যাথায় হাত দিতে পারি না। ঝাঁকে ঝাঁকে মশা আসে, কামড়ে শরীর ভরে যায়। মশার দল এসে পড়বার আগেই তোমার চলে যাওয়া ভাল'—নদীর

ভাটির দিকে একবার তাকিয়ে, ফের উল্টো দিকে আঙুল দেখিয়ে বলল, 'সেন্ট মাইকেলের দিকে, ডিয়াতে চলে গেলে এই মশার হাত থেকে তুমি রেহাই পাবে। বিদায়—'

কথা শেষ না হতেই মিসেস সিথার দু'হাতে উইনাপির গলা জড়িয়ে আলিঙ্গন করে কেঁদে ফেললেন, 'ওঁর সেবাযত্নের ত্রুটি করো না. কোন ত্রুটি যেন না হয়।' বলেই পিছনে খানিকটা নেমে, মুখ ফিরিয়ে বললেন, 'বিদায়!'

আগে উনি নৌকোয় উঠলেন; পিছনে পিয়েব। নোঙর তুলে, হাল যথাস্থানে ঘুরিয়ে যাত্রারম্ভের সংকেত দেওয়া হল।

লা গয়ের একটি ফরাসী গানের ধুয়া তুলল আর স্তিমিত নক্ষত্রালোকে মাল্লারা যেন অস্পষ্ট প্রেত মূর্তির সারি দেখতে পেল। দাঁড় এবং হালের সুকৌশল চালনায় নোকাখানি দ্রুতবেগে কালো জলরেখা কেটে ঘন অন্ধকারে মিশে গেল।

অনুবাদ। সাধন চট্টোপাধ্যায়

ব্রুনো আপিৎস

এত এখন পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে, ক্যাম্পের পাশের জমিতে একটা গ্যাস চেম্বার তৈরি হচ্ছে। কারাগারের একজন কর্মী হল অসওঅলড্। এতদিনে সে ব্যাপারটা বুঝতে পারল। ফোরম্যান আর্নেস্ট অথচ কয়দিন ধরে বারবার এই কথাটাই ওকে বোঝাতে চেষ্টা করে এসেছে। প্রায় দিন পনের আগে যেদিন একশোটি গ্রীক ইহুদী মেয়ে এখানে এল, তখনই ওর সন্দেহ হয়েছে। কিন্তু অসওঅলড্ ওর কথায় বিশ্বাস না করে বলেছে, 'গ্যাস চেম্বার? তুমি পাগল হয়েছ আর্নেস্ট। কেন, কার জন্যে?'

আর্নেস্ট যখন বলল, ওই মেয়েদেরই জন্যে; সে তখন হেসেই উড়িয়ে দিয়েছিল।

অসওঅলড্ তখন বলেছে, 'যত বাজে কথা। এই মেয়েরা যে-ক্যাম্প থেকে আসছে সেখানে প্রতিদিন হাজার হাজার লোককে গ্যাস দিয়ে মারা হয়। মাত্র একশোটি মেয়েকে পৃথিবীর এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্তে পাঠিয়ে, কেবল তাদেরই জন্যে সেখানে গ্যাস চেম্বার তৈরি করার কি কারণ থাকতে পারে? সেখানেই যে-কাজ আরও সহজ হতে পারত, তার জন্যে এখানে তাদের নিয়ে আসার কি দরকার ছিল?'

আরও দিন পনের পরে ঘর তৈরি শেষ হল। ঘরের মাঝখানে

একটি গর্ত, তার মধ্যে একটি বালতি। বাইরে থেকে একটা নল এসে ওই বালতিতে পড়েছে। ভারী লোহার গরাদ দিয়ে জায়গাটি সুরক্ষিত করা হয়েছে।

আর্নেস্ট বলল, 'আমি জানি। ওই বালতিতে এক রকম রাসায়নিক পদার্থ রাখা হয়। নল থেকে ফোঁটা ফোঁটা তরল পদার্থ তার সঙ্গে মিশে গ্যাসের সৃষ্টি করে।'

এর পরে অসওঅলডের আর প্রতিবাদ করার উপায় থাকে না। সে ভাবতে থাকে—তবে এই পরিত্যক্ত স্থানে যে-ঘরটা তৈরি হয়েছে সেটা গ্যাস চেম্বারই হবে এবং ওই মেয়েদেরই জন্যে।

সেই রাতে অসওঅলডের চোখে আর ঘুম নেই। দশ বছর আগে সে বন্দী হয়ে ঢুকেছে কারাগারে। এত দিনের মধ্যে এই প্রথম ও মেয়ে দেখল। পুরুষদের ঘরের পেছনের ব্যারাকে মেয়েদের থাকার ব্যবস্থা হয়েছে। সে সব ঘরের চারপাশে মজবুত কাঁটাতারের বেড়া। পরদিন সকালে ডাক্তারের সঙ্গে মেয়েদের ঘরে যেতে হল। মেয়েরা কথা বন্ধ করল, কিন্তু একজনও উঠে দাঁড়াল না। কেউ কেউ কাজ থেকে চোখ তুলে তাকাল। কয়েদীদের ছেঁড়া জামাকাপড় তাদের সেলাই করতে দেওয়া হয়েছে। ডাক্তার ধীরে ধীরে হেঁটে যাচ্ছেন। এসথারের সামনে গিয়ে জিজ্ঞেস করলেন, 'তুমি জার্মান ভাষা জান?' এসথার হাতের কাজ রেখে মাথা নাড়ল। তখন ওকে আর অন্য দুটি মেয়েকে দেখিয়ে ডাক্তার বললেন, 'ওদের আমার কাছে নিয়ে এস।'

রক্ত নেবার সব ব্যবস্থা ঠিক রাখার জন্যে ডাক্তার অসওঅলড্‌কে নির্দেশ দিয়ে বললেন, 'এর মধ্যে মেয়েগুলোর সম্বন্ধে এইসব জ্ঞাতব্য বিষয়ও জেনে নিও—ওদের জন্মের তারিখ, মা বাবার কথা, ওদের পেশা কি আর সমস্ত রোগের বর্ণনা।'

অসওঅলডের জন্যে মেয়েরা অধৈর্য হয়ে অপেক্ষা করছিল। যে তিনটি মেয়েকে বেছে নেওয়া হয়েছে, তাদের অদৃষ্টে কি আছে জানবার জন্যে সকলে উৎসুক। এসথার চুপ করে একপাশে দাঁড়িয়ে-

ছিল। অন্য মেয়েদের জানাবার জন্যে অসওঅলড্ ওকে বলল যে এই ডাক্তারের বিভিন্ন জাতিগত বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে গবেষণার আগ্রহ আছে। তাই তাদের কয়েকজনের রক্ত পরীক্ষা করতে চান।

'রক্ত ?'

'আরে না না। একটা মশার কামড়ে যতটা রক্ত বেরোয়, তার বেশী নয়।'

এসথার গ্রীক ভাষায় ওর কথা তাদের বুঝিয়ে দিল। অসওঅলড্ নিচু গলায় ওকে জিজ্ঞেস করল, 'তোমার কি ভয় করছে ?' ও মাথা নেড়ে বলল, 'তুমি যদি বল যে ভয়ের কোন কারণ নেই, তবে আমরা তোমার কথাই বিশ্বাস করব।' রক্ত নেবার পর অন্য দিনের মতো একটা নির্জন জায়গায় এসথারের সঙ্গে ও দাঁড়িয়ে রইল। হেসে জিজ্ঞেস করল, 'খুব লেগেছিল ?'

এসথার শান্তভাবে উত্তর দিল, 'এখানে আমরা দু-সপ্তাহ ধরে রয়েছি। কিছুই জানি না আমাদের কি হবে। আগে যে-ক্যাম্পে ছিলাম সেখানে যে-কোন দিন মৃত্যু ঘটতে পারত। জানতাম সেখানে কেবলমাত্র একটি পথই ছিল। কিন্তু এখানে ? এখানে আমরা কত ভাল আছি। আমাদের দিকে কেউ তাকায় না, বা আমাদের বিরক্ত করে না। এই অল্প একটু রক্ত আজ নেওয়া হল, আর সেদিন সেই যে ডাক্তার দেখতে গিয়েছিলেন - ব্যাস, এইটুকুই। চারদিক শান্ত। এখানকার বাতাস কত পরিষ্কার আর কি হালকা। দিনগুলো কত উজ্জ্বল।' হঠাৎ অসওঅলডের দিকে তাকিয়ে এসথার বলল, 'এসব দিনের কি অর্থ আমাকে বলতে পার ?'

'অর্থ ? কিছুই না।'

'সত্যিই কি কিছু না ? সব যেমন আছে ঠিক তেমনি থাকবে ? আমার বন্ধুরা সবাই আর আমি প্রতিদিন এই ভাবনায় অস্থির হয়ে রয়েছি যে আমাদের কি হবে।'

'কেন তোমরা ভাবছ ? তোমরা এখানে আসাতে আমরা খুশি

হয়েছি। তোমরা মেয়েরা আমাদের পুরুষদের জীবনে যে কতখানি আলো আর উত্তাপ নিয়ে এসেছ, তোমরা নিজেরাই জান না!'

এসথার সরে গিয়ে জানলার কাছে দাঁড়াল। বলল, 'সেইটাই নিশ্চয় আমাদের এখানে থাকার কারণ নয়।'

'আমি তো অন্য কোন কারণ জানি না।'

এসথার বলল, 'তোমার উচিত আমাকে সব কথা বলা। আমি ভীতু নই, সত্যকে সহজে গ্রহণ করতে পারি। মৃত্যুকে আমার ভয় নেই। যে-ক্যাম্প থেকে আমি এসেছি সেখানে প্রতিদিন হাজার হাজার বার মরবার শিক্ষা আমার হয়ে গেছে। সেখানে মৃত্যু যেন বিভিন্ন বেশে আমাদের সঙ্গী হয়ে ছিল। জীবন সেখানে ছিল মৃত্যুরই ছায়া। আমি জানি যে আমরা এই ক্যাম্প থেকেও জীবন্ত কখনও ফিরব না। কিন্তু এই যে অনিশ্চয়তার বিভীষিকা, সেইটাই আমাদের পক্ষে অত্যন্ত কষ্টকর।'

'এ সমস্তই তোমার অলীক কল্পনা এসথার', বলল অসওঅলড্। তিক্ত হাসল এসথার, 'এখানে যেন কল্পনার কত সুযোগ! আমি শুধু জানতে চাই কি ভাবে আমাদের মরতে হবে। সেখানে আমাদের গ্যাস চেম্বারে টেনে নিয়ে যাওয়া হত। এখানে কি হবে? তোমাদেরও কি গ্যাস চেম্বার আছে?'

অসওঅলড্ বলল, 'তুমি আমাকে কষ্ট দিচ্ছ, এসথার।'

'আমি নিজেই নিজেকে কষ্ট দিচ্ছি। আমি তো মরতে চাই না, অসওঅলড্। সে সাহস আমার একটুও নেই—এতক্ষণ শুধু ভান করছিলাম।' এসথার ধপ করে বেঞ্চে বসে পড়ে চুলগুলো এলোমেলো করে নিজের হাত দুখানা মোচড়াতে লাগল।

অসওঅলড্ অসহায়ভাবে ওর সামনে এসে দাঁড়াল। শেষ পর্যন্ত সে সাহস করে এসথারের চুলে হাত রাখল।

সেই কোমল স্পর্শের আকুতি এসথারের অন্তরে আঘাত করল। অসওঅলড্ যে-কথা ওর কাছে প্রকাশ করতে সাহস পায়নি, এই

স্পর্শেই তা জানা হয়ে গেল। ধীরে ধীরে উঠে দাঁড়িয়ে অনেকক্ষণ অসওঅলডের দিকে তাকিয়ে এসথার বলল, 'তোমার উত্তরের জন্য ধন্যবাদ অসওঅলড্।'

'আমি তোমাকে কিছুই বলিনি, এসথার।'

এসথার চোখ বুজে যেন সেই অন্ধকারকে সম্বোধন করে বলল, 'যে-জন্তুকে বাঁচাবার আর উপায় নেই তাকে ঠিক এই ভাবেই মানুষ আদর করে।'

কিছুক্ষণ সে সেখান থেকে নড়ল না, যেন অসওঅলডের সেই কোমল স্পর্শ সে তখনও অনুভব করছিল। তারপর নিজেই হেসে ফেলল, 'আমার প্রায় কান্না পেয়ে গিয়েছিল। মেয়েরা এরকমই হয়। কিন্তু তোমরা ছেলেরা ঢের বেশী সাহসী। তোমরা যদি জান যে মৃত্যু তোমাদের জন্যে অপেক্ষা করছে, তবে তোমরা বলবে—কি আর করব, উপায় নেই।'

ওর কথার উত্তর দেবার মতো জোর অসওঅলড্ নিজের মধ্যে খুঁজে পেল না।

ডাক্তার অসওঅলড্‌কে ফোনে জানালেন, 'এক ঘণ্টার মধ্যে আমি আসছি। যন্ত্রপাতি প্রস্তুত রাখ, আর কি যেন নাম মেয়েটির, তাকেও নিয়ে এস।'

এক ঘণ্টা সময় আছে। অসওঅলড্ তাড়াতাড়ি যন্ত্রপাতি এনে সব গুছিয়ে ফেলল। তারপর এসথারকে ডেকে নিয়ে এল। আসার পথে ও যেখানে কাজ করে সেসব জায়গা এসথারকে দেখাতে দেখাতে নিয়ে আসছিল। অফিসের ঠিক পাশেই ওর শোবার ঘর, মাঝখানে কেবল একটা সরু দেয়াল। সেই ঘরে এসথারকে এনে ওর কানে কানে বলল, 'এখানে জোরে কথা বলার উপায় নেই।'

এসথার ওর দিকে তাকাতেই ওকে দেখিয়ে বলল, 'দেয়ালগুলো এত পাতলা যে আমাদের প্রত্যেকটি কথা ওরা শুনতে পাবে।' এসথার চুপি চুপি বলল, 'তোমার ঘরখানি সুন্দর। এ ছবিটা কার?'

'আমার মায়ের।'

এসথার অনেকক্ষণ ধরে ছবিখানা দেখল. জিজ্ঞেস করল, 'তিনি কি এখনও বেঁচে আছেন ?'

অসওঅলড্ মাথা নাড়ল।

'দেশে এমন কোন মেয়ে আছে যে তোমাকে ভালবাসে ?'

অসওঅলড্ অপ্রতিভ হয়ে বলল, 'আমি যখন জেলে আসি তখন আমার বয়েস মাত্র সতেরো বছর।'

এসথার কিছু বলতে চাইল, কিন্তু মুখ দিয়ে শব্দ বেরোল না। তাড়াতাড়ি নিজেকে সামলে নিয়ে মৃদুস্বরে বলল, 'আহা, বেচারা !'

অসওঅলড্ ওর হাত দুখানি ধরে বলল, 'তুমিই আমার জীবনে প্রথম মেয়ে। যখন থেকে তোমাকে দেখেছি, আমি বুঝতে পেরেছি···'

এসথার ওর বিছানার একপাশে এসে বসল। দুজনেই নিশ্চুপ। এসথার ওর হাতখানি নিয়ে নিজের কপালে চেপে ধরল। অনেকক্ষণ ওরা এই ভাবেই বসে রইল। দেয়ালের ওপাশে অফিস। সেখানকার শব্দ শোনা যাচ্ছিল। এদের ঘর এত নিস্তব্ধ, পাশের ঘরের সব কথা ইচ্ছে করলেই শুনতে পেত। তবে সেই সময়ে ওদের কাছে সেসব কথার কোন মূল্যই ছিল না। হঠাৎ এসথার সোজা হয়ে বসে মন দিয়ে কি যেন শুনল। পাশের ঘরের কথাবার্তা শুনে অসওঅলড্ও যেন অসাড় হয়ে গেল। এসথার লাফিয়ে উঠে দেয়ালে কান পাতল। শুনতে পেল···'এই মেয়েরা যদি জানত যে গ্যাস চেম্বারই ওদের ভাগ্যে আছে···'

অসওঅলড্ দৌড়ে অফিসে গিয়ে বলল, 'তোমাদের কি মাথা খারাপ হয়েছে ? এখানে থেকে যে সব কথা শোনা যাচ্ছে, তা কি তোমরা জান না ?'

তাড়াতাড়ি আবার এসথারের কাছে এসে দরজাটা বন্ধ করে দিল। এসথার তখনও দেয়াল ঘেঁসে দাঁড়িয়ে। একটু হেসে মৃদুস্বরে ও বলল, 'আমি অনেকদিন আগে থেকেই জানি।'

অসওঅলড্ এমনভাবে এসথারকে দেয়ালের কাছ থেকে ছিনিয়ে আনল যেন আর একটু হলে ওর গায়ে আগুন ধরে যেত। তারপরে যেন ওকে নিরাপদ আশ্রয় দেবার চেষ্টায় জোরে নিজের কাছে টেনে রাখল।

পরে তারা ডাক্তারের ঘরে এসে তাঁর অপেক্ষায় রইল। দুজনের মনে একই চিন্তা। এসথার ফিস ফিস করে বলল, 'কখন হবে?' অসওঅলডের মাথা তোলারও সাহস নেই। বলল, 'আমি জানি না।'

'আমাদের মধ্যে তো আর কিছুই গোপন নেই অসওঅলড্, এখন তুমি আমাকে সব বলতে পার।'

'সত্যিই আমি জানি না, এসথার।'

এসথার আর কিছু বলল না। টেবিলে যন্ত্রপাতির দিকে স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল।

ডাক্তার এসে মাপ নিতে শুরু করলেন। প্রথমে এসথারের মাথার মাপ নিলেন। অসওঅলড্ লিখে রাখল। তারপর তিনি বললেন, 'এবার জামা-কাপড় খুলে ফেল।' এসথার ভয় পেয়ে গেল। যেন নিজেকে রক্ষা করার জন্যে হাত দিয়ে শরীর ঢাকল। ডাক্তার কঠোর স্বরে বললেন, 'শিগগির কাপড়-চোপড় খোল।' অসহায়ভাবে সে ভয়ে ভয়ে সেই ঘরের পুরুষ দুজনের দিকে তাকাল। টেবিল চাপড়ে ডাক্তার আবার বললেন, 'তাড়াতাড়ি কর, তাড়াতাড়ি কর।'

বিবর্ণ মুখে কাঁপতে কাঁপতে এসথার বেল্ট আর বোতাম খুলে লজ্জায় মাথা নিচু করে দাঁড়াল।

অসওঅলড্ দৃঢ়পদে ডাক্তারের সামনে গিয়ে বলল, 'এবার তবে আমি যেতে পারি?' ডাক্তার অবাক হয়ে ওর দিকে তাকালেন, 'কেন, কি হয়েছে?'

'না না, এবার আমাকে যেতে দিন'—বলেই অসওঅলড্ সে-ঘর ছেড়ে বেরিয়ে গেল। ডাক্তার ওর পিছু পিছু ছুটে গিয়ে চেঁচিয়ে বললেন, 'তোমাকে এখানেই থাকতে হবে।'

অসওঅলডের মুখ উত্তেজনায় বিবর্ণ, ও জানে এ জন্যে পরে বিপদ ঘটতে পারে। তবু ওভাবে চলে আসায় যে কাজ হয়েছে তা ও বুঝতে পারল। 'আমি তোমার নামে রিপোর্ট করব, নিজেকে কি ভেবেছ তুমি ?' বলতে বলতে ডাক্তার নিজের ঘরের দিকে গেলেন। 'যাও, কয়েদাকে এখনি এখান থেকে নিয়ে যাও'—অসওঅলড্‌কে নির্দেশ দিয়েই তিনি চিৎকার করে এসথারকে বললেন, 'এখনই বেরিয়ে যাও।' এসথার বেল্টটি তুলে নিয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে এল।

অসওঅলড্ অপেক্ষা করছিল, এসথার মাথা নিচু করে ওর সঙ্গে গেল।

সেদিন থেকে এসথারের মধ্যে পরিবর্তন এল। সে যেন এখন অন্য মানুষ। ওর মুখের ভাবও বদলে গেছে।

দুপুরে খাবার সময় ডাক্তার ক্যাম্প ছেড়ে চলে গেলে অসওঅলড্ এসথারকে দেখতে গেল। মেয়েটিও খালি ঘরখানায় ওর জন্যে অপেক্ষা করছিল।

এখন ওর মনও আগেকার চেয়ে অনেকটা নিশ্চিন্ত। তবু এক-এক সময় ওর মধ্যে সেই পুরনো ভয়টা জেগে ওঠে। অসওঅলড্ তা টের পায়। তখন দুজন দুজনকে এমনভাবে জড়িয়ে ধরে যেন একে অন্যকে নিজের মধ্যে লুকিয়ে ফেলতে চায়। মন শান্ত হলে পর এসথার জানালার ধারে গিয়ে বাইরে তাকায়। বলে, 'মেঘগুলো কী সুন্দর, দেখ—আর আকাশটা কী নীল !'

ক্লান্ত স্বরে অসওঅলড্ বলে, 'এখন এসব দিকে কি করে যে তোমার চোখ পড়ে ?' জানলার গরাদে কপাল চেপে রেখে এসথার বলে ওঠে—'এসব ছাড়া অন্য কোন দিকেই আমার দৃষ্টি যায় না। এখন আমি কেবল আকাশ আর মেঘই দেখি। আহা, এসব যদি আমার সঙ্গে নিয়ে যেতে পারতাম !'

অসওঅলড্ ওর কাছে গিয়ে ওর কাঁধে নিজের মাথাটি রাখল। এসথার জানলা দিয়ে বাইরের দিকে তাকিয়ে বলল, 'তবু কিন্তু

আরেকটি এসথার আমার মধ্যে আছে। সে মেয়েটি সারারাত ধরে নিজের মৃত্যুর কথাই ভাবে। ভয়ে অজ্ঞান হয়ে যায়, পাছে চেঁচিয়ে কেঁদে ওঠে সে-আশঙ্কায় ঠোঁট কামড়ে পড়ে থাকে, ঠোঁট কেটে রক্ত ঝরে। বালিশে মুখ গুঁজে কেঁদে বলে ওঠে, 'খুনী, খুনী, এরা সব খুনী।'

কোনমতে এসথার বেঞ্চের দিকে এগিয়ে যায়। মাথা নিচু করে কিছুক্ষণ সেখানে বসে থাকে। তারপর সব ঝেড়ে ফেলে বলে ওঠে—'আমি ওদের সঙ্গে লড়াই করব। আমার এই হাত দিয়ে ওদের আঘাত করব। আমাকে যদি টেনে নিয়ে যেতে চায়, আমি মাটি আঁকড়ে পড়ে থাকব। হাজার যুদ্ধ করেও এই মৃত্যুর হাত থেকে তো আমার নিস্তার নেই! আমার পথের শেষ প্রান্তে সেই গ্যাস চেম্বার। যেভাবে আরও হাজার হাজার লোক মারা গেছে, যাচ্ছে, সেভাবে আমাকেও শ্বাসরুদ্ধ হয়ে মৃত্যুকে বরণ করে নিতে হবে।'

অসওঅলড্ ওর খুব কাছেই বসেছিল। ওর বুকের কাছে মাথা রেখে এসথার বলল, 'প্রত্যেক দিন ঘুম থেকে জেগে যখন চোখ মেলি তখন আবার এই পৃথিবীকে দেখতে আমার বড় ভালো লাগে। দেখা শোনা ছোঁয়া —এ সবের মধ্য দিয়ে আমি সব রকম অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করতে চাই। এখন একটি ছোট চারাগাছের মতোই আমার প্রাণ সহজে নিজেকে যে মেলতে চায়।'

অসওঅলড্ কথা বলতে পারল না, কোন সান্ত্বনাও দিতে পারল না, কিছু বলার ক্ষমতাই যেন সে হারিয়ে ফেলেছে। কেবল তার আঙুলগুলো এসথারের চকচকে নরম চুলের মধ্যে খেলা করতে লাগল। ওর অসহায় ভাব দেখে এসথার মৃদু হাসল। বলল, 'আমার সময় তো প্রায় ফুরিয়ে এসেছে। কালই সব শেষ হয়ে যেতে পারে। আচ্ছা, সুখ, প্রেম—সবই কি শেষ হয়ে যাবে? আচ্ছা অসওঅলড্, তোমাকে যদি কেউ বলে কাল তোমাকে বিষাক্ত গ্যাস দেওয়া হবে, কাল তুমি কালচে নীল রঙের স্ফীতকায় একটা শব ছাড়া আর কিছুই নও, তীব্র দুর্গন্ধময়, ঘৃণ্য…'

অসওঅলড্ শিউরে উঠে ওর মুখ চেপে ধরল।

এসথার মুখ সরিয়ে নিয়ে আবার বলল 'তুমি কি এসব কথা অস্বীকার করতে পার, অসওঅলড্ ? অথচ আমি যে কেবল একটি মধুর ধ্বনির মতো মিলিয়ে যেতে চাই। আমার জীবনের ছন্দ বড় রকমের একটি দোলা দিয়ে শেষবারের মতো বিলীন হয়ে যাক···এই আমার সাধ। আমি যখন আকাশে মেঘ দেখি, অথবা তুমি যখন আমাকে আদর কর, তখন আমার মনে হয়—আমি অনেক ওপরে ভেসে বেড়াচ্ছি। এ ধরণির ধুলোয় জন্মেছি, ধুলোতেই মিশে যাব ঠিক। কিন্তু এরই মাঝে যে রয়েছে জীবন, বেঁচে থাকা···আহা, শুধু বেঁচে থাকা !' আবেগে অসওঅলড্কে জড়িয়ে ধরে বলে যায়, 'জানি না কেন আমার এখন এ তৃষ্ণা জাগল। সহজ ভাবেই তোমাকে বলি। তুমি বুঝতে পারছো তো ? আমরা আর একটুও সময় নষ্ট করতে পারি না। বল, মরতে তো আমাকে হবেই। আর ঠিক এই মুহূর্তেই প্রেম এল আমার দ্বারে। এ কি করুণা, না ভাগ্যের কৌতুক ? একে আমি কিভাবে গ্রহণ করতে পারি ? কি করে আমি নিজেকে তার জন্যে প্রস্তুত করব ? ঝাঁপিয়ে পড়ে তাকে আঁকড়ে ধরা ছাড়া আমার তো আর অন্য উপায় নেই।' এসথার ফুঁপিয়ে কাঁদতে লাগল। শুষ্ক, সংযত সেই ক্রন্দন। সমস্ত শরীর ওর কেঁপে কেঁপে উঠল, তারপর খুব ধীরে ধীরে ও শান্ত হল। দুর্বলভাবে অসওঅলড্কে জড়িয়ে ধরল। চোখের জলে ভেজা ওর মুখ যখন তুলল, বেদনার মৃদু হাসিতে কেবল ঠোঁট দুটি কেঁপে উঠল।

অসওঅলডের মুখে বার বার হাত বুলিয়ে এসথার বলতে থাকে, 'তোমাকে দেখলে আমার মনে হয় অসওঅলড্, তুমি মেঘের মতো, গাছপালার মতো, ঐ নীল আকাশের মতো··· ।'

সে-রাতে এসথারের ঘুম হল না। মাথায় অদ্ভুত অদ্ভুত ভাবনার উদয় হতে লাগল। একবার দেখল, সে খুব জোরে ডাক্তারের গলা

টিপে ধরেছে, তারপর ওঁর হাত থেকে পিস্তল কেড়ে নিয়ে পালিয়ে যাচ্ছে। আবার মনে হল অসওঅলড্ আর ওর সঙ্গীরা কয়েকজন ওকে বাঁচাবার জন্য কোথাও লুকিয়ে অপেক্ষা করে আছে। এসথারের উত্তপ্ত মস্তিষ্কে চিন্তাগুলো দ্রুত পরিবর্তিত হতে থাকে। প্রথম শুনতে পায়, ও ডাক্তারের সঙ্গে খুব রাগ করে চেঁচিয়ে কথা বলছে। ক্রমশ সেই গলার স্বর নেমে যাচ্ছে। আবার শোনে, সব মেয়েদের কাছে সে আবেদন করছে তারা যেন নিজেদের মুক্তি দাবি করে। হঠাৎ আবার এই দৃশ্যেরও পরিবর্তন ঘটে, দেখে ও গ্যাস চেম্বারে গেছে, চিৎকার করছে। নিজের বিকৃত মুখখানা ও স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছে! কিন্তু ওর আতপ্ত মস্তিষ্ক এই ভাবনার শেষে পেঁৗছতে পারে না। অপরিসীম ক্লান্তিতে ওর সমস্ত চিন্তা ডুবে যায়। তার পরেই আবার ডাক্তারের লালসাপূর্ণ কুৎসিত দৃষ্টি ওর চোখের সামনে ভেসে ওঠে। ঘৃণায় বিদ্বেষে জর্জরিত হয়ে হাত দিয়ে ও নিজের দুটো চোখই ঢেকে ফেলে। ওর রক্তের গতি আর নাড়ির স্পন্দন ও যেন নিজের কানে শুনতে পায়। মনে হয় যেন হাওয়ায় ভেসে ও চেতনার সীমান্তে গিয়ে পেঁৗছেছে। হঠাৎ পাশের মেয়েটির কাশির শব্দে ওর ঘুম ভেঙে গেল। তখনই কঠিন বাস্তব ওর চেতনায় এসে আঘাত করল।

পরদিন দুপুরবেলায় এসথার খুব তাড়াতাড়ি সেই খালি ঘরটায় চলে এল। অসওঅলড্ আসা মাত্র ওর কাছে ছুটে গেল।

'কি হয়েছে, এসথার ?'

'কিছুই না, তুমি আজ এত দেরি করলে কেন ?'

'কই, প্রতিদিন তো এই একই সময়ে আসি।'

'না, না, আজ বড্ড দেরি হয়ে গেছে', বলে অসওঅলডের কাঁধে মাথা রাখল। তারপর ওকে বেঞ্চের কাছে টেনে নিয়ে গিয়ে বলল, 'আমরা এখানে একটু বসি।'

দুজনে পাশাপাশি বসল। এসথার অসওঅলডের হাত দুটো ওর

হাতের মধ্যে টেনে নিল। বলল, 'এখনও হয়তো কিছু দেরি আছে।'

'থাক এসথার, এখন আর ওসব ভেবো না।'

অনেকক্ষণ ধরে এসথার ওর হাত দুখানি দেখল। তারপর একটা হাত নিয়ে ওর মুখে ঠেকাল। সমস্তটাই সে এক পূজারিণীর ভঙ্গিতে করল, পরে ওকে জড়িয়ে ধরল।

হঠাৎ অসওঅলড্ ওকে কাছে টেনে নিয়ে আবেগে চুম্বন করল। এসথার আর আত্মসংবরণ করতে পারল না, দুচোখ বুজে রইল। এক সময় এসথার সরে আসছিল। কিন্তু যখনি নারীদেহে অনুভব করল অসওঅলডের প্রথম লাজুক স্পর্শ, সেই স্পর্শের শুচিতা তাকে মুগ্ধ করল, তার অন্তরতম সত্ত্বা এই ভেবে গভীর ক্রন্দন করে উঠল যে অসওঅলডের পক্ষে যা প্রথম, তার পক্ষে তাই শেষ।

চুপিচুপি ওকে বলল, 'এমন কিছু একটা ব্যবস্থা তোমাকে করতে হবে অসওঅলড্, যাতে আমরা একবার অন্তত নিজেদের একা পাই। তোমার ঐ ছোট ঘরটার কথাই ভাবছি। সেখানেই আমি তোমার কাছে আসব। দেখো, কেউ যেন আমাদের বিরক্ত না করে।'

একটু নিস্তব্ধতার পর এসথার ওর গলা জড়িয়ে ধরে বলল, 'এখনও তো আমার মধ্যে জীবন রয়েছে, আমি তো এখনও বেঁচে আছি। আমি দেখতে সুন্দর অসওঅলড্, তোমার জীবনে যে পাওয়া হবে প্রথম, আমার জীবনে তাই হবে শেষ।'

অসওঅলড্ ওকে থামাবার চেষ্টা করতেই এসথার তাড়াতাড়ি ওর মুখ চেপে ধরল। বলল, 'না, না, তুমি কি বলতে চাও আমি জানি। সেসব কথার এখন কোন প্রয়োজন নেই। যত তাড়াতাড়ি পার তুমি এর ব্যবস্থা কর। কালই কর, নয়তো পরশু রবিবারে।'

এইভাবে ছোটখাট প্রণয় লীলার মধ্যেই তাদের প্রেমের মিলন-

সম্ভোগের স্থানকালের ব্যবস্থা দুজনে মিলে করে ফেলল, যে-মিলন অসওঅলডের জীবনে প্রথম আসবে, এসথারের জীবনে তাই হবে অন্তিম পাথেয়।

রবিবার বিকেলে ডাক্তার চলে যেতে আর ঘরটা খালি হতেই অসঅলড এসে এসথারকে ডেকে নিয়ে গেল। এসথার সঙ্গে একটি ছোট প্যাকেট নিয়ে এসেছিল। এর মধ্যে কি আছে জিজ্ঞেস করতেই এসথার বলল, 'গোপনীয় কিছু।'

অসওঅলড্ ডাক্তারের ঘরেই ওকে নিয়ে এল। ভেতরে ঢুকে দরজায় তালা লাগিয়ে টেবিল ল্যাম্পটা জ্বালিয়ে দিল, কারণ জানালায় কালো পর্দা দেওয়া ছিল। রুগীদের পরীক্ষা করার জন্য যে বড় কৌচখানা ছিল, সেখানা আগেই সে সাদা চাদরে ঢেকে দিয়েছিল।

'বাঃ সুন্দরভাবে তুমি সব প্রস্তুত করে রেখেছ দেখছি। আমরা অনেক্ষণ সময় পাব তো?'

'হ্যাঁ, রাত্তির পর্যন্ত।'

এসথার দুহাতে ওর গলা জড়িয়ে বলল, 'আমি কিন্তু তোমাকে অবাক করে দেব। তুমি পেছন ফিরে চোখ বুজে বস। আমি যতক্ষণ না বলি, ততক্ষণ চোখ খুলো না কিন্তু।'

অধীর কৌতূহলে অসওঅলড্ প্রতীক্ষা করে রইল। কাগজের প্যাকেট খোলার শব্দ হল।

'তুমি কি করছ?'

'খবর্দার, এদিকে তাকাবে না।'

আবার কাগজে কিছু জড়িয়ে এক কোণায় ছুঁড়ে দেবার শব্দ শোনা গেল। তার পরে সব চুপচাপ।

এবার এসথারের গলা শোনা গেল, 'চোখ বন্ধ রেখেই ঘুরে বস।'

অসওঅলড্-ও তাই করল।

'এইবারে তুমি আমার দিকে তাকাও।'

অসওঅলড্ দেখল, এসথার ওর ঠিক সামনে হাসিমুখে দাঁড়িয়ে আছে। সুনিপুণ বেশে সজ্জিতা একটি সুন্দরী তরুণী! আকাশনীল রেশমে তৈরী ওর পোশাক, তাতে বড় বড় শাদা চন্দ্রমল্লিকা যেন ফুটে রয়েছে।

অসওঅলড্ মুগ্ধ চোখে ওর দিকে তাকিয়ে রইল। ওকে অবাক করে দিতে পেরে এসথারের চোখে মুখে আনন্দের দীপ্তি খেলে গেল।

'কোথায় পেলে তুমি এই পোশাক?'

এসথার খুশির আবেগে ঘুরে দাঁড়াল, সঙ্গে সঙ্গে ওর পোশাকের নরম ভাঁজগুলি ওর চারপাশে ঘুরে এল। বলল, 'আমার সুটকেসেই পেলাম। আমাকে বন্দী করার সময় ওরা বলেছিল কিছু কাপড়-চোপড় সঙ্গে নিতে। তখনই তাড়াতাড়িতে এই পোশাকটিও ওর মধ্যে ছুঁড়ে দিয়েছিলাম। কত মাস ধরে মিথ্যে এটিকে বয়ে বেড়িয়েছি...না না, মিথ্যে ঠিক নয়...এই মুহূর্তে তোমার চোখে সুন্দর হয়ে ওঠার জন্যে ওটা আমাকে আনতেই হত।'

অসওঅলড্ আনন্দে ওকে জড়িয়ে ধরল। ওর দেহের উষ্ণতার ছোঁয়া পেয়ে কেঁপে উঠল, তার পরেই লজ্জায় এসথারের কাঁধে মুখ লুকোল। এসথার টের পেল ওর মনে ভয় জেগেছে। আর তখনই মায়ের মুখের মতো স্নেহ-মধুর হাসি নিয়ে ওর দিকে তাকাল।

হঠাৎ নিজেকে সরিয়ে নিয়ে ওর সামনে ঘুরে এসথার বলল, 'আমি সুন্দর তো?' তখন ওর চোখ দুটো জ্বলছে, দৃপ্তভঙ্গিতে উঠে এলোমেলো চুলে ও দাঁড়িয়ে রইল।

পোশাকটি সুন্দরভাবে আঁট হয়ে ওর শরীরে চেপে বসেছিল। হঠাৎ অসওঅলডের মাথায় এই ভাবনাটা এসে ওকে কষ্ট দিল, কাল তো এই হবে এসথারের মৃতদেহ, এ ছাড়া আর কিছু নয়।

এসথার আবার অধৈর্য হয়ে বলে উঠল, 'বলো, আমি সুন্দর

কিনা ?' ব'লেই খুব জোরে হেসে উঠল। অসওঅলড্ দৃঢ় আলিঙ্গনে বদ্ধ করে চুম্বনে চুম্বনে ওকে অস্থির করে তুলল।

'তুমি যে আমার ফ্রক ছিঁড়ে ফেলবে···'

মুহূর্তের জন্যে ওর মনে ভয় এল, পরক্ষণেই ওর বুকে মাথা রেখে বলল, 'ছিঁড়লেই বা, আমার তো আর কখনও প্রয়োজন হবে না।'

অসওঅলড্ ওর কথায় কান না দিয়ে কোচের ওপর ওকে শুইয়ে দিল। দরজার বাইরে যে মৃত্যু নিঃশব্দে ওর জন্যে অপেক্ষা করছে, তাকে এসথারও ভুলতে চায়। ওর জীবনের শেষ প্রেমের কাছে একবার অন্তত সচেতনভাবে আত্মসমর্পণ করবে। কিন্তু বেশিক্ষণ ও তা পারে না, ওর উত্তপ্ত রক্তের মধ্যেও মৃত্যুর পদধ্বনি বেজে উঠে অন্য সব শব্দকে ডুবিয়ে দেয়। সেই ছায়াশীতল স্পর্শকে ও কেবলই এড়িয়ে যেতে চেষ্টা করে।

এসথার চায় ওর জীবনের এই বিশেষ অভিজ্ঞতাটিকে ও সচেতনভাবে উপভোগ করবে, কিন্তু ও বার বার হেরে যায়। সমুদ্রকূলে বালুকণার মত ওর চিন্তাগুলি ইতস্তত বিকীর্ণ হয়ে উড়ে উড়ে যায়। জিজ্ঞেস করে, 'কটা বাজল ?'

অসওঅলড্ এসথারের বুকে মাথা রেখে স্বপ্নাতুর কণ্ঠে উত্তর দিল, 'আরও অনেক সময় আছে।'

এসথার আপন অঙ্গে অসওঅলডের প্রেমবিহ্বল স্পর্শ পায়, আর মা যেমন ক্রন্দনরত শিশুকে আশ্বস্ত করে, তেমনিভাবে অসওঅলডের মুখে হাত বুলতে থাকে। ওর নিজের অন্তরের অশ্রুনদীতে বান নেমেছে। যেন কোন আশাহীন ভরসাহীন অজ্ঞাত কূলে গিয়ে ওর জীবনতরী ডুবে গেছে। ঠিক যেখানটায় অসওঅলড্ মাথা রেখেছে, সেইখানে সে অসহ্য বেদনা বোধ করে, চোখ দুটো জ্বালা করতে থাকে, শূন্যদৃষ্টিতে সে রুদ্ধ ঘরের দরজার দিকে তাকিয়ে থাকে।

দুদিন ধরে এসথার অসওঅলডের জন্যে প্রতীক্ষা করে রয়েছে। অবশেষে তৃতীয় দিনে যখন অসওঅলড্ খালি ঘরটায় ওর সঙ্গে

দেখা করতে এল, তখন ও অত্যন্ত ক্লান্তভাবে মাথা তুলে তাকাল। একে অন্যের দিকে এমনভাবে তাকিয়ে রইল যেন ওরা পরস্পরের কত অচেনা।

'আমি আসতে পারিনি এসথার।'

হাসবার শক্তিটুকুও যেন হারিয়ে ফেলেছে এসথার।

হঠাৎ অসওঅলড্ মাটিতে বসে এসথারের কোলে মুখ ঢাকল। এসথার ভয়ে বিস্ময়ে বলে উঠল, 'কি হল তোমার?'

অসওঅলড্ লাফিয়ে উঠে শক্ত করে ওর কাঁধ চেপে ধরল, 'আজ রাতে তোমাকে আবার আমার কাছে আসতে হবে। আসতেই হবে কিন্তু, তোমাকে আমার খুব দরকার।'

'আমাকে?'

'তুমি আমার জন্যে খালি ঘরটায় অপেক্ষা করবে, আমি এসে তোমাকে নিয়ে যাব। এখন আমাকে কিছুই জিজ্ঞেস কোর না, তোমাকে কিন্তু আসতেই হবে, বুঝেছ?'

সে রাতে চাঁদের আলো ছিল না, ক্যাম্পের সবাই গভীর ঘুমে অচেতন। রাত একটায় অসওঅলড্ মেয়েদের ঘরের দিকে গেল। এসথার অপেক্ষা করেই ছিল। জানালা বেয়ে নেমে অসওঅলডের প্রসারিত দুই বাহুর মধ্যে ও ধরা দিল।

অসওঅলডের ঘরে গিয়ে এসথার ক্লান্ত হয়ে ওর বিছানায় বসে পড়ল। তারপরে ওর দিকে তাকাতেই ওর বিবর্ণ মুখখানি এসথারের নজরে পড়ল। ওকে জিজ্ঞেস করতে গিয়ে এসথার নিজের মনেই অনুমান করল অসওঅলডের এই পরিবর্তনের কারণ কি। বিস্ফারিত চোখে ওর দিকে তাকিয়ে রইল। একটু পরেই আতঙ্কে অস্থির হয়ে ওর হাত টেনে ধরে বলল, 'তোমাকেই করতে হবে বুঝি?'

অসওঅলড ওর হাত ছাড়িয়ে নিয়ে বার বার ঘরের মধ্যেই পায়চারি করতে লাগল। এসথার ভয়ে ভয়ে ওর দিকে তাকাল।

হঠাৎ লাফিয়ে উঠে অসওঅলডের পথ আটকে দাঁড়িয়ে বলল, 'তুমিই? তবে কি তুমিই?'

অসওঅলড মাথা নিচু করে অপরাধীর মতো দাঁড়িয়ে রইল। এসথার আহত অভিমানে বিছানায় শুয়ে একদৃষ্টে ছাদের দিকে তাকিয়ে রইল। ওর চিন্তাগুলো যেন জমে পাথর হয়ে গেছে।

এসথারের অশান্ত হৃৎস্পন্দনের তালে তালে স্তব্ধ মুহূর্তগুলি অতিক্রান্ত হতে থাকল। অবশেষে এসথারের ঠোঁট নড়ল, 'কখন?'

অসওঅলড্ অসাড় হয়ে দাঁড়িয়ে রইল। কিছুক্ষণ উত্তরের অপেক্ষা করে এসথার আবার জিজ্ঞেস করল, 'কখন?'

অসওঅলড্ কথা বলার চেষ্টা করল, মুখ থেকে শব্দ বেরোল না। এসথার আবার বলল, 'বলো না, কবে?'

অনুনয়ের ভঙ্গিতে অসওঅলড তার হাতটি তুলে ধরল।

এসথার জিজ্ঞেস করল, 'কালই?'

দুজনে একদৃষ্টে দুজনের দিকে তাকিয়ে থাকল।

অসওঅলড্ ওকে সাহায্য করবে বলে এগিয়ে আসে। ওকে ধাক্কা দিয়ে সরিয়ে, দুহাতে নিজের চোখ ঢেকে এসথার চুপি চুপি যেন নিজেকেই বলতে থাকে—'আজই তবে আমার জীবনের শেষ রাত্রি. যাও সরে যাও·· আমাকে ছেড়ে দাও। উঃ, কী অসহায় আমি! একটা প্রজ্বলিত অগ্নিশিখা আমাকে গ্রাস করতে আসছে।'

তীব্র যন্ত্রণায় চিৎকার করে উঠে আবার বিছানায় শুয়ে পড়ল। কান্না চাপবার জন্যে বালিশ কামড়ে ধরল।

অসওঅলড ওর পিঠে হাত বুলিয়ে দিল। অতিকষ্টে এসথার এবার উঠে বসল। বলল, 'আমাকে দুর্বল হলে চলবে না। এখনই যদি দুর্বল হয়ে পড়ি, কাল তবে কি হবে?'

অসওঅলড্ ভরসা দিয়ে বলল, 'কাল? কাল কিছুই হবে না।' ওর চোখ দুটো আশ্বাসে জ্বলজ্বল করে উঠল। 'কোন ভয়, কোন কষ্ট নেই, কিছুই না।' পাশের ছোট টেবিলটা একটা সাদা কাপড়ে

ঢাকা ছিল। তাড়াতাড়ি সেটা খুলে ফেলে বলল, 'দেখ একবার, তাকিয়ে দেখ, তোমার আর আমার জন্যে কি এনেছি।'

দুটো সিরিঞ্জ আর অনেকগুলো ইনজেক্‌শানের অ্যামপুল টেবিলটার ওপর পড়েছিল। এসথার জিজ্ঞেস করল, 'এসব কি?' উপহার দেবার মতো করে একটি অ্যামপুল হাতে তুলে নিয়ে অসওঅলড্ বলল, 'মরফিয়া।'

'মরফিয়া?'

'নিশ্চয়! সজোরে চিৎকার করে উঠে অসওঅলড ওকে জড়িয়ে ধরল। ওর মুখের যেখানে সেখানে চুম্বন করতে করতে বলল, 'এ যে কী চমৎকার জিনিস, তোমার কোন ধারণা নেই এসথার। আমরা দুজনে অনেক উঁচুতে উঠে কোমল মেঘের মধ্যে ভেসে বেড়াব।'

এসথার মুগ্ধ হেসে বলল, 'সত্যি, কি মজা! আচ্ছা তার পরে কি হবে?'

'তার পরে আমরা ঘুমোব।'

এসথার যেন অনেক দূর থেকে বলে উঠল, 'আর কখনও জাগতে হবে না?'

'না, আর কোনদিনও জাগতে হবে না।'

এসথার গভীর একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলল, 'বেশ!'

অসওঅলড বলল, 'তুমি আমাকে যা দিয়েছ, আমি তোমাকে তাই ফিরিয়ে দেব এসথার! তুমি একটি ঘরের দরজা খুলে আমাকে ভেতরে প্রবেশ করতে সাহায্য করেছ। আর কেবল একটি পা এগিয়ে আমি তোমাকে অন্য একটি ঘরের দরজা পেরিয়ে যেতে সাহায্য করব। তখন তুমি দেখবে যে এ দুই-ই সমান, কোন তফাত নেই।'

এসথার এবার চোখ বন্ধ করল। একটি হাসির আভা এসে ওর মুখখানাকে অপরূপ সৌন্দর্যে ভরিয়ে তুলেছে।

অসওঅলড্ এক লাফে এগিয়ে গিয়ে বলল, 'এবার প্রস্তুত হও!' অসওঅলড্ যখন টেবিলের জিনিসপত্র নিয়ে নাড়াচাড়া করছিল, এসথার তখন চুপচাপ সিরিঞ্জের শব্দ আর কাঁচ ভাঙার আওয়াজ শুনছিল। তারপরে গভীর স্তব্ধতা। এবার সিরিঞ্জ ভরা হয়ে গেছে। প্রগাঢ় অন্ধকার এসে এসথারকে ঢেকে ফেলল। সে যেন বহু বহু দূরে মিলিয়ে গেল। সে এখন সম্পূর্ণ একা। তার রুদ্ধ চোখের অন্তরালে স্থানকালের অতীত হয়ে সে যেন অবস্থান করছে। অসওঅলড ওর বাহুতে হাত রেখে ডাকল, 'এসো।'

অনেক দূরের পথ থেকে যেন এসথার ফিরে এসেছে। যেন ঘুম থেকে জেগে উঠে চোখ মেলল। অসওঅলড সামনে এসে দাঁড়িয়েছে। ওর হাতের সিরিঞ্জটি চকচক করছে। সকৃতজ্ঞভাবে অসওঅলডের দিকে তাকিয়ে ও একটু হাসল, সিরিঞ্জটা ঠেলে দিয়ে উঠে দাঁড়াল।

সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে এসথার বলল, 'না, না, এ কিছুতেই হতে পারে না। এ পথ যতই লোভনীয় হোক, তুমি বা আমি—কেউই এই ভুল পথে চলব না। আমরা তো অবাধ কল্পনাপ্রবণ নই। হয়তো তুমি এখনও বেঁচে থাকবে। আবার হয়তো নাও বাঁচতে পার! কিন্তু আমাদের পরে যে আরও হাজার হাজার মানুষ আসবে। যে-মৃত্যু আমাদের সামনে অপেক্ষা করে আছে, সে-মৃত্যুই আমাদের কামনা। আমাদের মৃত্যুর পিছনে আমি মহান একটি জাগরণের ইঙ্গিত পাচ্ছি। আমার যুগের কুয়াশা ভেদ করে আমি নিজের চোখেই যেন অনাগত ভবিষ্যৎকে দেখতে পাচ্ছি। আমি জানি যা আসছে তা আমাদের মৃত্যুকে সার্থক করে তুলবে। এই মুমূর্ষু-যুগ নিষ্করুণভাবে আমাদের জীবনের অবসান ঘটাচ্ছে। কিন্তু আমি আমার একার জন্যে সহজ মৃত্যু কামনা করব না। কারণ ক্ষেতের প্রান্তে যে-বীজ ছিটকে পড়ে, তাতে ফসল হয় না। আমি ভাবীকালের ব্যাপক উর্বর মাটিতে পড়তে চাই।'

অসওঅলডের কাছে গিয়ে এসথার মায়ের মতো স্নেহভরে দু-হাতে ওর মুখখানি তুলে ধরল। বিদায় জানাতে গিয়ে অনেক্ষণ ওর চোখের দিকে তাকিয়ে রইল, দরজার কাছে গিয়ে আবার ঘুরে দাঁড়াল, মৃদুস্বরে বলল, 'অসওঅলড্, আমার জীবনের অন্তে পুরুষের শেষ প্রেম পেলাম তোমারই কাছে।'

একটি লরী এসে থামল মেয়েদের ঘরের সামনে। তার ভেতর থেকে ডাক্তার এবং কারারক্ষীরা নামলেন কয়েকটি কুকুর এবং বন্দুক সঙ্গে নিয়ে। দুজন কারারক্ষী আর ডাক্তার ভিতরে ঢুকলেন। আধ ঘণ্টা পরে আঠেরোটি মেয়ে কয়েদী নিয়ে তাঁরা বেরিয়ে এলেন। ধীর শান্তভাবে মেয়েরা লরীতে গিয়ে উঠল। দলের মধ্যে সকলের পেছনে ছিল এসথার। সে যেন চোখ বন্ধ করে চলেছে, কারণ তার দৃষ্টি বোধহয় ঝাপসা হয়ে আসছিল। ডাক্তার অতি বিনীত হাস্যে লরীর পথ দেখিয়ে নিয়ে যাচ্ছেন।

ফোরম্যান আর্নেস্টের কাছে পরে শোনা গেল, গ্যাস চেম্বারের সামনে মৃত্যুপথযাত্রিদের মধ্যে কেউ নিশ্চয় বাঁচাব জন্যে শেষ সংগ্রাম করেছিল। কারণ সেখানকার মাটি এবড়ো খেবড়ো, রক্তে মাখামাখি হয়ে আছে। গ্যাস চেম্বার থেকে আশি মিটার দূরে ওরা একটা জায়গায় দেখল রক্তের স্রোত বয়ে যাচ্ছে—আর তার কাছেই একটা ছেঁড়া পোশাকের টুকরো পড়ে। পায়ে দলা নোংরা আকাশ-নীল রেশমী কাপড়ের একটা ফালি তাতে বড় বড় শাদা চন্দ্রমল্লিকা।

অনুবাদ । মলিনা রায়

আমরা তিনজন ছিলাম

ভি. বগোমালভ

দুজনে দুজনকে জড়িয়ে শুয়ে আছি। একবারও মনে হচ্ছে না মেঝেটা শক্ত কিংবা ভিজে স্যাঁতস্যাঁতে। ভালবাসার উত্তাপে এখন আমরা সবকিছুকে অগ্রাহ্য করতে পারি।

আমাদের রেজিমেণ্টে ও আসার পর প্রায় পাঁচ মাস হতে চলল আমরা পরস্পরকে ভালবেসেছি। কম্পানি কম্যাণ্ডার আর নার্সদের চোখ এড়িয়ে আমাদের গোপন অভিসার কেউই আমাদের এই প্রেমের কথা জানে না। জানে না আমরা এখন তিনজন হতে চলেছি।

'আমি বলছি আমাদের ছেলে হবে, দেখো!' ও ফিসফিস করে প্রায় বার দশেক কথাগুলোকে একটানা বলে গেল, তারপর যোগ করল, 'আর ঠিক তোমার মতই দেখতে হবে।' বুঝলাম আমায় ও খুশিতে ভরিয়ে দিতে চাইছে।

ওর কথার পিঠে কথা রেখে বললাম, 'যা হবার তা হবেই! তবে আমি কিন্তু এঁচে রেখেছি মেয়ে হবে, আর দেখতে হবে ঠি—ক তোমার মত।' আমিও ওর মত ফিসফিস করে কথা বলছিলাম বটে, কিন্তু মনটা তখন আমার বহুদূরের কোন এক ভাবনায় আচ্ছন্ন হয়ে ছিল।

সামনে প্রায় পাঁচশো মিটার ওপরে আমাদের রেজিমেন্টের সৈন্যরা এখন ছাউনি আর ট্রেঞ্চে গভীর ঘুমে ডুবে আছে। আরো একটু দূরে সীমানা রেখার খুঁটিগুলো জার্মানদের গোলাগুলির বিস্ফোরণের আলোয় মাঝে মধ্যেই দৃষ্টিগোচর হচ্ছে। তারো ওপরে একশ বাষট্টি নম্বর চুড়োটা, গাঢ় সূচীভেদ্য অন্ধকারের গহ্বরে তলিয়ে গেছে সম্পূর্ণভাবে।

গত সপ্তাহে অপর একটি বাহিনী ওই একশ বাষট্টি নম্বর চুড়োটিই দখল করতে গিয়ে অসফল হয়েছিল। আজ ভোরবেলা উঠেই আমাদের বাহিনীকে ওটি দখল করার অভিযানে বেরোতে হবে। আমরা পাঁচজন উচ্চপদস্থ অফিসার ছাড়া এখন পর্যন্ত আমাদের আর কেউই এই খবরটি জানে না। আজই সন্ধ্যের মুখে আমাদের বাহিনী প্রধান আমাদের পাঁচজন অফিসারকে হেডকোয়ার্টারে ডেকে আগামীকাল ভোরবেলার অভিযানের নির্দেশটি দেন। পাঁচজন অফিসারের মধ্যে আমিও একজন। নির্দেশদানের পর বাহিনী-প্রধান আমার দিকে ফিরে বলেছিলেন, 'মনে রেখ, যে মুহূর্তে 'কাতুশা'গুলো জ্বলে উঠে চারিদিকে সবজে আলো ছড়িয়ে দেবে, সেই মুহূর্তেই তুমি চার্জ করবে। তোমার নির্দেশ পেলে তবেই তোমার সঙ্গীরা তোমাকে অনুসরণ করবে। মনে রেখ, যেমন করেই হোক, চুড়োটি আমাদের দখল করতেই হবে।'

আমরা পরস্পরের বুকে মুখ গুঁজে শুয়ে আছি। আদরে আদরে অস্থির করে তুলছি ওকে। অনির্বচনীয় এক সুখে ডুবে গেছি দুজনে। একবারও ভাবতে ইচ্ছে করছে না, কাল ভোর বেলা উঠেই লড়াইয়ে নামতে হবে। ওকে নিয়ে আমার ভাবনার অন্ত নেই। ওর ভাবনা আমাকে আরো অস্থির করে তুলেছে। কি জানি কি হবে শেষ পর্যন্ত। পাগলের মত ছটফট করছি ওকে নিয়ে আমার এই সমস্যার একটা সুষ্ঠু সমাধানের জন্যে। হঠাৎ ও আমাকে একটা ঝাঁকানি

দিয়ে গ্রাম্য ঢঙে কেটে কেটে সুর কেটে বলল, 'এই এখন আমি ঘুমবো। আমার জন্যে না গো মশাই, তোমার খুদের জন্যে। বুঝেছ?' তারপর খানিক্ষণ চুপ করে থেকে বিড়বিড় করে বলতে লাগল, 'জান, অনেক সময় আমি মাঝ রাতেও জেগে উঠি ভোর হয়েছে ভেবে। আর সেই ভোরের আলোয় পরিষ্কার দেখতে পাই, যুদ্ধ যেন থেমে গেছে। কোথাও ট্রেঞ্চ নেই, রক্ত নেই, মৃত্যুর কোন বিভীষিকা নেই। মনে হয় যেন, যুদ্ধের পর দীর্ঘ দুটো বছর পার হয়ে গেছে। এমন যুদ্ধ চিরদিন চলতে পারে না, না গো? পারে কি, তুমিই বল না? এই! আচ্ছা, আচ্ছা একবার ভাবতো রাতের ঘুটঘুটে অন্ধকার কেটে গিয়ে ভোর হয়েছে, সোনার রঙের সূর্যটা উঠেছে চারিদিক ঝলমলিয়ে। যুদ্ধের কোন চিহ্নমাত্র নেই কোথাও—যুদ্ধ থেমে গেছে, যুদ্ধ থেমে গেছে...'

ভাবনার গভীরে ডুবে গিয়ে ও আপন মনে একটানা বিড়বিড় করে চলল।

ওর মাথার নিচ থেকে আস্তে আস্তে হাতটাকে সরিয়ে নিয়ে বললাম, 'জান, আমাকে এক্ষুণি একবার মেজরের কাছে যেতে হবে।'

'কেন?' আমার চোখে চোখ রাখল ও।

'তোমার ব্যাপারে সব কথা আমি ওঁকে খুলে বলতে চাই। যেমন করেই হোক তোমাকে এই মুহূর্তে বাড়ি পাঠাতেই হবে। হ্যাঁ হ্যাঁ, এই মুহূর্তেই।'

'তুমি কি পাগল হলে?' ও লাফ দিয়ে উঠে বসল। আমার হাতটাকে জাপটে ধরে ওর দিকে টেনে নিয়ে বলল, 'বোকার মত কথা বলনা, একথা শুনলে মেজর কি তোমায় আস্ত রাখবে, না ছেড়ে দেবে? একেবারে বুড়ো খোকা!' তারপর একটু মুচকে হেসে মেজরের ধরাধরা ফ্যাস্‌ফেসে গলাটাকে নকল করে চাপা স্বরে মজা করে বলতে লাগল, 'যুদ্ধ ক্ষেত্রে অধস্তন কর্মচারীর সঙ্গে যৌন-সংযোগ, কোন সৈন্যবাহিনীরই সামরিক মনোবল বৃদ্ধি করে না বরং

তা সংশ্লিষ্ট পদস্থ অফিসারের দায়িত্ব এবং কর্তৃত্বের মর্যাদা হানি করে। সাবধান! যদি আমি টের পাই যে, কোন পদস্থ দায়িত্বশীল অফিসার এ ধরনের নিষিদ্ধ কার্যকলাপের সঙ্গে কোন না কোন রকম ভাবে যুক্ত হয়ে পড়েছে তাহলে পত্রপাঠ এখান থেকে তাকে বিদায় নিতে হবে। তা সে যে-পদেই অধিষ্ঠান করুক, বা তার চরিত্রের গুণপনা জাহির করতে যতই প্রশংসাপত্র সঙ্গে থাকুক, কোন কিছুকেই আমি গ্রাহ্য করব না। আগে যুদ্ধে জেতো, তারপর ফূর্তি কর, যাকে খুশি তাকে প্রেম নিবেদন কর। কিন্তু বর্তমান অবস্থায়! নৈব নৈব চ!' নিজের কথায় নিজেই খুশিতে গড়িয়ে পড়ল ও। তারপর মুচকে মুচকে হাসতে হাসতে বলল, 'কাজেই মশাই, কেউ আমাদের কথা কানেও তুলবে না। বুঝেছ?' একটু চুপ করে থেকে ও আবার বলতে শুরু করল, 'জান, আমিও বেশ বুঝতে পারছি কি ঘটতে চলেছে। কিন্তু উপায় কি বল? আমাদের মেজর এ ব্যাপারে যেমন একরোখা তেমনি গোঁড়া। উনি মনেপ্রাণে বিশ্বাস করেন, যুদ্ধে নারী, প্রেম, ভালবাসা, এগুলোর কোন স্থান নেই।'

তবু আমি জেদ ধরি, 'সে যাই হোক না, আমি ওনার সঙ্গে দেখা করে সব কথা খুলে বলব।'

'স্—সস্', মুখে একটা বিচিত্র শব্দ করে ও আমার গালে ওর গালটা ঘষতে লাগল। নিঃশব্দে কেটে গেল কিছুক্ষণ। তারপর একটা দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলে খুব আস্তে আস্তে ও বলল, 'দ্যাখো, সমস্ত ব্যাপারটাকে আমি আগাগোড়া ভাল করে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে ভেবেছি। আমাকেই এর ভার নিতে দাও। এ নিয়ে তুমি কিন্তু একটুও কিছু চিন্তা করতে পারবে না। ভেবে দেখলাম, মশায়ের পিতা হওয়া চলবে না।'

'কি? আমি বাবা হতে পারব না?' রাগে সারা শরীর আমার থরথর করে কাঁপে। 'কি বলতে চাইছ তুমি?'

'নাঃ, তুমি দেখছি সত্যিই বোকা!' ও যেন মজা পেয়ে হেসে

ওঠে। দোহাই তোমার, আমার ছেলে যেন না তোমার মত বুদ্ধু হয়! আরে বাবা, আমি কি তাই বলতে চেয়েছি! এই, লক্ষ্মীটি, রাগ করো না! বার্থ সার্টিফিকেটে, কাগজেপত্রে তুমিই তো ওর বাবা হবে। তবে এই মুহূর্তে না। এই সময়ে মেজরকে একথা বলাটা একেবারেই ঠিক হবে না।'

এই কি সেই সাদামাটা সহজ সরল মেয়েটা! ওর কথায় অবাক হলাম! এত ছলাকলা ও শিখল কবে থেকে? জিজ্ঞেস করলাম, 'তাহলে কাকে দেখাবে?'

'কেন, কোন মৃত সৈনিককে! এই যেমন ধরো বায়কভ্?'

'ন্‌না, কোন মৃত কমরেডকে এর মধ্যে টেনে আনবে না।'

'ঠিক আছে বাবা ঠিক আছে।' কি যেন ভাবল খানিকক্ষণ, তারপর হঠাৎ লাফিয়ে উঠে বলল, 'আচ্ছা, ধরো যদি কিডনায়েভের কথা বলি?'

'সার্জেণ্ট কিডনায়েভ? সেই রাঙামুলো লম্পটটা? রাতদিন মদ খেয়ে যে চূর হয়ে থাকত! চুরির অপরাধে এই সেদিনই এখান থেকে যাকে তাড়ান হয়েছে? কি বলছ কি তুমি!' প্রচণ্ড অস্থির হয়ে উঠি। এক টানে ধুম্‌শো কোটটাকে গা থেকে খুলে ফেলে ওকে বুকের মধ্যে টেনে নিই।

কপট রাগে আমাকে ঠেলে খানিকটা সরিয়ে দিয়ে ও বলল, 'হচ্ছেটা কি, অ্যাঁ? তোমার আদরের ঠেলায় ত্নজনেরই যে দম বন্ধ হয়ে যাবে!' ত্নজনের কথা উঠলেই ও খুশিতে কেমন যেন উপছে পড়ে।...'এক্কেবারে বুদ্ধুরাম! আমার সঙ্গে তোমার দেখা না হলে কি হত বল দেখি! আমার সঙ্গে থাকবে আর গড়গড়িয়ে আপন মনে ভুল পথে চলবে, তা হতে দেব না আমি।' খুশির হাসিতে খল্‌খলিয়ে উঠল ও। আমি কিন্তু কিছুতেই ওর এই হাসিতে যোগ দিতে পারছিলাম না। গম্ভীর ভাবে বললাম, 'শোন, এখনই তোমাকে সোজা মেজরের কাছে যেতে হবে!'

'এখন ! এই মাঝরাতে !'

'হ্যাঁ, এখনই ! আমি নিয়ে যাবো তোমাকে। মেজরকে গিয়ে তুমি বলবে যে, তোমার পক্ষে আর এক মুহূর্তও এখানে থাকা সম্ভব নয়।'

'কিন্তু কথাটা তো সত্যি নয় !'

'লক্ষ্মীটি, তুমি আর আপত্তি কোর না। আমার মুখের দিকে চেয়ে অন্ততঃ······তাছাড়া এ অবস্থায় তুমি এখানে থাকবে কি করে······না না, যেতে তোমাকে হবেই—ধরো, কালকের যুদ্ধে—'

আমাকে কথাটা শেষ করতে না দিয়েই ও বলে উঠল, 'কালকের যুদ্ধ ! সত্যি বলছ !'

'হ্যাঁ সোনা, একটুও মিথ্যে নেই এর মধ্যে।'

কিছুক্ষণ ও চুপ করে রইল। নিঃশ্বাস প্রশ্বাসের সঙ্গে সঙ্গে ওর বুকের সেই অতি পরিচিত ওঠানামা দেখতে দেখতে বুঝতে পারলাম, ও বেশ বিচলিত হয়ে পড়েছে। শেষে ও বলল, 'কিন্তু একথা তো সত্যি যে, যুদ্ধক্ষেত্র থেকে কেউ পালিয়ে যেতে পারে না। তাছাড়া আমি তা চাইও না। যতক্ষণ না মেডিক্যাল অফিসার আমায় পরীক্ষা করে ডিভিশনের মারফত আমায় কোন আদেশ করছেন, ততক্ষণ আমাকে অপেক্ষা করতেই হবে। কালই আমি মেজরের সঙ্গে এ ব্যাপারে কথা বলব। এখন তুমি একটু শান্ত হও। লক্ষ্মীটি !'

'আমি কিছুই বলতে চাই না। আর বলবই বা কি ? কিছু তো ভাবতেই পারছি না।'

'আমার অবস্থাটা তুমি কিছুতেই বুঝতে পারবে না।' খুব থেমে থেমে আস্তে আস্তে ও কথাগুলো বলতে লাগল—'কোন্ মুখে আমি মেজরের সামনে গিয়ে দাঁড়াব ? তাঁর কাছে এসব কথা বলার চেয়ে মরাও বোধহয় অনেক সোজা। উনি কি বলেন জানো ? বলেন—কোন অবস্থাতেই তুমি তোমার মাথা নোয়াবে না।' কান্না চেপে ও পাশ ফিরল। তারপর আমার কোটের হাতার মধ্যে মুখ গুঁজে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে লাগল।

ওকে·কাছে টেনে নিলাম। চুমুতে চুমুতে ওর কপাল চোখ ঠোঁট সব ভরিয়ে দিলাম। ওর চোখের নোনতা জল গাল বেয়ে বেয়ে গড়িয়ে পড়ছে। আমার বুকের মধ্যে মুখ গুঁজে ও অস্ফুট স্বরে বলল, 'লক্ষ্মীটি, আমাকে যেতে দাও। আমাকে যেতে দাও সোনা।' তারপর আমার কাছ.থেকে নিজেকে একটু সরিয়ে নিয়ে বলল—'তুমি কি আমায় একটু এগিয়ে দিয়ে আসবে?'

আমরা দু'জনে অন্ধকার স্যাঁতসেঁতে উপত্যকাটায় নেমে এসেছি। আমাদের বাহিনীর চিকিৎসা-কেন্দ্রটা এখানেই। ওর কোমরটা জড়িয়ে ধরে এগোচ্ছি। আসন্ন মাতৃত্বের গর্বে ইতিমধ্যেই বেশ মোটাসোটা হয়ে উঠেছে কোমরটা। আমার দু'হাতের বাঁধনে ওকে আগলে রেখেছি। ওর প্রতিটি পদক্ষেপের ওপর আমার সতর্ক দৃষ্টি। পা পিছলে পড়ে না যায়। মনে হচ্ছে, আমি যেন ওকে এমনি ভাবেই কালকে ভোরবেলায় লড়াইয়ের সময়েও আগলে রাখতে পারব। আগলে রাখতে পারব, সেই যুদ্ধক্ষেত্রের সমস্ত বিপদের হাত থেকে। অথচ আমি খুব ভাল করেই জানি যে, যুদ্ধক্ষেত্রে ওকে বারবার ছোটাছুটি করে বেড়াতে হবে, আহত সৈনিকদের টানতে টানতে নিরাপদ আশ্রয়ে ফিরিয়ে আনতে গিয়ে বারবার হয়তো হোঁচট খেয়ে মাটিতে লুটিয়ে পড়তে হবে···

পনের বছর পেরিয়ে গেছে। কিন্তু এখনো আমার মনে হয়, এ যেন কালকের ঘটনা। ভোরবেলায় কাতুশা ছুটতে শুরু করল, মর্টার আর বড় বড় মেশিনগানগুলো ক্রুদ্ধস্বরে গর্জে উঠল। সারা আকাশ জুড়ে তখন সবুজ আলোর ঝলসানি। আমি আর আমার বাহিনীর অবশিষ্ট সৈন্যরা সেই চূড়োটা যখন দখল করলাম তখন

সবে সূর্য উঠছে। আধ ঘণ্টা পরে আমাদের দখল-করা একটা সুরক্ষিত জার্মান ট্রেঞ্চের মধ্যে রেজিমেণ্ট কম্যাণ্ডার ও আরেকজন কে যেন আমাকে বুকের মধ্যে জড়িয়ে ধরে অভিনন্দন জানালেন। একটা শুক্‌নো মরা গাছের ডালের মতো আমি দাঁড়িয়ে রইলাম। আমি কিছুই অনুভব করতে পারছি না। কোন কথাই আমার কানে পৌঁছচ্ছে না।

ওই সূর্যটাকে—ওই সূর্যটাকে ফের যদি আমি পূর্ব দিগন্তের নীচে ঠেলে নামিয়ে দিতে পারি! আবার যদি গত রাতের কথা স্মরণ করতে পারি।···মাত্র দু'ঘণ্টা আগেও আমরা তিনজন ছিলাম···

কিন্তু তবু সূর্য ওঠে, ধীরে ধীরে সূর্য ওঠে, তার অস্তিত্বের সমস্ত প্রমাণগুলো সদম্ভে জাহির করে সূর্য ওঠে। আমি পাহাড়ের ওপর দাঁড়িয়ে আর আমার সোনা, আমার সোনামণি পড়ে রয়েছে পিছনে—ওই ওখানে—আমি দেখতে পাচ্ছি, আমাদের সৈন্যরা ওখানে মৃতদের কবরের আয়োজন করছে।

কেউ জানে না, কেউ জানে না ও আমার জীবনের কতখানি জুড়ে ছিল। কেউ জানে না কিছুক্ষণ আগেও আমরা তিনজন ছিলাম···

অনুবাদ | রমা ভট্টাচার্য

পুলিশ

অ্যালবার্ট মালট্‌স

পা ছু'টো কাটা যাবার আগে এনজোর চেহারাখানা নিশ্চয় তারিফ করার মত ছিল। ও সেই উত্তর ইতালির ছ' ছ' ফুট ঢ্যাঙা মানুষদের একজন। বছর পঞ্চাশ বয়স হবে বলে ওকে দেখে আমার মনে হয়েছিল। চেহারায় একটা রুক্ষতা আছে কিন্তু এখনো সুদর্শন। এক মাথা কালো চুলের মধ্যে ছু'চারটে সাদা রেখা উঁকিঝুঁকি মারছে। সর্বদাই দেখি ও প্রভুত্বব্যঞ্জক ভঙ্গীতে সিধে হয়ে বসে রয়েছে একটা চেয়ারগাড়িতে। শক্তিধর হাতছু'টো রেখেছে কাঠের তৈরী উরুর ওপর। ঘন কালো চোখে আগ্রহের ঝিকিমিকি। আমি যেখানে ঘর ভাড়া নিয়েছি তার খুব কাছেই ওর এই হোটেল। কারখানার শ্রমিকেরাই এখানে বেশী খেতে আসে। খাবারটা সুস্বাদু, আর সেই সঙ্গে বেশ সস্তাও। আমি তাই রোজই এখানে খেতে আসি। প্রায় এক সপ্তাহ নিয়মিত ভাবে এখানে আসা-যাওয়া করার পর এনজো সেদিন তার চেয়ারগাড়িটাকে গড়িয়ে আমার টেবিলের কাছে এসে হঠাৎ প্রশ্ন করল,

"তুমি আমেরিকান না ইংরেজ?"

"আমেরিকান।"

"বেশ বোঝা যাচ্ছে তুমি এখানে বেড়াতে আসনি। ব্যবসাদারও নও। তা না হ'লে ভিয়া ভেনেটে থাকতে এখানে খেতে আসবে কেন? তাছাড়া রোজ তুমি একই কোটপ্যান্ট আর জুতো প'রে আস। ওদিকে আবার ছাত্র বলব যে, বয়সটা একটু বেশী ঠেকছে। অবশ্য শিল্পী হতে পারো, কিন্তু তাও বোধ হয় নয়। আমি কেবলই ভাবছি যে রোমে তুমি কি করছ।"

ওর মুখে বিস্ময়ের ভাব লক্ষ্য ক'রে সশব্দে হেসে উঠলাম, "আমাকে জিজ্ঞেস করলেই তো পারতেন!"

এনজোও হাসল। "আসলে, আমার নিজে থেকে আবিষ্কার করার একটা শখ আছে। যাক্ এবার না হয় জিজ্ঞেসই করছি, বলো শুনি।"

"আমি সকালে মাস্টারি করি।"

"অসম্ভব! আমি যেমন খোঁড়া, তোমার ইতালিয়ান ভাষার জ্ঞানও তেমনি।"

"আমি একটা প্রাইভেট স্কুলে ইংরেজি শেখাই।"

এনজো তার নাকের উপর চট্ ক'রে একটা চাঁটি বসাল, "আচ্ছা! ····· তা হলেও বলবো এখানে যখন মাইনে কমই পাচ্ছো দেশে ফিরে গিয়ে পড়ানোই তো ভাল? আরো বেশী রোজগার করতে পারবে।"

"আমি দু' এক বছর ইতালিতে কাটাতে চাই।"

এনজো যেন কৌতুক বোধ করল। "তোমার যা বয়স, ব্যাপারটা নিশ্চয় নারীঘটিত! তোমাদের দেশের তুলনায় এখানকার মেয়েরা অনেক বেশী দিলখোলা, তাই না?"

"হ্যাঁ, ব্যাপারটা একদিকে নারীর আর অন্যদিকে আপনার এই লোভনীয় 'পাস্তা'র আকর্ষণ।"

জিভে চুক্ করে একটা আওয়াজ ক'রে এনজো বলল, "আমার পাস্তা খেয়ে তোমার কোনদিন অসুখ করবে না। কিন্তু মেয়েদের

ব্যাপারে সাবধান। দেখেশুনে বেছো কিন্তু। এখানে এমন অনেক মেয়ে আছে যাদের গুণাগুণ দেখে পেনিসিলিনও ঘাবড়ে যায়।"

আমাদের মধ্যে এই আলাপ হবার পরদিনই এনজো তার চেয়ার-গাড়ি গড়িয়ে আমার কাছে এসে হাজির হ'ল। তীক্ষ্ণ কণ্ঠে বলল, "তোমার ব্যাপারটা কি বলতো? এই যে ক'জন উঠে গেল—একেবারে কানখাড়া ক'রে ওদের কথাগুলো অমন গিলছিলে কেন? কি লিখে নিলে শুনি? বিদেশী না হ'লে ভাবতুম পুলিশের লোক, তবে একেবারে কাঁচা, কোন অভিজ্ঞতাই নেই।"

আমি কিছুটা অস্বস্তিতে প'ড়ে গেলাম। বাধ্য হয়ে পকেট থেকে নোটবইটা বার ক'রে ওকে দেখতে দিলাম। "আমি একজন লেখক বলেই কিছু কিছু কথা টুকে রাখি। লোকে কিভাবে কথা বলছে—কিভাবে মনের ভাব প্রকাশ করছে, এইসব লিখে নিই!"

এনজো কয়েক মিনিট ধ'রে অত্যন্ত মনোযোগ দিয়ে নোটবইটা পরীক্ষা করল। এরপর বিড়বিড় ক'রে উঠল, "তুমি দেখছি ইতালিয়ান যাও বা বলো, বানানের বেলায় আরো জঘন্য! ভাল ক'রে শিখে নেওয়া উচিত!" কিন্তু শেষ পর্যন্ত ও যখন আমার নোটবইটা ফেরত দিল, ওর হাবভাবে বেশ সৌজন্য প্রকাশ পাচ্ছিল।

"বুঝেছি—এই জন্যেই তুমি সারাটা সন্ধ্যে টাইপ ক'রে কাটাও?"

"কি ক'রে জানলেন?"

"আমার একজন রাঁধুনি যে তোমার বাড়িউলির আত্মীয়া হয়। তা বেশ বেশ। তাহলে তুমি শুধু মাস্টারই নও, লেখকও বটে? খবরের কাগজে লেখো বুঝি?"

"না।"

আমার প্রতি ওর উৎসাহ যেন আরো বৃদ্ধি পেল। "তাহলে বইটই লেখা হয়?"

"এ পর্যন্ত আমি কেবল গল্পই লিখেছি।"

"ও···আচ্ছা! গল্প! ভারি মজার ব্যাপার তো!"

সেদিনের পর থেকেই দেখছি এনজো প্রায়ই আমার টেবিলের পাশে চলে আসে। আমেরিকার জীবনযাত্রা সম্বন্ধে বেশ কিছু প্রশ্নও করে, কিন্তু আমার প্রতি ওর আকর্ষণের প্রধান কারণ বোধহয় এই যে, আমি লিখি-টিখি। ব্যাপারটা কিঞ্চিৎ বিস্ময়কর। এনজো খবরের কাগজ আর চল্‌তি হাল্কা পত্র-পত্রিকা ছাড়া বিশেষ কিছুই পড়ে না। অথচ ও যেসব প্রশ্ন ক'রে সেগুলো মোটামুটি সাহিত্যতত্ত্ব সংক্রান্ত। এই যেমন, একজন লেখক কোত্থেকে আইডিয়া পায়, গল্পের মধ্যে বাস্তব ঘটনার ভূমিকা কতখানি, গল্প লেখা সোজা না শক্ত —সোজাই বা কেন, শক্তই বা কেন ইত্যাদি। প্রতি সপ্তাহেই এনজো নতুন নতুন প্রশ্ন নিয়ে হাজির হয়। মনে হয় এ-ব্যাপারে চিন্তা করছে। কিন্তু যতবারই জিজ্ঞেস করেছি ওর এত আগ্রহের কি কারণ, এনজো স্রেফ্‌ কাঁধ ঝাঁকিয়ে মুচকি হেসেছে।

সে বছরের মতো স্কুলের ক্লাস শেষ হলে এনজোকে বললাম, আর ক'দিনের মধ্যেই আমি রোম থেকে চলে যাবো। শুনেই এনজো আমায় একদিন ওর সঙ্গে রাত্তিরের দিকে খাবার জন্য নিমন্ত্রণ করে বসলো। এই শেষ ক'টা দিন সন্ধ্যেবেলায় অনেক কিছু করবো ভেবে রেখেছিলাম, কিন্তু এনজো এমন অদ্ভুত ভাবে পীড়াপীড়ি শুরু করল যে রাজী না হয়ে পারলাম না।

প্রায় মাঝরাত তখন। রেস্তোরাঁয় আমরা ছাড়া আর তৃতীয় প্রাণী নেই। এই নিয়ে তিনটে মদের বোতল খুলেছে এনজো (আমি যতক্ষণে এক গেলাস খেয়েছি, এনজো খেয়েছে দু' গেলাস ক'রে)। এনজো কিছুটা দ্বিধাগ্রস্তভাবে বলল, "তোমার কাছে একটা আর্জি আছে। তুমি তো লেখক—একটা গল্প শুনবে? আমার খোঁড়া হবার গল্প! এ গল্পটা…" সঠিক শব্দটা খুঁজতে গিয়ে ওকে কথা থামাতে হ'ল। "এ গল্পটা ধরো মানুষের বিবেক নিয়ে। মানে, বলতে চাইছি…প্রত্যেক মানুষের কিছু না কিছু প্রয়োজন আছে। মানুষ আত্মকেন্দ্রিক, সব মানুষই তাই, জন্ম থেকেই তারা এই রকম।

কিন্তু তা সত্ত্বেও দেখবে মানুষকে ভয়ঙ্কর খেসারত দিতে হয় শুধু নিজের কথা চিন্তা করার জন্যে। এ একটা দ্বন্দ্ব···মানুষের ঠিক কিভাবে চলা উচিত ?··· আর তার বিবেকই বা কেন প্রথম থেকে বলে দেয় না যে, তুমি বাপু ঠিক এই ভাবে চলো, কোন ঝামেলা হবে না।” আবার এনজো ইতস্ততঃ করল, ওর মুখে অস্বস্তির ছাপ ফুটে উঠেছে। “এই গল্পটা······নিজের কথা বলছি ব’লে আবার ভেবো না যেন আমি খুব কেউকেটা লোক—আমিও ঠিক আর পাঁচজনেরই মতো, আর সেই জন্যেই বোধহয়--কি বলতে চাইছি তুমি বোধহয় বুঝতে পেরেছো ?”

“হ্যাঁ, বুঝেছি বইকি।”

“বেশ। তোমার কাছে আমার আর্জিটা এই যে, আমি তোমায় আমার কি হয়েছিল খুলে বলবো, আর তারপর তোমাকে এটা নিয়ে একটা গল্প লিখে ফেলতে হবে, যাতে লোকে পড়তে পায়। তুমি কি বলো ?”

“তা যদি পারি তো আমিও খুশি হব।”

বাহ্যতঃ এনজো খুশি হ’ল। হাসলও বটে, কিন্তু মনখোলা হাসি নয়। আমি পরিষ্কার দেখছিলাম ভেতরে ভেতরে ও দারুণ উত্তেজিত হয়ে উঠছে। হাত বাড়িয়ে মদের বোতলটা নিয়ে আমাদের গেলাস দু’টো ভর্তি করল। তারপর বিড়বিড় ক’রে বলল, “সব কথা বলতে হ’লে দ্রাক্ষারানীর সাহায্য দরকার।—আমি শুরু করবো সেই——কোত্থেকে বলি——বুঝলে, আমাদের পরিবারের অবস্থা ছিল অত্যন্ত শোচনীয়। বাবা ছিলেন না, প্রথম বিশ্বযুদ্ধে মারা গেছলেন। আমরা ছিলাম গরিবেরও গরিব। ষোল বছরে পড়তেই আমার মা আমাকে একটা মঠে পাঠিয়ে দেন। বিনি পয়সায় খেতে পাব, ওদিকে বাড়িতেও একজন খাবার লোক কমবে। খেতে আর কে না ভালবাসে, আমিও বাসতাম, তাছাড়া দেবী ম্যাডোনাকেও ভাল লাগতো, কিন্তু তবু পাদ্রী হওয়া আমার ধাতে ছিল না। আঠারো

বছর বয়সে মঠ থেকে কেটে পড়লাম। তিনটে বছর একেবারে শূন্য হাতে কাটল—লক্ষ লক্ষ লোক তখন বেকার—মাঝে মাঝে দিনের পর দিন না খেয়ে থেকে এমন অবস্থা হত যে মনে হত এখন স্বয়ং শয়তানটাকেও যদি পাই—নুনও লাগবে না, স্রেফ্ আস্ত চিবিয়ে খেয়ে ফেলব। কেউ যখন একেবারে তলিয়ে যায় তার চোখে ভাল কিছু পড়ে না। আমিও তাই ভাবতাম, "পৃথিবীটাই এই রকম, এই জঙ্গলে যে-যার জন্যে যা-পারে লুঠে নেবে। এটাই স্বাভাবিক।"

এনজো খানিকটা মদ গলায় ঢেলে চেয়ারটা আরো সরিয়ে আনল আমার কাছে। "কিন্তু একুশ বছরে পড়তেই হঠাৎ আমার ভাগ্য ফিরে গেল। পুলিশের কাজ জুটে গেল। উত্তরাঞ্চলের একটা জেলার সদরে কাজ পেলাম। পাহাড়ী জায়গা, মিলান থেকে খুব বেশীক্ষণের পথ নয়। পুলিশের কাজকে ভালবেসে ফেললাম। এমন ধরাচূড়া পরার সুযোগ, এমন পদমর্যাদা কে না চায়। মেয়েরা অবধি আমার দিকে যেন অন্যদৃষ্টিতে তাকাতে লাগল। কিন্তু সবচেয়ে বেশী ভাল লেগেছিল কিছু টাকা কামাবার সুযোগ মিলে যাওয়ায়। জানই তো, যত বেশ্যা, ব্ল্যাকমেলার আর ব্যবসাদার কিছু না কিছু অন্যায় করলেই ঘুষ দিয়ে মুখ বন্ধ করে। পুলিশ মহলের যত উঁচুতে উঠবে ততই তোমার রোজগার বাড়বে। আমিও যা পাচ্ছিলাম দু'হাতে কুড়োচ্ছিলাম, আর কি ক'রে আরো উঁচুতে ওঠা যায় তক্কে তক্কে ছিলাম।"

"তখন তো মুসোলিনির রাজত্ব, তাই না?"

"হুঁ!" ব্যঙ্গের ভঙ্গিতে এনজো একটা ফ্যাসিস্ত স্যালুট্ ঠুকল। তারপর মাটিতে থুতু ফেলে বলল, "আমার মত পুলিশরা কে গদিতে আছে তা নিয়ে মাথা ঘামায় না। গদিতে যেই থাকুক, শুধু মাইনেটাই তার হাত থেকে নেয়, আর খাটে নিজের সুরাহা করতে।" আবার ও গেলাসে মদ ঢালল। এক চুমুকে শেষ ক'রে ফের গেলাস ভর্তি করল। "এই আমার কথাই ধরো না। মেয়েদের সম্বন্ধে কি

ভাবতাম জানো ? আমি একটুও রেখে ঢেকে বলছি না কিন্তু। আমার ধারণা ছিল কেবল পুরুষদের সুখী করার জন্যেই মেয়েদের দরকার হয়। চাঁদের বাহার আর কবিতাকে চুলোর দোরে পাঠিয়ে ছেড়েছিলাম। ধরো, আমি একদিন গোয়েন্দার কাজ করতে গিয়ে একটা দেখতেশুনতে ভাল চাষী মেয়েকে পাকড়াও করলাম। ধরে নাও মেয়েটা সেই যুদ্ধের সময় কালোবাজারে ডিম বিক্রি করছিল। আমি কি তখন মেয়েটাকে জেলে পাঠাব ব'লে ব্যস্ত হয়ে পড়তাম ? মোটেই না, আমার কিসের মাথাব্যথা ! আমি বরং তার ডিমের চ্যাঙারিটা হাতিয়ে নিতাম। প্রমাণও সংগ্রহ হ'ত, আর নিজের জন্যে অজস্র ওমলেটের ব্যবস্থাও হয়ে যেত। তারপর অবধারিত ভাবেই মেয়েটার কোমর জড়িয়ে ধরে জিজ্ঞেস করতাম, 'কিগো সুন্দরী, জেলে যেতে চাও নাকি ?' বেশীর ভাগ সময়েই ওরা এত ঘাবড়ে যেত যে কিছুই করতে পারতো না, বড়জোর দু'চারটে গালাগালি দিত। তা আমি সেটা ধর্তব্যের মধ্যেই আনতুম না। মুখে যাই বলুক, আমার শয্যাসঙ্গী হ'লেই আমি খুশি। তা মোটামুটি এই ছিল আমার চেহারা। আমি নিজের সুখের ব্যবস্থা করতেই মেতেছিলাম, আর সমাজ নামে এক জঙ্গলে ক্রমশঃ উন্নতি করছিলাম।...যাক্, এবার চলে আসি সেই ১৯৪৩ সালে, আমার মরণকালের কথায়। তখন যুদ্ধের মাঝামাঝি, সবে মিত্র-বাহিনী সিসিলি দখল করেছে। সে-সময়কার কথা তোমার মনে আছে কিছু ?"

"ভাল ভাবে মনে নেই।"

"সে এক নরক গুলজার। প্রথমেই মুসোলিনিকে হটিয়ে দিল তখনকার গভর্নমেণ্ট। তারপর আমেরিকান আর বৃটিশরা যখন দক্ষিণাঞ্চলে সালারনোয় এসে নামল, নতুন সরকার তাদের কাছে আত্মসমর্পণ করল। কিন্তু ইতালিতে তখন জার্মান সৈন্যরা ছিল। ওরা জোর ক'রে ক্ষমতা কেড়ে নিল, আমাদের সৈন্য-বাহিনীকে নিরস্ত্র করল, গোটা দেশটাকে দখল ক'রে নিল। সঙ্গে সঙ্গে একটা গৃহযুদ্ধ-

গোছের বেধে গেল। তখনো দেশে কিছু কিছু ফ্যাসিস্ত ছিল। এরা জার্মানদের সাহায্য করতে শুরু করল, আর ওদিকে চারধারে ছোট ছোট দেশপ্রেমিক গোষ্ঠী গ'ড়ে উঠল মিত্রপক্ষের হয়ে লড়াই চালাতে। আমি এই দেশপ্রেমিকদের প্রশংসা করতাম, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে অতিষ্ঠও হয়ে উঠেছিলাম। আমার যুক্তিতে এটাই বুঝতাম যে, জার্মানদের যদি হঠাতেই হয় তো একমাত্র মিত্র-বাহিনীই সেটা পারবে, আর কেউ নয়। দেশপ্রেমিকের সাধ্য কতটুকু? কিছুই না—আমার অন্ততঃ তাই মনে হয়েছিল। বড়জোর দু'চারটে সৈন্য মারবে বা একটা রসদ-বাহী-বাহিনীকে আক্রমণ করবে—মাছির দলের বাঘকে কামড়ানোর সামিল। নিজেরা কিছুই করতে পারবে না অথচ কি ঝামেলাতেই না আমাদের আর সকলকে ফেলবে, বিশেষ ক'রে আমাকে। ব্যাপারটা কী জানো, আমি সেই মঠে থাকতে থাকতেই একটু জার্মান শিখেছিলাম, সেইজন্যে আমাকে ওরা দোভাষী হিসেবে গেস্টাপোর সঙ্গে ভিড়িয়ে দিয়েছিল। আমার গেস্টাপো প্রীতির সঙ্গে টাইফয়েডের ভীতির বেশ মিল ছিল, কিন্তু তা সত্ত্বেও আমার মনে হয়েছিল এখন করণীয় বলতে একটাই আছে—স্রেফ্ অপেক্ষা ক'রে যাওয়া, ওদের সঙ্গে বন্ধুত্বের ভান করা, ওদের বিশ্বাসভাজন হওয়া। কিন্তু যেই ওই মাছির দল একটু ভনভন করতো, বাঘমশায় তার লেজের ঝাপটা মারতেন, আর আমিও ঘেমে-নেয়ে উঠতাম। গেস্টাপোগুলো ইতালিয়ান মাত্রেই সন্দেহ করতো! আমি খুব ভাল করেই জানতাম ওদের হেডকোয়ার্টারের মধ্যে মাটির নীচের চোরা কুঠরীতে কি কাণ্ড চলতো! ঈশ্বরের দিব্যি, ভয়ে আমার প্রাণ শুকিয়ে আসত, ভাবতাম এই বুঝি ওরা আমার দিকে সন্দেহের চোখে চাইছে।"

এনজো গেলাসের পানীয় শেষ করে ক্ষণেকের জন্য চিন্তামগ্ন নীরবতায় ডুব দিল। ওর দিকে চেয়ে থাকতে থাকতে মনে হ'ল ওর চেহারার রুক্ষতা যেন কোমল হয়ে উঠছে। ফের যখন এনজো কথা শুরু করল, ওর কণ্ঠস্বরের অন্তরালে বিষণ্ণতার আর পুরোনো স্মৃতির

রেশের জানান মিলল। "আমি শহরের সবচেয়ে বড় পার্কটার কাছে ছোট একটা হোটেলে থাকতাম। হোটেলের মালিকের একটি মেয়ে ছিল—গ্রাজিয়া। মেয়েটা আমার সামনে বড় হয়ে উঠেছিল। উচ্ছলতায় ভরপুর এক কিশোরী, সর্বদাই দেখতাম ছুটছে আর হাসছে। বাতাসে লম্বা লম্বা চুলগুলো উড়তো। হঠাৎ একদিন চোখে পড়ল ও আর কিশোরী নেই, ষোল বছরের যুবতী। সঙ্গে সঙ্গে আমার মনে হ'ল ওকে আমার চাই। যে কোন লোকেরই মনে হবার কথা। তুমিও যদি দেখতে, বুঝতে পারতে। সমুদ্রের মতো গাঢ় নীল চোখ—কোমর ছাড়িয়ে গম-রঙা চুলের গোছা--মুখটা এত মনোরম আর উজ্জ্বলতায় ভরপুর যে তোমার মন গলে যাবে—অথচ এমন বাড়ন্ত গড়ন যে মানুষ মাত্রেই ওকে স্পর্শ করার জন্যে ব্যাকুল হয়ে উঠতো। আমার তখন তেত্রিশ বছর বয়স, ওর চেয়ে সতেরো বছরের বড়। কিন্তু দু'টি নারী পুরুষ যদি একে অন্যের মনে উদ্দীপনা জাগায় এ পার্থক্য কোন চিন্তার কারণ হয় না। গ্রাজিয়া আমাকে বেশ পছন্দই করতো, আর আমার তো কথাই নেই। ওর বাপটা যদি না থাকতো! দিনরাত শুধু মতলব অ াঁটতাম কি ক'রে ওকে বাধ্য করা যায়, যাতে ও আমাকেই ওর সঙ্গী হিসেবে বেছে নেয়। ওর বাবা যে আমার বিশেষ বন্ধু ছিল বা ওই ধরনের কিছু তা নয়। আসলে লোকটা আমায় একবার প্রাণে বাঁচিয়েছিল। আমি ন্যায়-অন্যায়ের ধার ধারতাম না বটে, কিন্তু এই একটা ব্যাপারে রক্তের ঋণ বলে যে কিছু থাকতে পারে সেটা স্বীকার করতাম। ফলে এই লোকটার প্রতি কৃতজ্ঞতাবশতঃ গ্রাজিয়াকে আর বেকায়দায় ফেলা সম্ভব হচ্ছিল না। অবসর সময়টা তাই আমি ওর পিছনে পিছনে ঘুরেই কাটাতাম। কখনো ও বারে খরিদ্দারদের মদ বিতরণে ব্যস্ত থাকতো, কখনো হোটেলের অন্য কোন কাজে। ওর মা না থাকায় আমার খুব সুবিধে হয়েছিল। স্তুতিকীর্তনের বা একটু আধটু ইয়ার্কি মারতে কোন

বাধা ছিল না। এসব আর কি বলবো……জানই তো রাস্তা পাকা করবার জন্যে ছেলেরা কিভাবে কুমারী মেয়েদের সঙ্গে ফষ্টিনষ্টি করে। তখন তো বুঝিনি যে গ্রাজিয়া কতটা আমার মনেপ্রাণে গেঁথে গেছে! আমি শুধু চাইছিলাম ও আর কারুর কথা না ভেবে আমার দিকে শুধু মন দিক। অবশ্য কাজ না থাকলেই শহরের সব ব্যাটা জার্মান ওই হোটেলের বারে এসে ঢুকত। কিন্তু ওরা এলেই গ্রাজিয়া যেন জমাট বরফ হয়ে উঠতো। তা ব'লে ও যে একেবারে বোকা হাঁদা ছোট্ট বেড়ালছানাটি ছিল তা নয়……ইতালির মেয়েদের সে ধাতই নয়। ওর চুলে সব সময় তিন ইঞ্চি লম্বা একটা কাঁটা গোঁজা থাকতো। একবার আমায় বলেও ছিল, কেউ যদি আমার ওপর জোর খাটাবার চেষ্টা করে চোখ দু'টো একেবারে গেলে দেবো।"

মদের বোতল খালি হয়ে গেছল। এনজো ঢাকা ঠেলে কাউন্টারের পিছনে চলে গেল আরেকটা বোতল আনতে। ফিরে এসে নতুন বোতলটা খুলে নিজের গেলাসে ভ'রে নিল। বোধহয় খেয়ালই করল না যে আমি আর মদ খাচ্ছি না। "গণ্ডগোলটা প্রথম শুরু হ'ল ওর বাপকে নিয়ে।" একটু তিক্ত ভঙ্গীতে ফের শুরু করল এনজো। "ভদ্রলোক মিলানে গেছলেন। তারপর এক সপ্তাহ পেরিয়ে গেল, দেখা নেই। একদিন সকালে গ্রাজিয়াকে জিজ্ঞেস করলাম, 'তোমার বাবা কবে ফিরছে?' গ্রাজিয়া তখন বারান্দার মেঝেটা পুঁছছিল। আমার প্রশ্ন শুনেই কাজ থামিয়ে আশপাশ দেখে নিল। একটা কেরানী ছাড়া সেখানে আর কেউই ছিল না, কেরানীটাও আধ-কালা। গ্রাজিয়া আমার কাছে সরে এল, ওর মুখেচোখে এক অদ্ভুত ভাব।

'কাল রাত্তিরেই খবর পেয়েছি। তুমি নীচে আসবে ব'লে অপেক্ষা করছিলাম। বাবা এখন ফিরবে না!'

'কেন?'

'বলে পাঠিয়েছে যতদিন না ফিরে আসছে তুমি নিশ্চয় আমার দেখাশোনা করবে।'

'কোথায় গেছে বলতো?'

'উপস্থিত পাহাড়ে। গ্যারিবল্‌ডিদের দলে যোগ দিয়েছে!'

'কী সব্বোনাশ! হাতের কাছে পেলে হ'তো, ঘাড়টি মট্‌কে ছেড়ে দিতাম!'

'ও—তাহলে এই তোমার চেহারা?' ভারী হতাশভাবে গ্রাজিয়া আমার কি তাকাল।'

'তাছাড়া আবার কি? আহাম্মুক কোথাকার! খামকা প্রাণটা দেবে।'

'তুমি সব জেনেও তাহলে সাহায্য করবে না?'

'কাকে সাহায্য করবো?'

'বাবা বলেছিল, গেস্টাপোদের অফিসে কি কথাবার্তা হচ্ছে তোমার কাছ থেকে নিশ্চয় জানতে পারবো।'

'তোমার বুড়ো বাপের মাথায় গোবর আছে, বুঝলে? গোবর আছে—মগজ নেই। প্রথমতঃ, আমি কিছুই খবর পাই না। ওরা আমায় বিশ্বাস করে না। দ্বিতীয়তঃ, যদি বা জানি, তোমার বাবার পরিণাম কি হবে ভেবে দেখেছো? তুমি তো খবর পেলেই তোমার বাবাকে জানাবে আর তোমার বাবা জানাবে ওই সব বীরপুঙ্গবদের। তারপর একদিন না একদিন ওদের কেউ ধরা পড়বে আর সব গলগল করে বলে দেবে। তখন আমার অবস্থাটা কি হবে? শূন্যে ঠ্যাঙ ঝুলবে আর গলায় ফাঁস!'

'থাক্ থাক্ বুঝেছি—তুমি একটি ভীতুর ডিম!'

'এসব কথা বোঝবার মতো তোমার বয়স হয়নি। তাই বলতেও বারণ করছি।'

'তুমি বোধ হয় ভুলে গেছ, সেদিন যদি বাবা না থাকতো তুমি ঠিক ডুবে মরতে।'

'ভুলব কেন! তোমার বাবা যখন বলেছে তোমার ওপর খুশি মনেই নজর রাখবো। তুমি যদি চাও বিয়ে করেও তোমায় রক্ষা করতে রাজি আছি। তাব'লে ওই গ্যারিবল্‌ডিদের কারবারের মধ্যে আমি নেই।'

আমার কথা শুনে ও যেভাবে আমার দিকে চাইল, মনে হ'ল আমি বোধহয় আস্তাকুঁড় বিশেষ। অত্যন্ত রুষ্টভাবে বলল, "ওঃ বুঝেছি! আমার বাবার নির্দেশ মতো বলেই তুমি আমায় বিয়ে করতে চাইছো। ধন্যবাদ তার আর দরকার হবে না। তোমার প্রস্তাবটা মনে রাখলাম, ভবিষ্যতে কোনদিন যদি গেস্টাপোদের বুট-চাটা একটা লোককে বিয়ে করতে ইচ্ছে হয় তোমাকেই জানাবো।"

এনজো কথা থামিয়ে প্রথমে গেলাসের মদটা শেষ করল। তারপর আরো আধ গেলাস। বিকৃত ভাবে বলল, "কে-কি বলল তার জন্যে আমি থোড়াই কেয়ার করি। পাথরের ওজন আছে, ছুঁড়লে লাগে, কিন্তু কথা তো আর তা নয়। কিন্তু যেই শুনলাম গ্রাজিয়া বলছে আমি গেস্টাপোদের বুট চাটি, মাথায় রক্ত চড়ে গেল। মনে হ'ল একটা ভিজে দড়ি দিয়ে বেশ কয়েক ঘা বসিয়ে দি' ওর পশ্চাদ্দেশে। এমনও হতে পারে যে ওর কথা শুনে যতটা না তার চেয়েও বেশি খেপে উঠেছিলাম ওর তাকাবার ভঙ্গী দেখে। ওর চোখের দৃষ্টি আমার পৌরুষে আঘাত হেনেছিল। আমি খামকা নিজের সম্বন্ধে ভাবতে শুরু করলাম। এ কুবুদ্ধি আমার কোথেকে হ'ল, কোন্ অপদেবতা আমার ওপর ভর করলো যে আমি হঠাৎ অমন বিয়ের প্রস্তাব করে বসলাম! আমি তো ওকথা বলতে চাইনি!—কথাগুলো কেমন মুখ ফসকে বেরিয়ে গেছল। এ পর্যন্ত একটা মেয়েকেও আমি বিয়ে করবো ব'লে কথা দিইনি। ভাবতে কেমন অদ্ভুত ঠেকলো। যাই হোক, এরপর সারা সপ্তাহ গ্রাজিয়া আমার সঙ্গে গোনাগুন্তি কয়েকবার শুধু কথা বলেছিল। আর নিরুপায় হয়েই। যেন আমি ওর সম্পূর্ণ অপরিচিত। আমি যেন

জার্মান সৈন্য। ঠিক এমনি সময় এক কাণ্ড হ'ল। ইতিমধ্যে গ্যারিবল্‌ডিরা আরো সক্রিয় হয়ে উঠেছিল। রাস্তার ধারে ওত পেতে থেকে হঠাৎ ওরা জার্মানদের এস্‌-এস্‌ বাহিনীর খোদ এক কর্নেলকে বন্দী করে ফেলল। জার্মানরা গাদা গাদা পোস্টার লাগাল, যে ওদের সম্বন্ধে খবর এনে দিতে পারবে মোটা পুরস্কার পাবে। আমি তো মনে মনে প্রমাদ গুনলাম, হল এবার! এত বড় দাঁও যখন গ্যারিবল্‌ডিদের ওপর অনেকেরই শনিদৃষ্টি পড়বে। তারপরেই দেখলাম জার্মানরা একপাল কুকুর সমেত এক বিশেষ বাহিনাকে শহরে আনিয়ে নিজেদের সৈন্যদলকে আরো জোরদার করল। আমি আবার প্রমাদ গুনলাম। পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছিল ওরা এবার পাহাড়ী এলাকায় একটা জোর তল্লাসী চালাবে। এমন সময় হঠাৎ ইনফ্লুয়েনজার কবলে পড়লাম। পায়ে একদম জোর পাচ্ছিলাম না বলে ক'টা দিন জানালার সামনে ইজিচেয়ারে ব'সে, রেডিও শুনে আর বাইরের দিকে তাকিয়েই কাটিয়ে দিলাম। একদিন সন্ধ্যেবেলা, সবে তখন অন্ধকার হয়েছে, হঠাৎ চোখে পড়ল একটা লোক সাইকেলে চড়ে পার্কের উল্টোদিকে গেস্টাপোদের হেডকোয়ার্টারে গিয়ে ঢুকল। তোড়ে বৃষ্টি পড়ছিল, লোকটা মাথা অবধি কোটের কলার উঁচু ক'রে রেখেছিল। কিন্তু আমাদের দরজা থেকে যেটুকু আলো গিয়ে পড়েছিল তাতেই বুঝতে পারলাম লোকটা গিয়ানফ্রাঙ্কো। এক কুঁজো ফেরিওলা। লোকটা সারা শহরে তন্নতন্ন করে খুঁজে নানা হাবিজাবি জিনিস কিনতো। ছুঁচ, সুতো, রাঁধবার বাসন-কোসন ইত্যাদি। তারপর সাইকেলে চেপে পাহাড়ে গিয়ে চাষী আর মেষপালকদের কাছে এসব বেচতো। আমি লোকটাকে ভালভাবেই চিনতাম, কারণ, বেশ কয়েক বছর আগে ওর ভাগ্নীর সঙ্গে আমার একটু নটঘট হয়েছিল। যেই দেখলাম গেস্টাপোদের প্রহরীরা ওকে ভেতরে নিয়ে গেল, সঙ্গে সঙ্গে একটা কথা মনে পড়ে গেল। লোকটা চিরকালই মুসোলিনির

ভক্ত। যতবার কুচকাওয়াজ হয়েছে ওকে ব্ল্যাকশার্টদের সঙ্গে ঘোরাফেরা করতে দেখা গেছে। দেখেশুনে মনে মনে ভাবলাম, যাক্‌, পুরস্কারের টাকা তাহলে মিথ্যে মিথ্যেই খুশবু ছড়ায়নি। কি বলিস গিয়ানফ্রাঙ্কো ? মিনিট কুড়ি বাদে গিয়ানফ্রাঙ্কো বাইরে বেরোল, সতর্ক দৃষ্টিতে চারধার দেখে সাইকেলে চড়ে সোজা চলে এল আমাদেরই হোটেলে। আমি পায়ের ব্যথা ভুলে সটান নিচে নেমে এলাম। যা ভেবেছি—বারে এসে হাজির হয়েছে। এক গাদা জার্মান ছিল ব'লে বাইরে থেকেই আমি নজর রাখছিলাম। এক নাগাড়ে তিন গেলাস মদ শেষ করল গিয়ানফ্রাঙ্কো। তারপর যখন বিল মেটাচ্ছে আমি বাইরের বারান্দায় হেঁটে এলাম। একটু বাদেই ও বেরিয়ে এসে সাইকেলে চড়ে পাহাড়ের দিকে রওনা হয়ে গেল। আমি ঘরে ফিরে মহা ভাবনায় পড়লাম। ব্যাপারটা বুঝতে কোন অসুবিধে হল না। কিন্তু আমার সমস্যাটা অন্য রকম—গ্রাজিয়াকে কি সব কথা জানানো ঠিক হবে, না হবে না! আমি জানতাম গ্রাজিয়াকে যদি একথা বলি ও আমার ওপর বেশ গরম হয়ে উঠবে। কিন্তু তার আগে আমি যাচাই করে নিচ্ছিলাম এর ফলে আমার কোন গণ্ডগোলে পড়ার সম্ভাবনা আছে কিনা। শেষ পর্যন্ত ঠিক করলাম আমার ভয় পাবার কোন কারণ নেই, বললেও কিছু হবে না। গ্রাজিয়া কয়েকটা সৈন্যকে খাবার পরিবেশন করছিল। ওদের মধ্যে একজন ইতালিয়ান জানে বলে মনে হওয়ায় আমি গ্রাজিয়ার কাঁধে একটা টোকা মেরে বললাম, 'মিলান থেকে একটা ফোন এসেছে। মনে হচ্ছে, তোমার বাবা।' বলেই আমি বারান্দায় বেরিয়ে এলাম। গ্রাজিয়াও মিনিট খানেকের মধ্যে ছুটে এল। বললাম, 'ফোন্‌টোন কিছু আসেনি, একটা ব্যাপার হয়েছে। তোমার সঙ্গে কয়েকটা গোপন কথা আছে।' গ্রাজিয়া আমায় পুরোপুরি বিশ্বাস করতে না পারলেও বারান্দা পার হয়ে ওর ঘরের মধ্যে আমায় ডেকে আনল। আমি দরজাটা ভেজাতেই বলে উঠল, 'ব্যস্‌-ব্যস্‌—দরজাটা বন্ধ করার চেষ্টা ক'রো না।'

'আর তুমিও অমন সতী সাজার ভান ক'রো না! আমায় কি ভেবেছো!' আমি প্রায় চিৎকার ক'রে উঠলাম? গা জ্বলে গেছলো ওর কথা শুনে। 'ওই শুয়োরমুখো গিয়ানফ্রাঙ্কো ব্যাটা কি খাচ্ছিল শুনি?'

'গ্রাপ্পা। কেন?'

'এর আগে ও কখনো তোমাদের বারে এসেছে?'

'তোমার মতলবটা কি বলতো?' একেবারে বরফের মতো ঠাণ্ডা শোনাল গ্রাজিয়ার গলা। 'আমাকেও কি পুলিশের চর বানিয়ে ছাড়বে?'

'দ্যাখো, তোমার বাবা আমায় প্রাণে বাঁচিয়েছিল। কথাটা মনে আছে ব'লেই বোধহয় এবারের মতো হতভাগাকে বাঁচিয়ে দিচ্ছি। তবে তার আগে আমি যা জিজ্ঞেস করলাম তার জবাব দাও।'

হঠাৎ ভয় পেয়ে বিস্ফারিত চোখে গ্রাজিয়া আমার দিকে তাকাল। 'গিয়ানফ্রাঙ্কো মাঝেসাঝে আসে, বেশি নয়।'

'এর আগে যখন এসেছে তখনো কি গ্রাপ্পা খেয়েছে?'

মুহূর্তের জন্য ভেবে গ্রাজিয়া বলল, 'না, সাধারণ মদ নেয়, তাও ছোট্ট এক গেলাস।'

'তার মানে ও আজ বেশ দরাজ হাতে টাকা খসিয়েছে? কি বলো?'

'তা ঠিক।'

'ও যখন বিল মেটাচ্ছিল, কত টাকা সঙ্গে ছিল দেখতে পেয়েছিলে?'

'না।' গ্রাজিয়া আমার হাত চেপে ধ'রে বলল, 'আচ্ছা এনজো, এর সঙ্গে আমার বাবার কি সম্পর্ক?'

'পাহাড়ী অঞ্চল সম্বন্ধে ওই শুয়োরের বাচ্চা গিয়ানফ্রাঙ্কোর চেয়ে বেশি খোঁজ আর কেউ রাখে না। ও ব্যাটা গেস্টাপোদের হেড-কোয়ার্টার থেকে বেরিয়েই সটান্ গ্রাপ্পা খেতে এসেছিল।'

গ্রাজিয়া ব'লে উঠল, 'কি সর্বনাশ!' ঠকঠক ক'রে কাঁপতে শুরু করল। 'তাহলে তুমি কি মনে করছ?'

'আমার মনে হচ্ছে, ও পুরস্কারের এক দফা টাকা পেয়েছে। আমার হিসেব মতো জার্মানরা আর সময় নষ্ট করবে না। মাঝরাতেই সৈন্য নিয়ে যাবে, আর আকাশে আলো ফুটলেই, যেই একটু আশপাশ দেখতে পাবে, আক্রমণ চালাবে।'

'সর্বনাশ! আমি যদি ওই হতভাগার নোঙরা বুকটা ছোরা বসিয়ে ফালাফালা না করতে পারি আমাকেই তুমি চার টুকরো ক'রে ছিঁড়ে ফেলো!'

'ও কথা পরে ভাবলেও চলবে। ওদের কি এখন কোনভাবে সতর্ক ক'রে দেওয়া যেতে পারে?'

'পারে।' ও আমায় বলল। কাগজের মতো ফ্যাকাশে হয়ে গেছল গ্রাজিয়া।

'ওরা কি তাহলে পালাবার সময় পাবে?'

'মনে তো হয় পাবে।'

'এবার একটা কথা শোনো। আমাকে তুমি এর মধ্যে জড়াবে না। কেউ যেন জানতে না পারে যে আমি তোমায় এইসব বাত্‌লে দিয়েছি।'

'নিশ্চয়। সে তো ঠিকই।'

আমি সবে দরজাটা খুলছি গ্রাজিয়া হঠাৎ আমার গালে চুমু খেয়ে বসল। তখন বুঝিনি এই চুমুর দাম কতখানি। আমি কেবল ভাবছিলাম, যাক, চিঁড়ে ভিজেছে। ওর বাপের কাছে আমার এতদিনের ধারটা শোধ হ'ল। এবার পথের বাধা রইল না।. আমি ঘরে গিয়ে পার্কের দিকে নজর রাখবো ব'লে অন্ধকারেই ব'সে রইলাম। ইতিমধ্যে বৃষ্টি পড়া বন্ধ হয়েছিল, চারধারে কোনো প্রাণের স্পন্দন নেই। দশ মিনিট না যেতেই দরজায় টোকা পড়ল। গ্রাজিয়া এসে দাঁড়িয়েছে, ঠকঠক করে কাঁপছে। বলল, 'কাউকে পাঠাতে

পারলাম না। যোগাযোগ করবার জন্যে যে দু'জন লোক আছে তাদের কেউই বাড়ি নেই।' আর পরক্ষণেই ও যা বলল শুনে মনে হ'ল আকাশ ভেঙে পড়বে এবার। 'আমিই যাচ্ছি। ওরা কোথায় আছে জানি। আচ্ছা এনজো, আমায় একটা বন্দুক দিতে পারো?'

সেই মুহূর্তে আমি যেন দিব্যদৃষ্টিতে দেখতে পেলাম যে গ্রাজিয়া ধরা পড়বেই, আর গেস্টাপোরাও আমার কীর্তি জেনে ফেলবে। কিন্তু আমি ওকে বাধা দিই কি করে? বুঝতেই পারছো, গ্রাজিয়ার কথা নয়, আমি নিজের কথাই চিন্তা করছিলাম।

'আমায় একটা বন্দুক দেবে?' ও দ্বিতীয়বার জিজ্ঞেস করল।

'বুদ্ধুর মতো কথা বলো না।' আমার একটাই বন্দুক আর তার নম্বরটাও রেজিস্ট্রি করা আছে। তাছাড়া বন্দুক নিয়েই বা কি করবে, চালাতে তো জানো না।'

'কি করবো শোনোই না! জার্মানরা হয়তো আমার আগেই ওখানে হাজির হবে, কিন্তু তখনো যদি অন্ধকার থাকে তো একটা গুলি ছুঁড়ে ওদের সাবধান ক'রে দিতে পারবো।'

'বন্দুক আমি দিতে পারবো না।'

গ্রাজিয়া সঙ্গে সঙ্গে চলে যাচ্ছিল, আমি ওর হাত ধরে ফেললাম। 'গ্রাজিয়া, শোনো! আমি হয়তো তোমায় সাহায্য করতে পারি। তোমায় কতদূর যেতে হবে?'

ক্ষণেকের জন্যে ও যেভাবে আমার দিকে তাকাল——এখনো পরিষ্কার মনে পড়ছে····—ওর চোখে সেই আশাভরা দৃষ্টির কথা মুখে ব'লে বোঝানো যাবে না। আমি বুঝতে পারলাম ও কি ভাবছে—ভাবছে আমি নিজেই বোধহয় যেতে চাইব। 'রাস্তা ধরে হাঁটলে বিশ কিলোমিটার, কিন্তু কত ঘুরে ঘুরে পাহারাদারদের চৌকি বাঁচিয়ে যেতে হবে কে জানে!' ওর বুকভারা আশা তখন চোখের ঝলকে প্রকাশ পাচ্ছিল। আমি কিন্তু দরজা বন্ধ ক'রে দেবার মতোই আমার মনটাকে এমন একটা সুযোগ অবধি দিলাম না যে ওর কথা চিন্তা

করবে। পাছে নিজেকে যেতে হয় সেই ভয়েই মরছি, মনে মনে গ্যারিবল্‌ডিদের শাপ-শাপান্ত করছি, আর ভাবছি কি ক'রে গ্রাজিয়াকে রোখা যায়।

'তুমি খেপে গেছ, গ্রাজিয়া।' আমি বললাম। 'এখনই আটটা বাজে। ঠিক সময়ে পৌঁছতে হলে অন্ততঃ ভোর চারটের মধ্যে হাজির হতেই হবে। আট ঘণ্টায় পায়ে হেঁটে বিশ বা তিরিশ কিলোমিটার পথ পার হবে কি ক'রে? তাছাড়া তোমায় অন্ধকারের মধ্যে যেতে হবে, মাঠঘাট পেরোতে হবে, দরকার হ'লে লুকোতেও হ'তে পারে।'

'যতটা পারি ছুটেই যাব।'

'টচ না নিয়েই?'

'যদি তেমন দরকার পড়ে ছোট একটা টর্চ কাজে লাগাবো। যেতে আমাকে হবেই! কোন উপায় নেই!' মিনিট খানেক আমার উত্তরের আশায় থেকেও যখন কিছু শুনতে পেল না, গ্রাজিয়া এক ঝটকায় আমার হাত ছাড়িয়ে দরজার দিকে ছুটে গেল। এমন অসুস্থ বোধ করলাম, এত ভয় পেয়ে গেলাম যে, সব ভুলে স্রেফ্‌ চেঁচিয়ে উঠলাম, 'আরে, যাবেই যদি একটা কালো জামা তো অন্ততঃ পরবে! সঙ্গে একটুকরো কাঠকয়লা রেখো, ওরা যদি সার্চলাইট ব্যবহার করে মুখে মেখে নিতে পারবে। সঙ্গে একটা লাঠিও নিও কুকুরেব হাত থেকে বাঁচতে হলে। তাছাড়া খাবারও নিতে হবে, দেহের শক্তিটুকু তো বজায় রাখা দরকার। চিনি, চীজ্‌ আর রুটি নিয়ে নাও, বিশেষ করে চিনিটা।'

গ্রাজিয়া একটিও কথা বলল না। পাথরের মতো নিষ্প্রাণ মুখটা তুলে একবার শুধু আমার দিকে তাকিয়েই বেরিয়ে পড়ল।

ক্ষণেকের জন্য এনজোর গল্প থামাল। তীব্র দৃষ্টিতে আমার দিকে চাইল। ওর চোখদু'টো রক্তবর্ণ হয়ে উঠেছে। সামনে ঝুঁকে বসেছে আর হাতে ক'রে আঁকড়ে ধরেছে চেয়ারের হাতল দু'টো। "আমি ঠিক এই ভাবে ওই মেয়েটাকে, একটা ষোল বছরের ছোট

মেয়েকে চলে যেতে দিলাম। আমি ওর কথা চিন্তা করিনি, কেবল নিজের কথা ভেবেই ভয়ে মরছিলাম। যেই ও বেরিয়ে গেল আমি চেয়ারে ব'সে নিজে কি করবো সেই প্ল্যান আঁটতে শুরু করলাম। তখন সবচেয়ে নিরাপদ হ'ত স্রেফ্ ভেগে পড়া। আমার কাছে যা সাক্ষ্যপ্রমাণ ছিল তাতে কারফিউয়ের জন্য কোন চিন্তা নেই। রাত্তিরে নির্বিঘ্নে চলাফেরা করতে বাধা ছিল না। কিন্তু কে আমায় লুকিয়ে রাখবে? আমার পুলিশ জীবনের অভিজ্ঞতা থেকেই জানতাম যে মাসের পর মাস গা ঢাকা দিয়ে থাকতে হ'লে অনেকগুলো সুবিধে দরকার হয়। একটা ভাল আশ্রয়স্থল চাই, চাই এমন কিছু বন্ধু যারা নিজেদের জান অবধি দিতে রাজি। তাছাড়া প্রতিবেশীদের ওপরেও অনেক কিছু নির্ভর করে। এমন আদর্শ জায়গার কথা একটাও মনে পড়ল না। এক শহর থেকে অন্য শহরে যে পালিয়ে পালিয়ে বেড়াবো, তাতেও খুব সুবিধে হবে না। বাস স্টপে বা রেল স্টেশনে হঠাৎ ধরা পড়ার বেশ ভয় আছে। এসব জায়গায় ওরা খুব কাগজপত্র চেক্ করে। একটু বাদেই কিন্তু একটা কথা মাথায় খেলে গেল। মনে হ'ল এইটাই সবচেয়ে ভাল। সুইজারল্যাণ্ডের সীমানাটা ছিল ওখান থেকে মাত্র ষাট কিলোমিটার দূরে। সাইকেলে চ'ড়ে গেলে কতক্ষণই বা আর লাগবে। সোজা সীমান্ত-প্রহরীদের কাছে গিয়ে আমার নথি আর দোভাষীর পরিচয় পত্রটা দাখিল করবো ব'লে ঠিক করলাম। ওদের ভাঁওতা দিয়ে বলবো, আমি একজন আত্মগোপনকারী নেতার পিছু ধাওয়া করছি। বলবো, লোকটা সীমান্ত পার হবার চেষ্টা করতে পারে ব'লে জানা গেছে। আমি এ ব্যাপারে একেবার নিশ্চিত ছিলাম যে দু'চারটে কথা বলার পরই জেনে ফেলব সীমান্তের কোথায় কোথায় সৈন্য মোতায়েন আছে আর কোথায়ই বা নেই। সূর্যোদয়ের আগেই সুইজারল্যাণ্ড পেঁৗছে যাবো।"

এনজো যেন নিজেকেই ব্যঙ্গ ক'রে ম্লান হাসল। তারপর বিচিত্র

ভঙ্গীতে হাতের চেটো দিয়ে কাঠের উরুটাকে বার কয়েক থাবড়াল। "প্ল্যানট্যান যখন আঁটা হয়ে গেছে, ভাবছি হাঁপছাড়া গেল, ঠিক এমনি সময় হঠাৎ খেয়াল করলাম যে আমি গ্রাজিয়ার কথা ভাবতে শুরু করেছি! চোখের সামনে যেন দেখতে পেলাম রাতের অন্ধকারে ওই এক রত্তি গ্রাজিয়া ছুটে চলেছে। ওরা ধরা না পড়ার চান্স শতকরা এক ব'লেও আমি মানতে পারছিলাম না। আচমকা মনে হ'ল কে যেন আমার মাথায় হাতুড়ির এক ঘা বসিয়ে দিয়েছে—ভাবতে শুরু করলাম ধরা পড়ার পর গেস্টাপোদের কুঠরির মধ্যে ওর কি দশা হবে। দরদর ক'রে ঘামতে শুরু করলাম, পেটটা এমন গুলিয়ে উঠল যে প্রায় বমি হবার উপক্রম। আমার রওনা হওয়া উচিত কিন্তু পাত্থ'টো অনড় হয়েই রইল। আমি তখন গ্রাজিয়ার তুই চোখের সেই দৃষ্টি দেখছিলাম—ও আমার দিকে তাকিয়ে রয়েছে, আর আশা করছে ওর বদলে আমি নিজেই যেতে চাইবো। ও জানতো আমি পুলিশ হিসেবে ইচ্ছে করলেই সাইকেল চেপে পাহাড়ে চলে যেতে পারি। বিপদের আশঙ্কা রয়েছে ঠিকই কিন্তু তার চেয়ে শতগুণ বিপদের ঝুঁকি ও নিজের ঘাড়ে নিয়েছে। কেন আমি তখন একথা চিন্তা করিনি? আমি নিজেকে গালাগাল করতে লাগলাম। আয়নায় নিজের প্রতিবিম্বের দিকে তাকিয়ে এক ধাবড়া থুতু ফেলে নিজেই নিজেকে শাপমন্যি করলাম যে এখন থেকে অভুক্ত অন্ধ অবস্থায় আমার নিরানব্বই বছর বেঁচে থাকা উচিত। আমার জীবনে সেই প্রথম দেখলাম যে আমি নিজের গা বাঁচাবার কথা ভুলে অন্যের কথা চিন্তা করছি। আমার তখন একমাত্র প্রার্থনা, হে ঈশ্বর গ্রাজিয়াকে রক্ষা করো। তাবলে নিজে রক্ষা পাবার জন্যে গ্রাজিয়াকে রক্ষা করার কথা ভাবছিলাম না। আমি শুধু চাইছিলাম গ্রাজিয়ার যেন কিছু না হয়। তাই যদিও বারবার মনে হচ্ছিল কালবিলম্ব না ক'রে এক্ষুণি আমার বেরিয়ে পড়া উচিত, বেরোনো আর হ'ল না। পক্ষাঘাতের রুগীর মতো সারাটা রাত ওখানে ব'সেই কেটে গেল।

যা ভেবেছিলাম তাই হ'ল, ভোর চারটে না বাজতেই সারি সারি মটর সাইকেল, সাঁজোয়া গাড়ি আর লরী বোঝাই সৈন্য নিয়ে জার্মানরা পাহাড়ের দিকে যাত্রা শুরু করল। সাড়ে ছ'টার সময় একটা যাত্রীবাহী গাড়ি ফিরে এল দেখলাম। গেস্টাপোদের হেড-কোয়ার্টারের সঙ্গে লাগোয়া চারপাশ ঢাকা জায়গাটার মধ্যে ঢুকল। আমি শুধু ড্রাইভারকেই দেখতে পেয়েছিলাম। তারপর সাতটা পনেরোর সময় ফোন বেজে উঠল—সুস্থ বা অসুস্থ যে অবস্থাতেথাকি এক্ষুণি আমায় হাজির হতে হবে।"

এনজো কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে শেষ পর্যন্ত জোর করে নিজেকে টেনে উদ্ধার করে আনল স্মৃতিরাজ্য থেকে। যন্ত্রণাবিদ্ধ কণ্ঠে বলল, "আমাকে ওরা কমিশারের কাছে পাঠিয়ে দিল। ব্র্যাণ্ড নামে এই লোকটা গেস্টাপোতে ঢোকবার আগে আমারই মতো পুলিশে কাজ করতো, তবে খুব উঁচু পোস্টে, একটা শহরের প্রধান গোয়েন্দা হিসেবে। বছর ষাটেক বয়সের এই লোকটা যে আমার চেয়ে অনেক ধড়িবাজ তা আমি জানতাম। এরা কে কি ভাবছে, কি অনুভব করছে, বোঝা তুঃসাধ্য। মুখ নয়তো যেন নিরেট পাথর। আমি ওকে ঘেন্নাও করতাম আবার ভয়ও করতাম। প্রথমেই আমাকে ও জিজ্ঞেস করল, এখন শরীরের অবস্থা কেমন। আহা—কত না দরদ! বললাম, পায়ে এখনো তেমন জোর পাচ্ছি না। ব্র্যাণ্ড এবার প্রশ্ন করল, 'আজ সকালে সৈন্য চলাচলের আওয়াজ শুনেছো?'

'আজ্ঞে হ্যাঁ, হেয়ার কমিশার, আওয়াজে ঘুম ভেঙে গেছল।'

'ওই দলটা হানা দিতে গেছল। আমাদের কাছে দেশপ্রেমিক ব্যাটাদের গোপন আড্ডা সম্বন্ধে একটা খবর এসেছিল—পাহাড়ের মধ্যে একটা গুহায় ওরা লুকিয়ে ছিল।' ব্র্যাণ্ড কথা থামাল কিন্তু আমার চোখ থেকে চোখ ফেরায়নি। আমি একেবারে শিউরে উঠলাম। এত ভয় পেয়ে গেছলাম যে একটা অদ্ভুত ক্ষ্যাপা চিন্তা মাথায় এল। মনে হ'ল আমার কাছে এখন যদি এক ব্যাগ মুন

থাকতো বড় ভাল হ'ত, নতুন বাড়িতে ঢোকবার আগে চাষীরা যেমন সৌভাগ্য কামনা করে মেঝেময় নুন ছড়ায়, আমিও তেমনি ছড়াতে পারতাম। পুরোটাই পাগলামি। যাইহোক, ব্র্যাণ্ড ফের মুখ খুলল। 'আমাদের প্রতি বন্ধুভাবাপন্ন তিনটি লোক কাল সারারাত ওই গুহায় ঢোকবার পথটার ওপর নজর রেখেছিল···'

মনে মনে ভাবলাম, 'অর্থাৎ গিয়ান ফ্র্যাঙ্কো আর তাব দু'ভাই।'

'একটা ছোট নদীর পাড়ে তিরিশ মিটার অন্তর দাঁড়িয়ে এরা পাহারা দিচ্ছিল। গুহাটা ছিল নদীর ওপারে দু'শো মিটার দূরে। কথা ছিল আমাদের সৈন্যরা পাঁচটার সময় পেঁৗছবে। কিন্তু সৈন্যরা আসবার ঠিক কুড়ি মিনিট আগে ব্যাটারা ব্যাপারটা জেনে ফেলে, সবাই হাওয়া হয়ে যায়।'

এনজো এবার প্রায় ফিসফিস করে বলল, 'এই কথা শুনে মনে হল আমি বুঝি আনন্দে ফেটে পড়বো। আমার ছোট্ট সোনা গ্রাজিয়া কি কাণ্ডটাই না করেছে! পরমুহূর্তেই কিন্তু মনে হল ব্র্যাণ্ড-ব্যাটা একটা তোয়ালে পাকিয়ে আমার টুঁটি টিপে ধরেছে, শ্বাসরুদ্ধ হয়ে আসছে।'

'জানো, একটা মেয়ে ওদের সতর্ক করে দিয়েছিল। তোমারই হোটেলের বারে সে কাজ করে।'

আমি যতটা সম্ভব বিস্মিত হবার ভান করলাম, 'গ্রাজিয়া? কি কাণ্ড! আমি হ'লে কস্মিন কালেও ওকে সন্দেহ করতাম না।'

'কেন?'

'ও তো একেবারে বাচ্চা। এসবের মধ্যে আবার জড়িয়ে পড়ল কি করে?'

'হুঁ, সেইটাই তো প্রশ্ন?' ব্র্যাণ্ড ব্যঙ্গের সুরে বলল। 'ভারী সুন্দর ও নিষ্পাপ একটি ছোট্ট মেয়ে। এবং সেইসঙ্গে নিশ্চয় ধর্মপ্রাণ ক্যাথলিক। মেয়েটা নদীর কাছে আসতেই আমাদের একজন ওর ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে—আর মেয়েটাও সঙ্গে সঙ্গে একটা পাঁউরুটি কাটা

ছুরি ওর বুকে বসিয়ে দেয়। এত জোরে ছুরিটা মেরেছিল যে নিজেই আর সেটা টেনে বার করতে পারেনি। আমাদের আর দু'জন এগিয়ে আসতেই শয়তান মেয়েটা নদীর দিকে ছুট লাগাল আর দেশপ্রেমিকদের জানিয়ে দেবার জন্যে গলা ছেড়ে চেঁচাতে শুরু করল—জার্মানরা আসছে, জার্মানরা আসছে। আমরা ওকে ধরে ফেলার আগেই বেশ কয়েকবার চেঁচিয়ে নিয়েছিল।······শুনলে তো, তা এবার তুমি কি বলো ?'

'আমি আর কি বলবো, হেয়ার্ কমিশার।'

'এর থেকে তুমি কি বুঝলে ?'

একটু ভেবে উত্তর দেবো বলে বর্ষাতিটা গা থেকে খুলতে শুরু করলাম। 'মনে হচ্ছে এ-শহরে দেশপ্রেমিকদের একটা দল আছে··· ···তাছাড়া ভেতরের খবর জোগাড় করারও ভাল বন্দোবস্ত আছে।'

'মানলাম।'

'কিন্তু এটা কি ভারী আশ্চর্যের ব্যাপার নয় যে ওরা একটা মেয়েকে এরকম গুরুত্বপূর্ণ কাজের দায়িত্ব দিল ?'

'আশ্চর্য কিনা জানি না তবে মেয়েটা কাজ সেরেছে। কাজেই ওরা কিছু ভুল করেনি। সে যাইহোক, এখন সব খবর পাবার চাবিকাঠি ওই মেয়েটা। ইতিমধ্যেই ওকে জিজ্ঞাসাবাদ করেছি কিন্তু হতচ্ছাড়ী ভারী দেশভক্তি দেখাচ্ছে। তাছাড়া তুমি তো জানই আমি ভাল ইতালিয়ান বলতে পারি না। আমার সবকথা হয়তো বুঝতে পারেনি। এই মুহূর্তে ওকে একটু স্পেশাল চিকিৎসা করা হচ্ছে। ফিরে এলে তুমি ওর সঙ্গে কথা বলবে। ওর বেশ ভাল ভাবে নিজের অবস্থাটা উপলব্ধি করা দরকার। ওদের দলের প্রত্যেকের নাম ও যদি আমাদের জানায় তবেই আমরা ওকে ছেড়ে দেব। ও ফের বারে ফিরে যেতে পারবে। আর তা না হ'লে আমি ওকে সহজে নিস্তার দেব না, টুকরো টুকরো ক'রে ছিঁড়ে ফেলবো।' "

ষোল বছর আগে ব্র্যাণ্ড এনজোকে এই কথাগুলো বলেছিল, কিন্তু আজ এতদিন পরে আমাকে সেকথা গল্প করে শোনাতে গিয়েও ওর গলার স্বর ভারাক্রান্ত হয়ে উঠেছে। ' 'টুকরো টুকরো ক'রে ছিঁড়ে ফেলবো।' " এনজো দ্বিতীয়বার উচ্চারণ করল। "তুমি কি ক'রে বুঝবে ব্র্যাণ্ডের কথা শুনে আমার কি দশা হয়েছিল·····কি ভয়ই না পেয়েছিলাম, নিজেকে কি অপরাধীই না মনে হচ্ছিল। আমি জিজ্ঞেস না ক'রে পারলাম না ওকে নিয়ে এখন কি করা হচ্ছে। প্রশ্নটা খুবই বিপজ্জনক ছিল সন্দেহ নেই। চোরা কুঠরির মধ্যে কি হচ্ছে না হচ্ছে বা 'স্পেশাল চিকিৎসা' মানে কি, এসব কথা জানবার আমার কোন অধিকারই ছিল না। আমার জিভটা মনে হচ্ছিল। লোহার মতো ভারী হয়ে উঠেছে, কিছুতেই আর নাড়তে পারছি না। বললাম, 'হের কমিশার ·····মেয়েটাকে আমি ভাল ভাবেই চিনি, ওর মুখ খোলবার একটা প্ল্যানও মাথায় এসেছে···কিন্তু প্রথম কথা···যদি প্রশ্ন করতে দেন···মানে এখন ওকে নিয়ে কি করা হচ্ছে যদি বলেন···মানে এর ফলে আমার প্ল্যানটা নাও কাজে লাগতে পারে আর কি।'

ব্র্যাণ্ড শীতল দৃষ্টিতে বেশ খানিকক্ষণ আমার দিকে চেয়ে রইল। 'তোর ব্যাপারখানা কি ? ঘামছিস, গলা কাঁপছে ?'

'এখনো ইনফ্লুয়েনজার ধাক্কা পুরো কাটিয়ে উঠতে পারিনি।' যতটা সহজ ভাবে সম্ভব উত্তর দিলাম। 'এ নিয়ে ভাবনার কিছু নেই।'

ব্র্যাণ্ড আরো মুহূর্তখানেক আমার দিকে তাকিয়ে শেষপর্যন্ত বলল, 'আমার ইচ্ছে মেয়েটা এখন থেকে আমার হয়ে কাজ করুক। তাই ভেবেছিলাম প্রথমেই একটু নাড়া দেওয়া দরকার। তা ব'লে এমন মারাত্মক কিছু নয়, কাল থেকে আবার আগের মতোই হোটেলের কাজ করতে পারবে ! আমি আমার ছেলেদের এক এক ক'রে মজা লোটবার সুযোগ দিয়েছি।' "

বলতে বলতে এনজোর ঠোঁটে একটা বিকৃত বিষণ্ণ হাসি ফুটে

উঠল। আমার দিকে চেয়ে কোমলস্বরে বলল, "এবার মন দিয়ে মানুষের হৃদয়ের বিচিত্র কীর্তির কথা শোনো। প্রথম কয়েক মুহূর্তের জন্যে মনে হয়েছিল আমি আর বুঝি নিজেকে সামলে রাখতে পারবো না। কিন্তু কি আশ্চর্যের কথা বলো, ওকে যে অত্যাচার করা হচ্ছে সে তো আমি আগে থেকেই জানতাম! মুগুরের বাড়ি খাবার বদলে, আঙুলের নখগুলো একটা একটা ক'রে উপড়ে ফেলার বদলে এখন না হয় ছ'জন লোক বেচারীকে ধর্ষণ করেছে, এমন কি তফাত? হয়তো এটাই কম কষ্টের। তুমি বলতে পারো যে আমি ওকে ভালবাসতাম ব'লেই এ কথা শুনেই পাগল হয়ে উঠেছিলাম। তা নয় কিন্তু, ব্যাপারটা আরো জটিল ও ভয়াবহ। আমি যেন একটা দুঃস্বপ্ন দেখছিলাম তখন, একসঙ্গে কত যে ঘটনা চোখের সামনে ভেসে উঠছিল তার ইয়ত্তা নেই। মনে হচ্ছিল আমি যেন গ্রাজিয়ার দেহের মধ্যে রয়েছি। ওর বুকের ভেতরে। মনে হচ্ছিল ও কাঁদছে না, কাঁদছি আমি, ওর যত লজ্জা আমারই লজ্জা। আবার সঙ্গে সঙ্গে এও মনে হচ্ছিল যে আমিও ধর্ষণকারীদের একজন। ওদের দলের মধ্যে আমিও রয়েছি। আমিও কি অনিচ্ছুক মেয়েদের ওপর অত্যাচার করিনি—সোজাসুজি জবরদস্তিটা হয়তো করিনি কিন্তু যে-সব ছলা-কলার সাহায্য নিয়েছিলাম হরেদরে তারও মানে সেই একই দাঁড়ায়। গ্রাজিয়ার বুড়ো বাপ মাঝখানে না থাকলে একটা না একটা ফন্দি এঁটে গ্রাজিয়াকেও নিশ্চয় আমি বিপদে ফেলতে কসুর করতাম না। সেই মুহূর্তে আমি নিজের আসল চেহারাটা দেখতে পেলাম—ওই গোপন কুঠরীর শুয়োরগুলোর সঙ্গে আমার বিন্দুমাত্র পার্থক্য নেই বুঝলাম। সত্যি বলছি, আমার ভেতরে যে তখন কি তোলপাড় চলছিল তা ব'লে বোঝান, কথায় প্রকাশ করা আমার সাধ্যে নেই। একটা আগ্নেয়গিরি যেন তার পেটে যা কিছু আছে উপরে ফেলতে চাইছে। আমি কিন্তু তখন যা-যা ভেবেছিলাম, যা-যা অনুভব করেছিলাম, সমস্ত এখনো মনে আছে। আমি মনে মনে নিজেই

নিজের উদ্দেশে বলেছিলাম, 'বেশ তো রে কাপুরুষ, শালা দুর্গন্ধময় নাড়ির মধ্যে নর্দমার ময়লা ভরা শুয়ার—তোর একটা বন্দুক তো রয়েছে। ওরা গ্রাজিয়াকে নিয়ে এলেই তুই ব্র্যাণ্ডকে গুলি করবি, তারপর করবি গ্রাজিয়াকে আর নিজেকে।'

আবার সেই তেরছা বিষণ্ণ হাসি ফুটে উঠল এনজোর ঠোঁটে। "দেখতেই তো পাচ্ছো যে আমি নিজেকে গুলি করিনি, কাউকেই করিনি। একটু বাদে দু'জন এস্‌-এস্‌ গ্রাজিয়াকে অফিসে নিয়ে এল। গ্রাজিয়া হাঁটছিল বটে কিন্তু কোন চৈতন্য আছে মনে হচ্ছিল না। ও শুধু কাঁদছিল……হে ভগবান……সে কান্না তারস্বরের কান্না নয় কিন্তু ওর শরীরের প্রতিটি অঙ্গ যেন ঈশ্বরের কাছে আবেদন জানাচ্ছিল। ওরা গ্রাজিয়াকে একটা চেয়ারে বসিয়ে দিতেই ও গড়িয়ে মাটিতে পড়ে গেল। কোন বাচ্চা ছেলে নেকড়ার পুতুল ছুঁড়ে ফেলে দিলে যেমন হয় গ্রাজিয়াও ঠিক তেমনি ভাবে লুটিয়ে রইল মাটির ওপর।"

এনজো থামল। ও কাঁদছে। নীরবে চোখের জল গড়িয়ে পড়ছে রুক্ষ গাল বেয়ে! "গ্রাজিয়া কালো স্কার্ট আর শোয়েটার পরে ছিল। বেশ মনে পড়ছে ওর স্কার্টের এক পাশে কয়েকটা বোতাম ছিল না, খোলা পাটা দেখা যাচ্ছিল। রক্তের ডোরাকাটা দাগ। ব্র্যাণ্ড রক্ত দেখে যেন অবাক হয়ে হাসল। এস্‌-এস্‌দের লোক দুটোকে বলল, 'এও তাহলে বিশ্বাস করতে হ'ল! এই বয়সের ইতালী মেয়ে অথচ কুমারী—অবাক কাণ্ড!' দুটো লোকই খ্যাক খ্যাক করে হেসে উঠল। এক ব্যাটা বলল, 'আমরাও অবাক হয়ে গেছলাম।' ব্র্যাণ্ড ওদের এবার হাত নেড়ে সরিয়ে দিল। আমায় বলল, 'মনে হচ্ছে এবার মুখ খুলবে। নাও, শুরু করে দাও……' ঠিক এই মুহূর্তে কি-করবো, না করবো, মনস্থির করে ফেললাম। বললাম, 'যে আজ্ঞে, হেয়ার কমিশার'। গ্রাজিয়ার কাছে সরে এলাম। ওকে তুলে ধ'রে দেওয়ালে ঠেস দিয়ে বসিয়ে দিলাম। বাববার

বলতে লাগলাম, 'গ্রাজিয়া, গ্রাজিয়া—আমি এনজো।' আস্তে আস্তে ওর কান্না বন্ধ হয়ে এল, আমায় আবছাভাবে দেখতেও পেল। আমি ব্র্যাণ্ডকে একটু জলের জন্যে বললাম। জল এলে গেলাসটা ওর মুখের সামনে ধ'রে খেয়ে নিতে বললাম। প্রথমটা একটু ঠোঁট ঠেকিয়েছিল তারপরেই যেন বুকজোড়া তেষ্টা মেটাতে ঢক্‌ঢক্‌ ক'রে পুরোটা খেয়ে নিল। বললাম, 'গ্রাজিয়া আমার দিকে তাকাও দেখি। চিনতে পারছো? ও আমার দিকে তাকিয়ে একটু ঘাড় নাড়ল। আবার বললাম, 'আমি কি করছি মন দিয়ে ত্যাখো!' রিভলবারটা বার ক'রে বললাম, 'এটা দেখছো?' আবার ও ঘাড় নাড়ল। 'ভাল ক'রে ত্যাখো কি করছি!' বলতে বলতেই আমি এক ঝটকায় রিভলবার উঁচিয়ে ধরলাম ব্র্যাণ্ডকে লক্ষ্য ক'রে।"

মুহূর্তের জন্যে এনজো বিরাম নিল। কোলের ওপর ওর আঙুল-গুলো ছটফট করছিল। আমায় বলল, "বুঝলে—আমি সবই ঠিক করেছিলাম——পরবর্তী প্রতিটি কাজ বেশ মাথা খাটিয়ে বার করে-ছিলাম···কিন্তু—কিন্তু একটা কথা ভাবিনি। এখুনি জানতে পারবে সেকথা। ব্র্যাণ্ডকে বললাম, 'ত্যাখো তুমি যদি আমার কথার একটু এদিক ওদিক ক'রো সঙ্গে সঙ্গে শেষ করে ফেলবো। ওইদিকে সরে যাও!' হাত ওপরে তুলে দেওয়ালের দিকে মুখ ক'রে ও আমার কথা মতো দরজার একপাশে এসে দাঁড়াল। কেউ যদি দরজা খোলেও তো ওকে দেখতে পাবে না। ওকে সার্চ করতেই বেল্টে গোঁজা একটা ছোরা আর লুগারখানা পেয়ে গেলাম। এবার আমি পিছিয়ে এলাম যাতে একইসঙ্গে গ্রাজিয়াকেও দেখতে পাই আবার ব্র্যাণ্ডের ওপরে দরজার দিকেও দৃষ্টি রাখা যায়। গ্রাজিয়া আড়ষ্ট হয়ে বসেছিল। বললাম, গ্রাজিয়া শোনো, আমি তোমাকে এখান থেকে নিয়ে যাবো। কি বলছি বুঝতে পারছো? বলো বলো—কি বুঝলে বলো!'

'হ্যাঁ এনজো।' কথাগুলো উচ্চারণ করতে গ্রাজিয়া বেশ কষ্ট পেল। 'আমি বুঝতে পেরেছি এনজো।'

'হাঁটতে পারবে তো? উঠে দাঁড়াও দেখি।'

উঠে দাঁড়াল গ্রাজিয়া কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে একটা চেয়ারের মাথা ধরতে হল ভার সামলাতে।

'মাথা ঘুরছে?' আমি জিজ্ঞেস করলাম।

'একটু একটু, তাহলেও হাঁটতে পারবো। এনজো, প্লিজ আমাকে এখান থেকে নিয়ে চলো এনজো! আর তা যদি না পারো গুলি করে আমায় শেষ করে দাও—প্লীজ্! কথা দাও এনজো গুলি করবে? এনজো—মেরীর নামে শপথ করে বলো ঠিক গুলি করবে তো?'

'হ্যাঁ, কথা দিচ্ছি। কিন্তু এখন শান্ত হও।' আমি আর ওর এই 'এনজো এনজো' ডাক সহ্য করতে পারছিলাম না।

যে কাপুরুষ ওকে এই বিপদের মুখে ঠেলে দিয়েছে তাকেই যেন ও নিজের রক্ষাকর্তা ঠাউরেছে বলে মনে হচ্ছিল ওর এই ডাক শুনে। যাইহোক পিস্তলটা যাতে কারুর নজরে না প'ড়ে তাই বর্ষাতিটা গায়ে চড়িয়ে নিলাম। তারপর ব্র্যাণ্ডের কাছে গিয়ে বললাম, 'ভাল করে শোন্ যা বলি! আমিও পুলিশ, তুইও পুলিশ—তাই বলছি যে আমি ভাল ভাবেই জানি তোর বেঁচে থাকার যথেষ্ট ইচ্ছে রয়েছে আর আমারও শুধু শুধু তোকে মেরে কোন লাভ নেই। আমি কোন প্রেমিক-ট্রেমিক কিছুই নই কিন্তু এ-মেয়েটাকে আমার চাই। আমার কথা মতো যদি চলিস আধ ঘণ্টার মধ্যেই ছাড়া পাবি। কি, পছন্দ হ'ল আমার প্রস্তাব?'

'নিশ্চয়। কিন্তু আমাকে এখন কি করতে হবে?'

আমি এবার আমার বাণ ছাড়লাম—আমার আর গ্রাজিয়ার ঠিক তিন পা আগে ও হাঁটবে। আমরা সোজা মাঠের মধ্যে গিয়ে একটা গাড়িতে উঠব। ও-ই চালাবে। পাহাড়ে পৌঁছবামাত্র ওকে আমরা ছেড়ে দেব। কিন্তু একটু যদি বেচাল হয় সঙ্গে সঙ্গে খতম।

'সে ভয় ক'রো না—আমি অত বোকা নই।' ব্র্যাণ্ড বলল।

ঠিক এই কথামাফিকই কাজ হয়েছিল।” এনজো আমায় জানাল। “আমি একহাতে গ্রাজিয়াকে জড়িয়ে ধরলাম আর অন্য হাতে পিস্তলটা রেডি ক’রে রাখলাম। অফিস থেকে মাঠটার দূরত্ব খুব বেশি ছিল না—একটা সিঁড়ি আর একটা দরজা খালি পেরোতে হয়েছিল। বারান্দায় কেবল একটা এস্ এস্ বাহিনীর লোক আর একটা প্রহরী পড়েছিল। মাঠে এক প্লেটুন সৈন্য ছিল কিন্তু ব্র্যাণ্ড একটা গাড়ি চেয়ে চেঁচিয়ে উঠতে কেউ আর কোন প্রশ্ন করেনি। গ্রাজিয়াকে পিছনের সীটে তুলে আমি শুয়ে পড়তে বললাম। আমি ব্র্যাণ্ডের সঙ্গে সামনেই উঠলাম। হেডকোয়ার্টারের পর যতক্ষণ না দু’চারটে বাড়ি পেরোয় ওকে ধীরেসুস্থে চালাতে বলেছিলাম। তারপর পুরো বেগে। পনেরো মিনিটের মধ্যে শহর পেরিয়ে গেলাম আর তারপর কুড়ি মিনিট না যেতেই একেবারে পাহাড়ের কাছে। আমি ওকে থামতে বললাম। তখন এত ভাল লাগছিল, এত উত্তেজিত হয়ে পড়েছিলাম যে ওকে নিয়ে একটু খেলা করার লোভ সামলাতে পারলাম না! আচ্ছা ব্র্যাণ্ড, সত্যি করে বলতো, তোমার কি মনে হচ্ছে না যে এবার আমি তোমায় শেষ ক’রে ফেলবো?’

‘আমরা দু’জনেই একটা করে চাল চেলেছি। তুমিই না বলেছিলে যে আমরা দু’জনেই আসলে পুলিশ। আমি জানি তুমি আমায় মারবে না।’

‘তা বটে কিন্তু গ্রাজিয়ার মতটাও তো নিতে হবে! গ্রাজিয়া, তুমি কি বলো, মারবো?’

গ্রাজিয়া সম্মতি জানাল। সত্যি বলছি—সে যদি তুমি দেখতে ……কনে বৌ যেন বিয়ের সময় ঘাড় নেড়ে তার আপত্তি না-থাকার কথা জানাচ্ছে। আমি লুগারটা পকেট থেকে বার করে ঘোড়া টেনে গ্রাজিয়ার দিকে এগিয়ে দিলাম।”

এনজো আমাকে লক্ষ্য ক’রে তিক্তভাবে হাসল। “হ্যাঁ, ব্যাপারটা

বেশ ভালই জমেছিল তবে কিনা জায়গাটা ছিল পাহাড়ী আর গাড়িটা ছিল জার্মানদের·····আশপাশের দেশপ্রেমিক বাহিনীর পক্ষে নিঃসন্দেহে লক্ষ্যভেদ করার চমৎকার একটা সুযোগ। আমি ঠিক এই একটা কথা ছাড়া আর সবই চিন্তা করেছিলাম। একটা টমিগান তাই হঠাৎ একপাশ থেকে গর্জে উঠে আমাদের আঘাত করল, আর গ্রেনেড ছুটে এল ওপাশ থেকে। জ্ঞান ফিরতে দেখলাম আমি দেশ প্রেমিকদের আস্তানায় রয়েছি। ওরা সবাই তখন অত্যন্ত ব্যথিত, কিন্তু ওদের কি দোষ? ওরা কি করে জানবে গাড়িতে কে রয়েছে? আমার পা দু'টো বরবাদ হয়ে গেল—ব্র্যাণ্ড আগেই মরেছিল আর আমাব ছোট্ট গ্রাজিয়াও মারা গেল।"

এনজো আমার দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে রেস্তোরাঁর শূন্য অন্ধকারের দিকে চাইল। ধীরে ধীরে বলল, "সবই তো শোনালাম, এই আমার গল্প। আমার কি মনে হয় জানো? এই নিয়ে কত যে ভেবেছি তার ইয়ত্তা নেই! যাক্‌গে সেকথা, কীট-পতঙ্গের কথাই না হয় এবার ধরো। এই কীট-পতঙ্গদেরও একটা অদ্ভুত ক্ষমতা আছে। লোকে বলে এটা ওদের প্রবৃত্তি যার দরুন ঠিক যেভাবে জীবনযাপন করা উচিত তাই ওরা করে। কিন্তু আমরা যারা মানুষ—আমাদের হৃদয় বড় জটিল। তাই বোধহয় না বুঝেই এইরকম সব ভয়াবহ কাণ্ড করে বসি। তাই নয় কি?"

অনুবাদ | সিদ্ধার্থ ঘোষ

গী দ্য মোপাসাঁ

ক্যাপ্টেন এপিভঁ যখন রাস্তা দিয়ে হেঁটে যেতেন প্রত্যেকটি মহিলাই একবার অন্ততঃ তাঁর দিকে ফিরে তাকাতো। তিনি ছিলেন যাকে বলা যায় একজন খাঁটি সুপুরুষ 'হাসার' অফিসার। স্বাভাবিক ভাবে হেঁটে গেলেও মনে হত তিনি প্যারেড করছেন। অবশ্য কিছুটা প্যারেডের ভঙ্গীতে গটমট করেই হাঁটতেন তিনি। আর দেখে মনে হত তিনি বোধহয় সবসময়ই তাঁর পৌরুষ এবং সৌন্দর্য নিয়ে রীতিমত গর্বিত। অবশ্য আকর্ষণীয় সৌন্দর্য তাঁর কোনদিক দিয়ে কম ছিল না।

ক্যাপ্টেনের গোঁফ ছিল বেশ ঘন, পুরু এবং পাকা গমের মত গাঢ় সোনালী রঙের। ঠোঁটের দুপাশ দিয়ে পুরো মিলিটারি কায়দায় নেমে এসে আবার ছোট্ট দুটো পাক খেয়ে গিয়েছিল। তাঁর কোমর ছিল সিংহের কোমরের মত সরু, অথচ বুকখানা চওড়া ও বলিষ্ঠ। তাছাড়া ক্যাপ্টেনের মতো অত সুঠাম পা একমাত্র যারা জিমন্যাস্টিক দেখায় তাদেরই থাকে। শক্ত আঁটসাঁট উজ্জ্বল লাল প্যান্ট পরে তিনি যখন হাঁটতেন, পায়ের প্রতিটি পেশির সঞ্চালন স্বতন্ত্রভাবে ধরা

পড়ত। তাঁর মেপে মেপে পা ফেলা দেখে মনে হত বুঝি কোন অশ্বারোহী সৈনিক চলেছে। সাধারণ সাদামাটা পোশাকে অবশ্য তাঁকে এরকম দেখাত না। সাধারণ লোকের মত কালো বা ধূসর রঙের পোশাকে তাঁর এই আভিজাত্য প্রকাশ পেত না। কিন্তু সামরিক বেশ গায়ে চড়ানো মাত্র তাঁর চেহারাই পাল্টে যেত।

দেহের মত তাঁর মুখশ্রীও ছিল নিখুঁত সুন্দর। পাতলা, টিকালো নাক। প্রশস্ত উন্নত কপালের নীচে দুটি উজ্জ্বল নীল চোখ। খুঁতের মধ্যে এইটুকুই যে তাঁর মাথায় টাক ছিল। কেন যে চুল উঠে গিয়েছিল তা তিনি কোনদিন বুঝতে পারেননি। তবে নিজেকে তিনি এই বলে সান্ত্বনা দিতেন যে এত সুন্দর একজোড়া গোঁফের সঙ্গে সামান্য একটু টাক থাকলে তা কারুর চোখেও পড়ে না।

ক্যাপ্টেন ছিলেন ভয়ানক উন্নাসিক এবং প্রায় সবাইকেই নিদারুণ উপেক্ষা করে চলতেন। মধ্যবিত্ত শ্রেণীকে তিনি একেবারেই সহ্য করতে পারতেন না। তাঁর কাছে এই শ্রেণীর কোন অস্তিত্ব ছিল না। রাস্তার কুকুরের চাইতেও অধমজ্ঞান করতেন এই শ্রেণীর লোকদের। তাঁর জগতে একমাত্র কদর ছিল অফিসারদের। তাও আবার তিনি সবাইকে সমান শ্রদ্ধা দেখাতেন না। শ্রদ্ধা দেখাতেন একমাত্র প্রখর ব্যক্তিত্বসম্পন্ন, সুপুরুষ অফিসারদের। যে কোন সৈনিকই তাঁর কাছে ছিল নিছক আমুদে এক লোক, যার যুদ্ধকরা আর প্রেমে পড়া ছাড়া অন্য কোন কাজ নেই। এদের থাকার মধ্যে আছে একমাত্র অসুরের মত মাংসপেশি, আর ঝাঁকড়া ঝাঁকড়া চুল। ফরাসী সৈন্যবাহিনীর জেনারেলদের তিনি দেহসৌষ্ঠব, আচারআচরণ এবং কঠোরতা অনুযায়ী কয়েকভাগে ভাগ করতেন। বুরবাকিকে তিনি আধুনিক জগতের সবচাইতে বড় যোদ্ধা বলে গণ্য করতেন।

যে সব অফিসাররা একটু বেঁটে বা মোটা ছিলেন, যাঁরা মার্চ করার সময় অল্পেই হাঁফিয়ে উঠতেন, তাঁরা ছিলেন ক্যাপ্টেনের উপহাসের পাত্র। এছাড়াও তিনি কেন যেন মোটেই সহ্য করতে

পারতেন না পলিটেকনিক স্কুল থেকে এসে নতুন ভর্তি হওয়া সৈন্যদের। এদের ছোটখাট কৃশকায় দেহ, চশমা পরা চোখ, আড়ষ্টভাব—সবই ছিল তাঁর ঘৃণার বস্তু। এইসব অক্ষম প্রাণীরা, যারা দুর্বল দেহ নিয়ে কাঁকড়ার মত মার্চ করে, যারা মদ খায় না, অল্প খেয়েই হাঁসফাঁস করে, সুন্দরী মেয়েদের চাইতেও যারা গাণিতিক সমীকরণকে বেশী ভালবাসে—তাদের সৈন্যদলে থাকার সুযোগ দেওয়া হয় কেন এই কথা চিন্তা করলেই তিনি রীতিমত চটে উঠতেন।

ক্যাপ্টেন এপিভঁ নিজের জীবনে কোনদিন কোন মেয়ের কাছে হারেননি। কোন মহিলার সঙ্গে রাতের খাবার খেলে তিনি জানতেন আজ ঐ মহিলার সঙ্গেই এক বিছানায় রাত কাটাতে পারবেন। আর যদি খুবই বিরক্তিকর কোন বাধা এসে দাঁড়ায় তাহলেও পরের দিন তাঁর সাফল্য সুনিশ্চিত। তাঁর পরিচিত লোকজনরা নিজেদের স্ত্রীর সঙ্গে তাঁকে দেখা করতে দিতেন না। যে সব ব্যবসায়ীদের সুন্দরী বৌরা কাউন্টারে বসতেন, তাঁরা খুব ভালভাবেই ক্যাপ্টেনকে চিনতেন, ক্যাপ্টেনকে তারা ভয়ও পেতেন আবার ঘৃণাও করতেন যথেষ্ট। ব্যবসায়ীদের বৌরা ভালভাবেই জানতেন যে তাঁদের স্বামীরা এই ক্যাপ্টেনটিকে অপছন্দ করেন। তবুও ক্যাপ্টেন যখন রাস্তা দিয়ে দৃপ্তভাবে হেঁটে যেতেন তখন কাঁচের জানলার এপাশ থেকে দৃষ্টি বিনিময় হত প্রায়ই। সেই দৃষ্টিতে একই সঙ্গে থাকত আবেদন আর অনুমোদন, প্রগাঢ় আকাঙ্ক্ষা আর প্রতিশ্রুতি। সেই সময় তাঁদের স্বামীরা মুখ ঘুরিয়ে নিতেন অন্যদিকে, তারপর হঠাৎ খুব রূঢ়ভাবে ফিরে তাকাতেন। সেই গর্বিত মানুষটি তখন একইভাবে হাঁটতে হাঁটতে এগিয়ে চলেছেন। ব্যবসায়ী ভদ্রলোকরা কাঁপা কাঁপা হাতে দোকানের মালপত্র ঠিকঠাক করে রাখতেন। কেউ কেউ নিজের মনে গজগজ করতেন ঃ

'হুঁঃ, ভারী এক ফুলবাবু। এই সমস্ত অকর্মার ঢেঁকি, টিনের তলোয়ার হাতে জবর জং জোকারগুলোকে আমরা কবে যে গাণ্ডে-

পিণ্ডে খাওয়ান বন্ধ করব—! এর চাইতে কসাই হব, সে ভি আচ্ছা—কিন্তু এমন এক সৈনিক আমি কোনদিন হতে চাই না। সামনের টেবিলে যদি রক্ত লেগেও থাকে তো তা হবে জন্তুর রক্ত, মানুষের না। এদের চাইতে একটা কসাইও অনেক বেশি ভাল, কেননা তার ছুরি কখনও মানুষের গলা কাটে না। এই লোকগুলো যখন তাদের মানুষ মারার সাজসরঞ্জামগুলো নিয়ে দিব্যি ভড়ং করে রাস্তা দিয়ে হেঁটে যায়, লোকে কি করে এদের সহ্য করে বুঝি না। অস্বীকাব করছি না, এদেরও আমাদের দরকার আছে। কিন্তু তা'বলে এরকম লোকদেখান ঠোঁটে, লাল ব্রীচেস পরে নীল কোট গায়ে ঢুকিয়ে সং-এর মত হেঁটে যাবার কোন দরকার আছে? জল্লাদরা কখনও এরকম করে কি?'

ওদিকে ভদ্রলোকের স্ত্রী হয়তো তাঁর স্বামীর কথা শুনে বিনা বাক্যব্যয়ে কেবলমাত্র কাঁধ ঝাঁকাচ্ছেন। ভদ্রলোকের পক্ষে এরপর রীতিমত চিৎকার শুরু করে দেওয়াই স্বাভাবিকঃ 'যারা এরকম লোকদের হাঁ করে চেরে চেয়ে ছাখে, তারাও একনম্বরের বোকা।'

এত কাণ্ডের পরেও ফরাসী সৈন্যবাহিনীতে ক্যাপ্টেন এপিভেণ্ট-এর যুদ্ধজয়ে বেশ নামডাক ছিল। ১৮৬৮ সালে ক্যাপ্টেনের রেজিমেণ্ট, একশো দুইতম হাসার বাহিনী রুঅঁ নগরী সংরক্ষণ করার জন্য এসে উপস্থিত হল।

খুব শীগগিরই তিনি সারা শহরে পরিচিত হয়ে উঠলেন। প্রতিদিন বিকেল পাঁচটা নাগাদ তিনি বোয়াদিউ ম্যালে আসতেন তাঁর প্রাত্যহিক আবসাঁৎ আর কফির জন্য। কমেদি নামের রেস্তোরাঁটিতে ঢুকে যাবার আগের মুহূর্তে তিনি রোজ একবার ফিরে তাকাতেন আচ্ছাদিত ভ্রমণস্থানটির দিকে। অসংখ্য লোকের মুগ্ধ দৃষ্টি তখন তাঁর ওপর নিবদ্ধ।

রুঅঁ ব্যবসায়ীরাও তখন পায়চারী করতে বেরোতেন। ব্যবসা

সংক্রান্ত আলোচনা করতে করতে তাঁরাও মাঝে মাঝে বলে উঠতেন—'বাঃ, কে হে এই সুপুরুষটি ?'

কিন্তু যখনই তাঁরা ক্যাপ্টেনকে চিনতে পারতেন, সঙ্গে সঙ্গে মত পাল্টে যেত—ওঃহো, ক্যাপ্টেন এপিভঁ। ভদ্রলোক যে অতি বদ এতে কোন সন্দেহ নেই।'

তাঁর সামনাসামনি পড়ে গেলেই মহিলারা কেমন যেন অদ্ভুতভাবে সৌজন্যসূচক মাথা ঝাঁকাতেন। তাঁদের দেখে মনে হত তারা ভয়ানক দুর্বলবোধ করছেন, নয়তো তাঁর সামনে নিজেকে বিবস্ত্রা মনে করছেন। তাঁরা খুব সামান্য মাথা নীচু করতেন, ঠোঁটের ফাঁকে খেলে যেত মোহিনী হাসি। তাঁদের প্রত্যেকেই চাইতেন ক্যাপ্টেনের সামনে নিজেকে মোহময়ী করে তুলতে আর ক্যাপ্টেনের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে। ক্যাপ্টেন কাউকে সঙ্গে নিয়ে রাস্তায় বেরোলে তাঁর সঙ্গীর অবস্থা খুবই শোচনীয় হয়ে উঠত। এক একজন করে মহিলার মুখোমুখি হওয়ামাত্র ক্যাপ্টেনের সঙ্গী মনে মনে গজগজ করতেন—'এই বদ লোকটাই সব সুযোগগুলো পায় !'

শহরে লাইসেন্সপ্রাপ্ত যে কয়জন দেহপসারিণী ছিল তাদের মধ্যে কে আগে ক্যাপ্টেনকে নিতে পারে তার জন্য রীতিমত প্রতিযোগিতা শুরু হয়ে যেত। তারা সবাই ঠিক পাঁচটার সময় চলে আসত বোয়াদিউ ম্যালে। দুইহাতে স্কার্টের দুই প্রান্ত ঈষৎ তুলে ধরে তারা ফুরফুর করে ঘুরে বেড়াত কমেদি নামক রেস্তোরাঁর আশেপাশে।

এক সন্ধ্যায় সে অঞ্চলের নামকরা সুন্দরী আর্মা, কমেদির সামনে গাড়ি থামিয়ে নামল। ধনী শিল্পপতি মসিয়ঁ তঁপলিয়ে পাপোঁর স্ত্রী এই আর্মা। গাড়ি থেকে নেমে আর্মা রাস্তার ওপরের কাঁচের শোকেসে সাজান কিছু এনগ্রেভিং-এর কাজ দেখার ভান করল। তারপর সুকৌশলে রেস্তোরাঁর ভেতরে অফিসারদের টেবিলের

পাশ দিয়ে যেতে যেতে এক বিশেষ দৃষ্টিতে তাকাল ক্যাপ্টেনের দিকে। সে দৃষ্টিতে যে আবেদন ছিল তার অর্থ দিনের আলোর মত পরিষ্কার—ক্যাপ্টেনের যখন ইচ্ছে হবে তখনই আর্মা তার কাছে আসবে।

এই বিশেষ দৃষ্টিতে তাকানোটা কর্ণেল প্রুগের চোখ এড়াল না। লেফটেন্যান্ট কর্ণেলের সঙ্গে বসে সবুজ পানীয় খেতে খেতে তিনি ফিসফিস করে উঠলেনঃ ‘এই লোকটা ভাবিয়ে তুললে দেখছি! যত সুযোগ সব দেখি এরই কাছে আসে। তাজ্জব ব্যাপার !!’

পরের দিন ক্যাপ্টেনকে দেখা গেল আর্মার বাড়ির নীচে। এর-পরে অবশ্য প্রায়ই তাঁকে ঐ জায়গায় দেখা গিয়েছিল। আর্মা তাকে দেখল। তিনি আর্মাকে দেখলেন এবং মৃদু হাসলেন।

সেই সন্ধ্যায়ই তিনি আর্মার প্রেমিক হয়ে গেলেন।

ব্যাপারটা শহরসুদ্ধ প্রত্যেকের নজরে পড়তে বেশি দেরী হল না। এত বেশি অন্তরঙ্গতা সকলের চোখেই খুব প্রকট হয়ে উঠল। আর্মা আর ক্যাপ্টেনকে এই ঘনিষ্ঠতার জন্য বেশ গর্বিত বোধ হতে লাগল। গোটা শহরটাতে তাদের এই প্রণয় কাহিনী নিয়ে যত আলোচনা হত তত আর অন্য কিছু নিয়ে হত না। একমাত্র আর্মার স্বামী ভদ্রলোকটিই তাদের এই অবৈধ সম্পর্কের কথা কিছু জানতে পারলেন না।

ক্যাপ্টেন এপির্ভ আর্মাকে নিয়ে দস্তুরমত গর্বিতবোধ করতেন। সুযোগ পেলেই কথাপ্রসঙ্গে তিনি সবাইকে শুনিয়ে শুনিয়ে আর্মার কথা বলতেনঃ আজ আর্মা আমাকে এই কথা বলেছে; গতকাল ডিনার খেতে খেতে আর্মা সেই কথা বলেছে; আরেকদিন আর্মা অমুক কথা বলেছিল ইত্যাদি।

পুরো একটি বছর রুঅঁর বুকে তাঁরা খুশির বন্যায় ভেসে বেড়ালেন এবং শত্রুপক্ষের হাত থেকে ছিনিয়ে নেওয়া পতাকার মত

সযত্নে মাথার ওপর উড়িয়ে দিলেন তাঁদের এই উচ্ছল প্রেমকে। আত্মসচেতন ক্যাপ্টেন এই ঘটনায় আরো বেশিরকম আত্মসচেতন হয়ে উঠলেন। শহরের প্রতিটি লোকের চোখই তখন তাঁদের চলাফেরার ওপর নিবদ্ধ, শহরের প্রতিটি লোকের আলোচ্য বিষয় তাঁদের এই সম্পর্ক—এই ঘটনায় নিজের সম্বন্ধে ক্যাপ্টেনের ধারণাও দিনদিন অতিরঞ্জিত হয়ে চলল।

এমন সময় যুদ্ধ লাগল। ওপর থেকে নির্দেশ এল ফ্রন্টে ক্যাপ্টেনের রেজিমেণ্টকেই আগে যেতে হবে। চোখের জলে সেদিন সারারাত সিক্ত হয়ে রইল উভয়ের বিদায় সম্ভাষণ।

ঘরের মেঝেয় স্তূপীকৃত হয়ে পড়ে রইল তলোয়ার, লাল ব্রীচেস, টুপি আর জ্যাকেট। কার্পেটের ওপর আরো ভিড় বাড়িয়ে জমে থাকল পরিধেয় আঙরাখা, স্কার্ট, সিল্কের মোজা; সমস্ত ঘরটার চেহারা হয়ে উঠল বিশৃঙ্খল, যেন একটু আগেই এখানে এক যুদ্ধ হয়ে গিয়েছে। আর্মা তার চুল বেঁধে নিতে ভুলে গেল। বন্য আবেগে বারবার ক্যাপ্টেনের গলা জড়িয়ে ধরল। তারপর বাচ্চা মেয়ের মত মাটিতে গড়াগড়ি দিয়ে কাঁদতে লাগল। হাতের কাছে যা জিনিসপত্র পেল তাই ছুঁড়ে ফেলে দিতে লাগল। কখনও কখনও শিশুসুলভ আবেগে চেয়ারের পায়া আঁকড়ে ধরল। ক্যাপ্টেন বিচলিত বোধ করছিলেন খুবই, কিন্তু সান্ত্বনা দেবার কৌশলটি তার কোনদিনই ভাল রপ্ত হয়নি। তিনি বারবার অস্ফুট স্বরে বলতে লাগলেন,—'লক্ষ্মীটি, আর্মা কেঁদ না। তুমি কি বুঝতে পারছ না আমার কিছু করার নেই? এতো ওপর মহলের আদেশ, যেতেই হবে।'

এরপর একসময়ে তিনি নিঃশব্দে তাঁর চোখের কোণে জমে ওঠা একফোঁটা জল মুছে ফেললেন। ভোরবেলায় বিদায়ের পালা। আর্মা নিজের গাড়িতে ক্যাপ্টেনের সঙ্গে কিছুদূর অবধি গেল। বিচ্ছেদের সময় গোটা সৈন্যবাহিনীর সামনে আর্মা ক্যাপ্টেনকে চুম্বন করল।

উপস্থিত সবার কাছে আর্মার এই বিদায় জ্ঞাপন খুব রোম্যান্টিক অথচ শোভন বলে মনে হচ্ছিল। সঙ্গীরা ক্যাপ্টেনের হাতে চাপ দিয়ে বললেন, 'দেখেছ তো প্রেমিক মশাই? এই ছোট্ট মেয়েটির পর্যন্ত হৃদয় বলে একটি পদার্থ আছে।'

তাঁদের চোখে আর্মার এই কার্যকলাপ দেশপ্রেমেরই নামান্তর।

রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ শুরু এবং শেষও হল। ক্যাপ্টেন যুদ্ধ করলেন বীরের মত এবং যুদ্ধ শেষে তিনি পেলেন ক্রশ অফ অনার। যুদ্ধ শেষ হলে আবার তিনি ফিরে এলেন রুঅঁ শহরে।

ফিরেই তিনি আর্মার খোঁজ নিতে শুরু করলেন। কিন্তু কেউই তাঁকে সঠিক কিছু বলতে পারল না। কেউ কেউ বলল আর্মা নাকি এক প্রুশিয়ান মেজরকে বিয়ে করেছে। অন্যেরা বলল আর্মা নাকি ইভেতোতে তার কৃষক বাবা মার কাছে ফিরে গিয়েছে।

মেয়রের অফিসে পর্যন্ত ক্যাপ্টেন তাঁর আর্দালিকে পাঠালেন শহরের মৃত্যু তালিকা দেখতে। সেখানেও আর্মার নাম পাওয়া গেল না।

ক্যাপ্টেন রীতিমত চটে গেলেন। এর জন্য তিনি দায়ী করে বসলেন তাঁর শত্রুপক্ষকে, অর্থাৎ প্রুশিয়ানদের, যারা দখল করেছিল। জনে জনে সবাইকে তিনি বললেন, 'এর পরের যুদ্ধে ঐ ভিখিরির জাত বুঝবে এর ফল কি দাঁড়ায়!'

একদিন সকালে তিনি ভোজনকক্ষে প্রাতরাশপর্ব সমাধা করতে বসেছেন, এমন সময় অপরিচ্ছন্ন বেশধারী এক দারোয়ান এসে তাঁর হাতে একটা চিঠি দিল। ক্যাপ্টেন সেটি খুলে পড়লেন। আর্মার লেখা চিঠিঃ 'প্রিয়তম, আমি ভীষণ ভাবে অসুস্থ হয়ে হাসপাতালে পড়ে আছি। একবার এসে আমায় দেখে যাবেন? তাহলে আমি বড় আনন্দ পাব! ইতি আর্মা।'

চিঠি পড়ে ক্যাপ্টেন ফ্যাকাশে হয়ে গেলেন। নিজের মনে

বিড়বিড় করতে লাগলেন তিনি, 'ইশ! কি জঘন্য ব্যাপার! বেচারা! খাওয়াটা শেষ করে নিই—এখনি যেতে হবে…'

এরপরে আগাগোড়া সময়টাই খাওয়ার টেবিলে বসে ক্যাপ্টেন অন্যান্য অফিসারদের ব্যাপারটা খুলে বললেন। আরও বললেন যে এটা নিশ্চয়ই সেই ইতর প্রুশিয়ানদের কাজ। নিশ্চয়ই ওরা আর্মার সব আসবাবপত্র লুঠ করে নিয়ে গিয়েছে। আর্মা একা কপর্দকশূন্য অবস্থায় চরম বিপদে পড়েছে।

বলতে বলতে ক্যাপ্টেন ভীষণ উত্তেজিত হয়ে উঠলেন। গালাগালি দিতে শুরু করলেন তিনি, 'যত শালা কুত্তার বাচ্চা—দাঁড়া মজা টের পাবি।'

সবাই খুব উদ্বিগ্ন হয়ে ব্যাপারটা শুনল। দ্রুতগতিতে তাঁর কথা শেষ করেই ক্যাপ্টেন উঠে দাঁড়ালেন। পেগ থেকে তুলে নিলেন তাঁর তলোয়ার, বুক ভর্তি দম নিয়ে কোমর সরু করে বেল্টের হুক আটকে নিলেন। ঝটিতি বেরিয়ে গেলেন শহরের হাসপাতালের উদ্দেশে। ক্যাপ্টেন ভাবেননি হাসপাতালে ঢুকতে তাঁকে কোন ঝক্কি পোয়াতে হতে পারে। কিন্তু প্রবেশ পথেই বাধা এল। বাধ্য হয়ে শেষ অবধি তাঁকে কর্ণেলের সঙ্গে দেখা করে হাসপাতালে ডিরেকটরের সঙ্গে যোগাযোগ করতে হল।

ডিরেকটর তাঁকে খুব নিরুৎসাহ ভঙ্গীতে আপ্যায়ন করলেন। তারপরে পাস নিয়ে হাসপাতালে ঢোকার আগেও তাঁকে বেশ কয়েক মিনিট ছোট একটা ঘরে অপেক্ষা করতে হল।

দরজা দিয়ে ঢুকেই এক দুঃখ-দুর্দশার মৃত্যুপুরীতে ঢোকার অভিজ্ঞতা হল ক্যাপ্টেনের। দম আটকে গেল তাঁর। হাসপাতালেরই একজন ছেলে তাঁকে পথ দেখিয়ে নিয়ে গেল। লম্বা করিডোর ধরে ক্যাপ্টেন সন্তর্পণে পা টিপে টিপে হাঁটতে থাকলেন, কোন শব্দ না হয়। সমস্ত জায়গাটা জুড়ে অসুস্থতা আর ওষুধের হাল্কা ভেজা গন্ধ ভাসছিল। কেবলমাত্র কিছু অস্পষ্ট কথাবার্তাই যা হাসপাতালের

নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করছিল। মাঝে মাঝে খোলা দরজা দিয়ে ডরমিটরির ভেতরটা দেখা যাচ্ছিল। সারি সারি বিছানার ওপরে আপাদমস্তক কাপড় দিয়ে ঢাকা রুগীরা শুয়ে আছে। কিছু কিছু রুগী, যারা আরোগ্যের পথে, তাদের কৌচের পায়ের দিকের চেয়ারগুলিতে ধূসর পোশাক এবং সাদা টুপি পরে বসে সেলাই করছিল।

পথপ্রদর্শক ছেলেটি হঠাৎ এরকম একটি করিডোরের সামনে থেমে গেল। ভেতরে একগাদা রুগী। দরজার দিকে একমুহূর্ত তাকাল ছেলেটি। সেখানে বড় বড় হরফে বোর্ডে লেখা ছিল 'সিফিলিস'। ক্যাপ্টেন সামান্য চমকে উঠলেন, সামান্য লজ্জাও পেলেন বলে মনে হল। দরজার কাছেই একজন নার্স একটা ছোট কাঠের টেবিলের ওপর ওষুধ তৈরী করছিল।

সে বলল, 'দাঁড়ান, দেখিয়ে দিচ্ছি। উনত্রিশ নম্বর বেড।'

অফিসারের সামনে দিয়ে হেঁটে গিয়ে একটা বেডের দিকে আঙুল তুলে নার্স দেখাল, 'ঐযে ওখানে।'

হঠাৎ তাকিয়ে এক বাণ্ডিল বিছানার চাদর ছাড়া কিছুই দেখা যাচ্ছিল না। এমনকি রুগীর মাথাও কাপড়ে ঢাকা। চতুর্দিকে ছড়ান ছিটান কৌচের ওপর সারি সারি মলিন মুখের ভীড়। সবাই মহিলা, কেউ অল্পবয়সী, কেউ বয়স্কা—প্রত্যেকেই ইউনিফর্ম পরা এই বিশাল ভদ্রলোকটির অপ্রত্যাশিত আগমনে বিস্মিত হয়ে তাকিয়ে রইল।

ক্যাপ্টেন একহাত তলোয়ারের ওপর রেখে আরেক হাতে টুপি নামিয়ে মৃদুস্বরে ডাকলেন, 'আর্মা!'

সেই কাপড়চোপড়ের স্তূপে হঠাৎ স্পন্দন দেখা দিল। অতি ধীরে আচ্ছাদন সরিয়ে বেরিয়ে এল একটি মুখ। কিন্তু সে মুখ এত পরিবর্তিত, এত কৃশ ও ক্লান্ত যে ক্যাপ্টেনের সন্দেহ হল এ মুখ তিনি আগে কখনো দেখেছেন কিনা।

আবেগে দম বন্ধ হয়ে এল শয্যাগতা মেয়েটির। অতি কষ্টে

বলে উঠল, 'আলবেয়ার! আলবেয়ার! তুমি! ওঃ আমি কি সুখী—কি সুখী আমি!' তার গাল বেয়ে ঝরঝর করে চোখের জল গড়িয়ে পড়ল।

নার্সটি একটি চেয়ার নিয়ে এসে বলল, 'আপনি বরং বসে কথা বলুন।'

ক্যাপ্টেন বসলেন, তারপর এই দুর্দশাগ্রস্ত, মলিন মুখটির দিকে দৃষ্টি ফেরালেন। যে উচ্ছল প্রাণবন্ত রূপসী মেয়েটিকে তিনি রেখে গিয়েছিলেন, তার থেকে এ কত অন্য, কত দূরের। অবশেষে তিনি বললেন, 'তোমার কি হয়েছে?'

আর্মা ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠল। তারপর বলল, 'সে তো ভালভাবেই জান তুমি। দরজার ওপরেই তা লেখা আছে।'

আর্মা চাদরের খুঁটে চোখ ঢাকল।

ক্যাপ্টেন একই সঙ্গে আতঙ্কিত ও লজ্জিত বোধ করলেন, 'আহারে! কি করে এ রোগ পেলে তুমি?'

'সেই জানোয়ার প্রাশিয়ানগুলো···ওঃ!' আর্মা উত্তেজিত হয়ে উঠল। 'জোর করে ধরে নিয়ে গেল আমাকে, তারপর শরীরে ঢেলে দিল এই বিষ।'

ক্যাপ্টেন কোন উত্তর খুঁজে পেলেন না। আর্মার দিকে স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলেন, অন্যমনস্কভাবে হাঁটুর ওপর টুপিটা ঘুরোতে লাগলেন।

অন্যান্য রুগীরা সব তাকিয়ে ছিল তাঁর দিকে। হঠাৎ ক্যাপ্টেন তাঁর চারদিক থেকে, এই করিডোরের যত বাসিন্দা, ঘৃণ্য দুরারোগ্য ব্যাধিতে ক্লিষ্ট মেয়েদের মধ্য থেকে এক দূষিত পচনের গন্ধ পেলেন।

আর্মা ফিশফিশিয়ে উঠল, 'আমি বিশ্বাস করি না যে আমি সেরে উঠব। ডাক্তার বলেন রোগটা খুব জটিল।'

হঠাৎ তার চোখ চলে গেল ক্যাপ্টেনের বুকের সম্মানসূচক ক্রুশটির

দিকে। 'ওঃ! তোমাকে এত সম্মান দিয়েছে ওরা।'—এত দুঃখের মধ্যেও সে আনন্দে চেঁচিয়ে উঠল। 'আমার যে কি ভালই লাগছে! ইশ্, যদি তোমাকে একবার জড়িয়ে ধরতে পারতাম!'

আর্মার ঠোঁট থেকে একটি চুম্বনের কথা চিন্তা করা মাত্র নিজের অজান্তেই ক্যাপ্টেনের শরীরের প্রতি কোষে ভয় আর ঘৃণার একটা ঢেউ বয়ে গেল। হঠাৎ তাঁর ভীষণ ইচ্ছে করতে লাগল সেখান থেকে বেরিয়ে বাইরের মুক্ত বাতাসে গিয়ে দাঁড়াতে। আর যেন এই মহিলাটিকে না দেখতে হয়। কি করে বিদায় জানাবেন তিনি ঠিক বুঝে উঠতে পারছিলেন না। শেষ অবধি অনেক কষ্টে বলে উঠলেন—'তুমি কিন্তু তোমার নিজের প্রতি কোন যত্ন নাও নি।'

'না!' মুহূর্তে আর্মার চোখ জ্বলে উঠল। 'আমার মধ্যে তখন প্রতিশোধের স্পৃহা জেগে উঠেছিল। আর ওদের দেওয়া বিষ আমি আবার ওদেরই ফিরিয়ে দিয়েছি আলবেয়ার! প্রায় প্রত্যেককেই -- অন্ততঃ যে কয়জনকে আমি পেরেছি। রুয়েনে যে কয়জন ছিল তাদের প্রত্যেককে আমি এই বিষ দিয়েছি; নিজের সম্বন্ধে কিছুই ভাবিনি বলতে গেলে।'

চাপা গলায় ঈষৎ আনন্দের সঙ্গে ক্যাপ্টেন বললেন, 'এটা তুমি খুব একটা খারাপ করনি।'

আর্মা উত্তেজিত হয়ে উঠল। তার গাল দুটো লাল হয়ে উঠল। 'নিশ্চয়ই! আমার জন্য বেশ কিছু জানোয়ার মরবে। আমি তোমায় বলে দিচ্ছি, আলবেয়ার, প্রতিশোধ আমি নিয়েছি।'

'বেশ তো!' খানিকটা অপ্রতিভভাবে উঠে দাঁড়ালেন ক্যাপ্টেন। বললেন, 'আচ্ছা, এবার আমি উঠি। কেননা কর্ণেলের সঙ্গে আবার দেখা করার কথা আছে।'

আর্মা আবেগরুদ্ধ কণ্ঠে, অভিমানে প্রায় চেঁচিয়ে উঠল, 'এখনই! এখনই চলে যাবে! এই মাত্র তো এলে!'

কিন্তু ক্যাপ্টেনের তখন না বেরলেই নয়। তিনি বললেন, কি

করি বলো! আমার যে কর্ণেলের সঙ্গে দেখা করাটা ভীষণ জরুরী!'

আর্মা জিজ্ঞেস করল, 'কর্ণেল মানে, সেই আগের কর্ণেল প্রাণই আছেন এখনো?'

'হ্যাঁ সেই কর্ণেল প্রাণই! যুদ্ধে দুবার যখম হয়েছেন।'

'আর তোমার কমরেডরা? তাদের কেউ মারা যায়নি?'

'হ্যাঁ। সে-তাম, সাভোগনাঁ, পোলি, সাপ্রিভাল, রোবের, দ্যকুরসঁ, পাসাফা, সাঁতাল, কারাভান আর পোয়াভরাঁ মারা গিয়েছে। সাহেলের একটা হাত গিয়েছে। পাকেট হারিয়েছে তার ডান চোখটি।'

মন দিয়ে সবটা শুনল আর্মা, বেশ উৎসাহভরেই। তারপর হঠাৎ যেন জোর করেই বলল, 'চলে যাবার আগে আমাকে একবার চুমু খাবে? এখানে এখন কোন নার্স নেই।'

অনিচ্ছা, ঘৃণা তাঁর ঠোটে, এসে ভিড় করলেও ক্যাপ্টেন ঠোট ছোঁয়ালেন আর্মার পাণ্ডুর কপালে। দুহাত দিয়ে আবেগভরে আর্মা ক্যাপ্টেনকে জড়িয়ে ধরল, তাঁর নীল জ্যাকেটে সে এঁকেদিল অসংখ্য চুম্বনের দাগ। তারপর ব্যাকুলভাবে জিজ্ঞাসা করল, 'আবার আসবে তো তুমি? কথা দাও আবার আসবে? আসতে তোমাকে হবেই।'

'কথা দিচ্ছি আসব।'

'কবে? বৃহস্পতিবার?'

'হ্যাঁ, বৃহস্পতিবার।'

'বৃহস্পতিবার দুটোর সময়?'

'হ্যাঁ, বৃহস্পতিবার দুটোর সময়।'

'কথা দিচ্ছতো?'

'কথা দিচ্ছি।'

'বিদায়, প্রিয়তম।'

'বিদায়।'

ডরমিটরির একরাশ স্থিরদৃষ্টির ভিড় ঠেলে হতভম্ব অবস্থায় ক্যাপ্টেন বেরিয়ে গেলেন। বেরনোর সময় তাঁর দীর্ঘাকায় দেহ ঈষৎ ঝুঁকে রইল। রাস্তায় বেরিয়ে এসে একবার বুক ভরে দম নিলেন তিনি।

সেই সন্ধ্যায় ক্যাপ্টেনের সঙ্গীরা জিজ্ঞাসা করলেন, 'আর্মা কেমন আছে ?'

'ফুসফুসের গণ্ডগোল।' ক্যাপ্টেন রুদ্ধ কণ্ঠে উত্তর দিলেন। 'খুবই অসুস্থ হয়ে পড়েছে।'

ক্যাপ্টেনের কথাবার্তার ধরনে এক লেফটেন্যাণ্টের সন্দেহ হল। তিনি হেডকোয়ার্টার্সে একবার ঢুঁ মেরে এলেন। পরদিনই সব তথ্য ফাঁস হয়ে গেল। ডাইনিং হলে ঢোকার সঙ্গে সঙ্গে ক্যাপ্টেনকে অভ্যর্থনা করার জন্য চারদিক থেকে হাসি ঠাট্টার ঝড় উঠল। এতদিনে তারা ক্যাপ্টেনের ওপর প্রতিশোধ নেবার মতন একটা খবর খুঁজে পেয়েছেন।

আরো জানা গেল, বিদ্বেষবশতঃ আর্মা নাকি এক প্রুশিয়ান ষ্টাফ মেজরকে বিবাহ করেছে, ব্লু হাসারদের কর্ণেলের সঙ্গে আর আরো অনেকের সঙ্গেই নাকি সে শহরের ওপর দিয়ে যখন তখন ঘোড়ায় চড়ে চলাফেরা করেছে। রুয়েনে আর কেউ তাকে আর্মা বলে ডাকে না ; ডাকে 'প্রুশিয়ানদের বৌ' বলে।

একটানা আটদিন ধরে ক্যাপ্টেনকে আরো অনেক গায়ে জ্বালা ধরানো টিটকারি সহ্য করতে হল। কখনো ডাকে, কখনো অন্য কারুর মারফত প্রায়ই তাঁর কাছে উড়ো চিঠি আসতে লাগল। তাতে অতীতের কচকচানি, ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে সতর্কবাণী, রোগবিশেষজ্ঞদের বিবৃতি ইত্যাদি অনেক কিছুই আসত।

ক্যাপ্টেন শীগগিরই ধৈর্য হারিয়ে ফেললেন। বারোদিন পরে আর্মার কাছ থেকে একটা চিঠি এল। রাগের চোটে ক্যাপ্টেন চিঠি ছিঁড়ে ফেললেন। কোন উত্তর দিলেন না।

একসপ্তাহ পরে আবার চিঠি এল আর্মার। সে খুব অসুস্থ, ক্যাপ্টেন যেন তাকে একবার শেষ বিদায় জানিয়ে আসেন।

এবারও ক্যাপ্টেন কোন উত্তর দিলেন না।

কয়েকদিন পর আবার একটি চিঠি এল। এটি আর্মার কাছ থেকে নয়, হাসপাতালের যাজক লিখেছেন ঃ

'আর্মা পাভোলিন নামের মেয়েটি মৃত্যুশয্যায়, সে একবার অন্ততঃ আপনার দর্শনপ্রার্থী।'

যাজকের কথা অমান্য করার সাহস ক্যাপ্টেনের হল না। কিন্তু হাসপাতালে ঢোকার সময় তাঁর সমস্ত শরীর মন তোলপাড় করতে লাগল অন্ধ রাগে, অপমানে, আহত সম্মানে।

আর্মাকে দেখে মনে হল না আগের চাইতে তার খুব বেশি একটা পরিবর্তন হয়েছে। ক্যাপ্টেনের মনে সন্দেহ হল আর্মা বাজে কথা বলেনিতো ?

—'আমার কাছ থেকে আর কি চাও তুমি ?' ক্যাপ্টেনের প্রশ্নে উষ্মা প্রকাশ পেল।

—'আমি বিদায় জানাতে চাই।' আর্মা ম্লান চোখ মেলে উত্তর দিল।—'মনে হচ্ছে আমার সময় হয়ে এসেছে।'

ক্যাপ্টেন কথাটা বিশ্বাস করলেন না। বললেন, 'শোন, তুমি আমাকে গোটা রেজিমেন্টের কাছে হাস্যাস্পদ করে তুলেছ। অনেক হয়েছে, আর নয়। আমার এ ব্যাপারে আর এগোবার বিন্দুমাত্র ইচ্ছে নেই।'

'কিন্তু আমি কি করেছি ?'—আর্মার চোখে বিস্ময়, অভিমান।

সঙ্গে সঙ্গে ক্যাপ্টেনের মাথায় কোন জবাব এল না। তিনি বিরক্ত বোধ করলেন। 'ছাখ, এখানে ফিরে এসে একমাত্র তোমার জন্যই সবার কাছ থেকে আমার টিটকিরি শুনতে হচ্ছে। এটা কি কিছুই না ?'

একদৃষ্টিতে ক্যাপ্টেনের দিকে তাকিয়ে ছিল আর্মা। চাপা রাগে ঝলসে উঠল তার স্তিমিত চোখ।

সে বলল, 'আমি কি করতে পারি? হয়তো আমি তোমার সঙ্গে ঠিক ভদ্র ভাবে আচরণ করছি না। কিন্তু সেটা কি তোমার থেকে আমি কিছু পাওয়ার আশা করেছি বলে? আমার স্বামীর সঙ্গে বাকী জীবনটা স্বচ্ছন্দে আমি কাটিয়ে দিতে পারতাম। এখানে এভাবে আসার কথা কল্পনাও করা যেত না তখন। কিন্তু সবই হয়েছে কেবল তোমারই জন্য। আর কেউ কিছু বললেও, তুমি অন্ততঃ কোন কটূক্তি করতে পার না।'

'আমি তা করিওনি।'—পরিষ্কার গলায় জবাব দিলেন ক্যাপ্টেন, 'কিন্তু এখানে এভাবে আর আমি আসতে পারব না। প্রুশিয়ানদের সঙ্গে তুমি যা করেছ তা এই শহরের কলঙ্ক।'

আর্মা উঠে বসাতে বিছানাটা সামান্য দুলে উঠল। সে বলল, 'প্রুশিয়ানদের সঙ্গে! আমি! কিন্তু তোমাকে কি আমি বলিনি যে তারা আমাকে জোর করে ধরে নিয়ে গিয়েছিল আর আমি নিজের কথা মোটেও চিন্তা করিনি! যা করেছি একমাত্র তাদের শরীরে তাদেরই দেওয়া বিষ ফিরিয়ে দেব বলে! তখন চেষ্টা করলে নিজেকে সারিয়ে তোলা এমন কিছু কঠিন হত না। কিন্তু আমি তাদের মারতে চেয়েছিলাম। আমি তাদের মেরেছি! কি হল? জবাব দাও।'

ক্যাপ্টেন একইভাবে দাঁড়িয়ে রইলেন। বললেন, 'সে যাইহোক না কেন, এটা একটা কলঙ্কের ব্যাপার তো বটেই!'

আর্মার মনে হল তার গলা আটকে আসছে। কোনরকমে সে উত্তর দিল, 'কিন্তু তাদের মারতে চাওয়াটা কি করে একটা কলঙ্কের ব্যাপার হয় শুনি? যখন জঁ দ্যক্ স্ট্রীটে আমার বাড়িতে আসতে তখন তো এরকম কথা তুমি মোটেই বলতে না। এখন বলছো—কী লজ্জা, কী লজ্জা! শুনে রাখো, তুমি তোমার ক্রশ অফ অনার

নিয়েও আমার মতো এতটা করতে পারনি ! তোমার চাইতে অনেক বেশি সম্মান আমার প্রাপ্য। বুঝেছ ? অনেক বেশি সম্মান, কেননা তোমার চাইতে আমি বেশি প্রুশিয়ান মারতে পেরেছি।'

বিমূঢ় হয়ে দাঁড়িয়ে থাকলেন ক্যাপ্টেন। রাগে, ঘেন্নায় কাঁপতে থাকলেন তিনি। তাঁর জিভে কথা আটকে গেল। কোনরকমে তিনি বললেন, 'চুপ কর···তোমার অবশ্যই···আস্তে আস্তে···ঐসব জিনিস··· ছি ছি··· আমি তো কোনমতেই···একজনকে শরীর স্পর্শ করতে দেওয়া···'

কিন্তু আর্মার কানে কোন কথা ঢুকছিল না। সে তখন একমনে উত্তেজিতভাবে বলে চলেছে, 'প্রুশিয়ানদের কি এমন ক্ষতিটা তোমরা করেছ ? তোমরা যদি রুয়েনে তাদের ঢ্‌কতে না দিতে তাহলে কি এমনটা হত ? জবাব দাও। তোমাকেই দাঁড়িয়ে শুনতে হবে। তোমাদের সকলের চাইতে আমি ওদের অনেক বেশি ক্ষতি করেছি। হ্যাঁ, ঠিক তাই। অথচ আমি এদিকে মারা যাচ্ছি আর তোমরা তখন নাচ গান ফুর্তি করছ, হাস্কা মেয়েদের মন ভুলাতে ব্যস্ত হয়ে পড়ছ।'

প্রত্যেকটা বিছানা থেকেই রুগীরা মাথা তুলে দেখছিল। সবার উৎসুক চোখ তখন ইউনিফর্ম পরা ক্যাপ্টেনের ওপর। ক্যাপ্টেন কোনরকমে আবার বলে উঠলেন, 'তুমি একটু শান্ত হও, চুপ কর।'

কিন্তু আর্মা সেদিন চুপ করার জন্য তৈরি ছিল না। সে আরো জোরে জোরে বলতে লাগল, 'তুমি আসলে এক ফন্দীবাজ লোক, আমি এতদিনে বুঝতে পেরেছি। তবুও বলে যাচ্ছি—আমি ঐ প্রুশিয়ানদের অনেক বেশি ক্ষতি করেছি। তোমার গোটা রেজিমেণ্টের চাইতেও অনেক বেশি প্রুশিয়ান আমি মেরেছি। বুঝতে পেরেছ ভীরু কোথাকার !'

ক্যাপ্টেন বিদায় নিলেন। একরকম পালিয়েই গেলেন বলা

যায়। চতুর্দিকের বিক্ষিপ্ত বিছানার উত্তেজিত সিফিলিস রুগীদের পাশ কাটিয়ে বড় বড় পদক্ষেপে বেরিয়ে গেলেন তিনি। তার পেছনে তখনও আর্মার উত্তেজিত রুদ্ধশ্বাস চিৎকার ভেসে আসছে—'হ্যাঁ, হ্যাঁ, তোমাদের চাইতেও অনেক অনেক বেশি প্রাশিয়ানকে আমি মারতে পেরেছি···অনেক···অনেক বেশি···'

এক একবারে চারটে করে সিঁড়ি টপকে নেমে এলেন ক্যাপ্টেন। নিজের ঘরে এসে সশব্দে দরজা বন্ধ করে দেওয়ার পরেও বহুক্ষণ একটানা আর্মার গলা ভেসে আসতে থাকল।

পরদিন খবর এল, আর্মা মারা গিয়েছে।

অনুবাদ | সর্বজিৎ সেন

পরিচয়

ডরথি হিউয়েট

গাড়ির হেড্‌লাইটের জোর আলোয় চোখে পড়ল সাদাটে চুলওয়ালা ছেলেটাকে। রাস্তার ওপর দুটো বাক্স নামিয়ে রেখে চলন্ত গাড়িগুলোকে হাত তুলে থামাবার আপ্রাণ চেষ্টা করছে। যদি কেউ খানিকটা এগিয়ে দেয়।

ব্রিসবেনের শহরতলিতে এরকম ভবঘুরে প্রায়ই দেখা যায়। বিশেষ কোথাও চলেছে অথবা যে দিকে চোখ যায় যাচ্ছে, চাক্‌রি খুঁজছে, শহরের প্রধান সড়কগুলো ধরে উদ্দেশ্যহীন ভাবে এরা ঘুরে বেড়ায় নয়তো ইপ্সউইচের রাস্তা ধরে সোজা এগিয়ে যায় কারখানার ধোঁয়ায় ছাওয়া সিড্‌নীতে। সিডনী শহর যৌবনের পীঠস্থান।

গভীর রাতে, রাস্তায় দুটো বাক্স নিয়ে গাড়ি থামানোর জন্য চেষ্টা করতে করতে যে কেউ বিব্রত বোধ করতে পারে। এ ছেলেটির দাঁড়ানোর মধ্যে সাধারণ ভবঘুরের থেকে কিছুটা স্বাতন্ত্র্য লক্ষ্য করলাম। বিশেষ কোন এক জায়গায় পৌঁছানোর তাগিদ রয়েছে।

হতাশ হয়ে প্রায় হাল ছেড়েই দাঁড়িয়ে আছে। তবু তার দাঁড়ানোর মধ্যে কি যেন একটা রয়েছে।

একজনের পক্ষে এরকম তুটো বাক্স অতিরিক্ত বোঝা। ছেলেটির পিছনে, সাদা পোশাক পরা আর একটা শরীর অস্পষ্ট দেখা যাচ্ছে। একটি মেয়ে! রাস্তার ধারে অন্ধকারে মিশে চলন্ত গাড়ির আলো থেকে নিজেকে বাঁচিয়ে, সে দাঁড়িয়ে।

জিওফ্ বলল—"দাঁড়াবো নাকি?"

মাথা নাড়লাম। ষ্টেশন ওয়াগানের পিছনটা খালি, বাচ্চারাও বাড়িতে। না থামাটা অন্যায় হবে।

বেশ খানিকটা এগিয়ে গিয়ে গাড়িটা থামলো। কয়েক সেকেণ্ডের মধ্যেই ছুটন্ত পায়ের শব্দ পেলাম।

"তুঃখিত"—বাক্সের ভারে হাঁপাতে হাঁপাতে ছেলেটি বললে—"আমাদের জন্যই যে থেমেছেন বুঝতে পারিনি। ধন্যবাদ, অজস্র ধন্যবাদ।"

এতক্ষণে দেখতে পেলাম মেয়েটিকে। এবার বুঝতে পারলাম অন্ধকারে কেন তার মুখ দেখতে পাইনি। অথচ ছেলেটিকে ঠিকই দেখেছিলাম। ছেলেটির হতাশ চেহারা, হালছাড়া ভাব আর ছায়ায় মিশে থাকা শরীরটা—সব ব্যাপারগুলোই এবার পরিষ্কার হয়ে গেল।

মেয়েটি আদিবাসী—বোধহয় পুরো, মিশ্র নয়। সেই রকম ছড়ানো, চ্যাপ্টা ধাঁচের মিষ্টি মুখ আর তেমনি মিষ্টি হাসি। মুখে সিগারেট।

'আপনাদের তুলনা নেই। অসংখ্য ধন্যবাদ।' গাড়ির দরজা দিয়ে ভিতরে ঢুকতে ঢুকতে মেয়েটি কেতাতুরস্ত গৃহরক্ষিকার মত, আন্তরিক ধন্যবাদ জানালে।

সিড্‌নীবাসী শ্রমিকের স্বরে ছেলেটি বলল—'বাক্সগুলো ভেতর দিকটায় রাখব কি?'

ছেলেটি দেখলাম মেয়েটিকে গাড়িতে উঠতে সাহায্য করল। তুজনেই আরাম করে পিঠে ঠেস দিয়ে পিছনের আসনে বসল।

ছেলেটার হাতে চাপ দিয়ে মেয়েটা তার কৃতজ্ঞতা জানাল। ওর গায়ের উষ্ণ, মিষ্টি সুগন্ধে গাড়ির ভিতরটা ভরে গেল। জিওফ্ গাড়ি ছেড়ে দিল। আমরা এগিয়ে চললাম।

জিওফ্ বলল, 'কোথায় যাবে তোমরা?'

ছেলেটি জানাল, 'আমরা গামডেলের স্ট্রবেরী বাগানের শ্রমিক। ব্রিশিতে সাপ্তাহিক ছুটি কাটিয়ে ফিরছি। রাস্তায় ঘণ্টার পর ঘণ্টা দাঁড়িয়ে রয়েছি। একটাও বাস নেই। কোন গাড়িই আমাদের জন্য থামেনি। তাই ওকে অন্ধকারে সরে দাঁড়াতে বলেছিলাম।'

ছেলেটি ক্লান্ত স্বরে সত্যি কথাগুলোই বলল। স্বজাতির বর্ণবিদ্বেষী মনোভাবের কথা সে ভাল ভাবেই জানে। কিন্তু সেই বাধা সে ভেঙেছে। তাই ফেরার পথও তার রুদ্ধ।

সে আবার বলল, 'বাক্সগুলো নিয়ে বেশী দূর হেটে যাওয়া সম্ভব নয়।'

ছেলেটি নিশ্চয় স্বপ্ন দেখছিল। নিজেকেই দেখছিল···সাদা চামড়ার এক একুশ বছরের তরুণকে, যার কোন বোঝা নেই, নেই কোন সামাজিক বাধা, মুক্ত—একেবারেই মুক্ত। হঠাৎ যেন স্বার্থপর চিন্তাগুলো তাকে ধাক্কা মেরে জাগিয়ে দিল—গভীর আবেগে সে তার সঙ্গিনীর হাত আঁকড়ে ধরল। সে যেন এই অবচেতন মনের ক্ষণিক দুর্বলতার জন্য ক্ষমাপ্রার্থী।

জিওফ্ প্রশ্ন করল, 'বাড়ি কোথায় তোমাদের?'

—নিউটাউনে।

তাই হবে। নিউটাউনের ধুলোর গন্ধ, ষ্টেশনের ইলেকট্রিক ট্রেনের যাতায়াত, আঁকা বাঁকা গলি আর ভিড়ের দুর্গন্ধ—তার সারা শরীরে জড়িয়ে আছে। শীর্ণ তরুণ মুখে অকাল বার্ধক্যের ছাপ। চেহারাটা রোগা হলেও শরীরটা শক্ত আর গলার স্বরে সেই চোখ ধাঁধানো শহুরে ভাব, সব মিলিয়ে নিউটাউনেরই আদর্শ নমুনা।

—'আমার বৌ কিন্তু পশ্চিমের।'

জিওফ্ হাসলো। 'আমার বৌও তাই। ওখানকার হালচালই আলাদা।'

মেয়েটা সিটের পেছন দিয়ে হাত বাড়িয়ে আমাকে জিজ্ঞাসা করলে, 'তোমার দেশ কোথায়? পার্থে না কোন্ গ্রামে?'

'উইকেপিনের কাছে এক খামারে আমার ছেলেবেলাটা কেটেছে।' উইকেপিনের দিনগুলোর কথা আমার মনে পড়ে গেল। কৃষ্ণবর্ণ আদিবাসীদের ছবি। 'পিঠে বা কোমরে বাচ্চাগুলো শক্ত করে বাঁধা। শহরের শেষ প্রান্তে আইসক্রীম্ আর ঠাণ্ডা পানীয়ের দোকানের বাইরে, চাপা কর্কশ গলায় তারা কথা বলতো। দোকানের সামনের ছায়ার সঙ্গে মিলিয়ে গিয়ে তারা দাঁড়াতো। সাদা চামড়ারা তাদের পাশ কাটিয়ে যেত, যেন তারা মানুষই নয়। কুকুরের সমান ব্যবহারও তারা পেত না। কুকুরের গায়েও হাত বোলান যায়। কথা বলা যায়, তাদের সহ্য করা যায়। কারণ কুকুর উপকারী জন্তু। কিন্তু ঐ হতভাগাদের বরাতে সেইটুকুও জুটতো না।

পিছনের সীটের ওই কালো মেয়েটির মুখের হাসি দেখে প্রাণটা দেশের জন্য ছট্‌ফট্ করে উঠলো। ও যে পশ্চিম অষ্ট্রেলিয়া থেকে এসেছে তাতে কোন সন্দেহ নেই। রংটা উইকেপিনের আদি-বাসীনীদের মতই। চ্যাপ্টা ধাঁচের মুখখানায় বন্ধুত্বের পরিচয় স্পষ্ট। আমার শৈশবের সেই অতি পরিচিত ওকগাছগুলো আর নোনা জলের লেকের মতই মেয়েটিও যেন সেই দিনগুলোরই টুক্‌রো। ছবির মতো মনে পড়ে সেই গরমের দিনে আইস্‌ক্রীমের দোকানের বৈদ্যুতিক পাখার হাল্‌কা বাতাস। মাছি তাড়ানোর কাগজের ঝাপ্‌টানি আর ইয়েলারিং লেকের জলের গন্ধ।

—কি আশ্চর্য, তাই না? আমি বানবেরিতে থাকতাম। তুমি চেনো বানবেরি? নারেজিনের ধারে কাছে বহুদিন কাজ করেছি।

ওখানের ওয়াল্টনদের জানো কি, আর মিসেস্ বাট্‌লার! ওরি বাট্‌লার, তুমি চেনো ওঁদের ?'

আমি ওঁদের কাউকেই চিনি না। এখন আর কাউকেই মনে নেই। সব হারিয়ে গেছে। সময়ের দুরন্ত স্রোত সবকিছু ভাসিয়ে নিয়ে গেছে। ভেসে গেছে কত শহর, চাকরি, কত শত মানুষ আর শিশু—মনেই পড়ে না যে কোনদিন আমি গ্রামের মেয়ে ছিলাম।

এই মুহূর্তে মেয়েটির প্রশস্ত, বিশ্বাসী মুখ দেখে মনে হল যেন অনেকদিন পর বাড়ি ফেরার আনন্দ পেলাম ; কিন্তু সত্যি সত্যি ঘরে ফেরা আর কি সম্ভব।

ওর উষ্ণ হাত আমার হাতের উপর। 'কী অদ্ভুত না। তুমি আর আমি দুজনেই ঘর ছাড়া। হাতড়ে বেড়ানোদের দলে।' মেয়েটি হাসল। হাসির মধ্যে দেশে ফেরার আকুলতা থাকলেও দার্শনিকের মতো সব অবস্থাকে মানিয়ে চলার প্রতিজ্ঞাও রয়েছে।

বললাম, 'ঠিক তাই—যদিও এদের কাছে সেটা শুধু বালিয়াড়ি, অপরাধ, দুঃখ আর চক্ষুপীড়া। দেশের জন্য তোমার মন খুব চঞ্চল তাই না ? ব্রিসবেনে চেনাশোনা কেউ নেই ?'

—'সত্যিই এখানে আমার কেউই নেই আর চিনিও না কাউকে। শুধু নর্মিই আছে।' ও তার সঙ্গীকে এবার দুহাতে আকড়ে ধরল। আর ছেলেটির মুখখানা নির্মল আনন্দে হাসিতে উদ্ভাসিত হয়ে উঠল।

"আমার নাম নর্মি—আর এই আমার বৌ বেটি—" কথা বলার ভঙ্গীতেই বৌ-এর জন্য তার গর্ব প্রকাশ পেল।

—'আমি জিওফ্—আর এই আমার বৌ ডরোথি।' আমরা পরস্পর করমর্দন করে পরিচয়ের পালা সারলাম।

বেটি বলল, "তোমরা এখানে ছুটি কাটাতে এসেছো না এখানেই থাকো ?"

—'ছুটি!' জিওফ্ হাসল, 'আমরা এখানেই থাকি। আমার বাড়ি কুইনস্‌ল্যাণ্ডের উত্তরাঞ্চলে। এখন কাজের অবস্থা কি রকম!'

—'খুব খারাপ নয়।' যৌবনের অদম্য আশা আর উদ্দীপনায় নর্মির মুখটা উদ্ভাসিত। গতবার আখ কাটার সময়ে "সমুদ্রের ধারে অনেকদূর গিয়েছি। উত্তরের দিকেও বাদ নেই। তুমি কি কর?"

আমি বললাম, 'এখানে তো কাজ পাওয়া খুব মুস্কিল। জিওফ্ বন্দরের কাজ ভালোবাসে। কিন্তু এখানে জাহাজ প্রায় আসেই না। ফ্রিম্যানটেল্-এর মত ব্রিস্‌বেন তো অত বড় বন্দর নয়।'

আশাবাদী নর্মি বললে, 'আমার মতে সবকিছুই নির্ভর করে নিজেদের উপর। কিছু করবার ইচ্ছে যদি সত্যিই থাকে তবে তুমি তা নিশ্চয়-ই করতে পারবে।'

এই পৃথিবী, সমাজ-সংসার সবের উপরই ওর যে গভীর আস্থা, তা বুঝলাম। তিক্ত মনে ভাবলাম—'কি সহজ ওর কাছে সবকিছু। কাঠের কুঁড়ে থেকে রাজপ্রাসাদ বা হোয়াইট হাউস—সবই সমান। এ যেন কোন আমেরিকাবাসী-অষ্ট্রেলিয়ানের কল্পনা। ছেঁড়া কাঁথায় শুয়ে লাখ টাকার স্বপ্ন!'

নর্মির বিশ্বাসপূর্ণ দৃঢ় কণ্ঠ শুনলাম, "তুমি নিজেই নিজের স্রষ্টা। সাধারণ যোদ্ধাও অনেক বড় হতে পারে। একজন কাঠওয়ালাকে জানি যার কিছুই ছিল না। শুধু নিজের পরিশ্রমে, তিল তিল করে পয়সা জমিয়ে একটা গ্যারেজের মালিক হতে পেরেছে।"

জিওফ্ হাসলো। চল্লিশোর্ধ পোড় খাওয়া অভিজ্ঞ লোকের হাসি।

'শুধু একটুকুতেই হয় না। আরো বেশী কিছুর প্রয়োজন। খেটে খাওয়া শ্রমিকের পক্ষে অবস্থা সব সময়েই প্রতিকূল। গতানুগতিক অবস্থার পরিবর্তন করার একমাত্র পথ ভাগ্যকে জয় করা।'

বেটি বললে, 'তার মানে সৌভাগ্য অর্জন করা, তাই না?'

নর্মি তার স্বপ্নকে বাস্তবের চাপে থেঁতলে দিতে রাজি নয়—

'উঁই পরিশ্রম করলেই ফল পাওয়া যায়। বেশী কিছু চাই না—শুধু একটু আরামে থাকবো। কোন ভাবনা চিন্তা থাকবে না। এতোটুকুই প্রত্যাশা। অন্যকে, যাদের অবস্থা আমার থেকেও খারাপ তাদের সাহায্য করার মত ক্ষমতা ও সম্পদ যেন আমার থাকে।' জীর্ণ দুটো বাক্স আর আদিবাসিনী সঙ্গিনী সমেত নর্মিকে ছিন্ন বেশ পরোপকারী ভিখারীর মত লাগলো।

জিওফ্ বললে—"আমি লক্ষ্য করেছি, তোমার যদি অনেক থাকে তাহলে সেটা অন্যের ঘাড় ভেঙ্গেই রোজগার করা। ঐশ্বর্য, সম্পদ এসবই এক বিশেষ শ্রেণীর পক্ষে সম্ভব।"

নর্মির গলায় চিন্তার ছোঁয়া লাগল, 'তা ঠিক। রাস্তা থেকে অভিজাতরা তোমাকে ওঠাবে না। খেটে খাওয়া সমব্যথীই এগিয়ে আসবে তোমার সাহায্যে। যাক্‌গে, আমরা ভালোই আছি। ও বড়ো ভালো।' নর্মি বেটিকে দু'হাতে জড়িয়ে ধরলো। বেটিও নর্মির কাঁধে তার মাথাটা এলিয়ে দিলে—'বেটি সত্যিই আমার বন্ধু আর উপযুক্ত জীবনসঙ্গিনী।'

অবাক হয়ে ভাবতে লাগলাম জীবনের অদ্ভুত গতির কথা। কোন্ অপ্রত্যাশিত শক্তি এক সূত্রে বেঁধে দিয়েছে বান্‌বেরির আদিবাসিনী বেটি আর নিউটাউনের শ্বেতাঙ্গ যুবক নর্মিকে? বাহ্যতঃ ওদের যে বৈষম্যই থাক, সরলতা, ভালোবাসা আর নির্মল সুন্দর অন্তঃকরণ দুজনের মিলনকে সম্ভব করেছে। ওরা দুজনে এখন অবিচ্ছিন্ন সত্বা। বেটি, মায়ের মতোই আগলে রেখেছে ওকে। ওর অভিজ্ঞতা, বুদ্ধি, বাস্তবকে মানিয়ে নেবার ক্ষমতা নর্মির থেকে অনেক বেশী। আর তাই নিশ্চিন্তে এই আদিবাসিনীর কাছে আত্মসমর্পণ করে নর্মি যেন বেঁচেছে।

নর্মি জোর দিয়ে বললে, "আমরা খুব ভালো আছি।"

জিওফ্ বললো, 'স্ট্রবেরী তোলার কাজ খুব খাটুনির। কিছুদিন করেছি। সব কাজই একটু আধটু করে দেখেছি।'

নর্মি আবার বললো, 'আমরা একরকম ভালই আছি। একটা তাঁবু আছে। বৃষ্টির সময় চারপাশে গর্ত খুঁড়ে রাখি, তাই তাঁবুতে জল ঢুকতে পারে না। আমরা শুকনোই থাকি। ও আমাকে খুব সাহায্য করে। ওরা আবার দুজনে হাত ধরে বসলো।

মেয়েটি হেসে উঠল, 'বড্ড শুকনো থাকি, তাই না সোনা?' বলতে বলতেই বেটির কাশি শুরু হল। শুকনো দমচাপা কাশিতে শরীরটা দুমড়ে গেল।—'বড় ঠাণ্ডা লেগেছে।'

ছেলেটির মুখে দুঃশ্চিন্তার ছায়া ঘনায়। 'ওকে কত হাসপাতালে নিয়ে যেতে চেয়েছিলাম কিন্তু কিছুতেই গেল না। সবসময় আমার সঙ্গে সঙ্গে থাকতে চায়। তাঁবুটা ভিজে গিয়েছিল। অসহ্য ঠাণ্ডা, তার উপর ওর বাচ্চা হবে। কাঠকুটো দিয়ে আগুন জ্বালিয়ে নিজেদের গরম রেখেছিলাম। বেটির জন্যে কিছু করতে না পারার অসহায়তা-জনিত রাগে নর্মি তার হাতটা সরিয়ে নিল।

"চিন্তার কিছুই নেই। অষুধের দোকানের লোকটার কাছ থেকে কিছু কাশির অষুধ নিয়ে নেবো। সামান্য একটু ঠাণ্ডা লেগেছে। জানেন, ওরও বেশ ঠাণ্ডা লেগেছিল।"

—'তা ঠিক। কয়েক সপ্তা আগে অসুস্থতার জন্যে ভালো করে কাজ করতে পারিনি। ওই আমার সব দেখাশোনা করেছে। অসুখ আমাদের কাছে বিলাসিতা।'

জিওফ্ জানতে চাইল, 'কবে এ কাজ শেষ হবে?'

—'আর কয়েক সপ্তাহ আছে। এরপর ইচ্ছে আছে ব্রিসিতে কোন কারখানায় কাজের চেষ্টা করবো। একটা ভালো ঘরও খুঁজতে হবে যেখানে বাচ্চাটার জন্যে ঠিক মতো যত্ন নেওয়া যায়। ছোট বাচ্চার পক্ষে তাঁবু ভালো নয়।'

'কারখানার কাজ পাওয়া বড় শক্ত।' অনিশ্চিত ভাবে জিওফ্ মন্তব্য করল।

আমাদের দুজনের মনের পটে একটাই ছবি ভেসে উঠছে—এরা

দুজন বাক্স আর বাচ্চা কোলে ব্রিসবেনের চওড়া, ধূলিধূসর নোংরা রাস্তায় ঘুরে বেড়াচ্ছে—একটা মাথা গোঁজার জায়গার জন্য। এক বাড়িওয়ালির দরজা থেকে আরেক জনের দরজায়। শেষে এসে থেমেছে শহর প্রান্তের আদিবাসী এলাকায়। ওখানের ঐ সমাজের আচার-ব্যবহার, বিধিনিষেধের মধ্যে নর্মি কি খাপ খাওয়াতে পারবে নিজেকে ? বেকার, কপর্দকহীন মানুষের কঠিন জীবন সংগ্রাম। ওরা তা সহ্য করতে পারবে কি ? নর্মি পারবে কি ?

'কিছু একটা খুঁজে নেবো নিশ্চয়ই'--নর্মির কথা শুনে ছায়া শরীর দুটো হারিয়ে গেল নিঃসীম শূন্যতায়। শুধু কোথায় একটা বাচ্চা ককিয়ে উঠল।

দু'জনে দু'জনের হাত চেপে বসে আছে। নর্মি বলল, "মাঝে মাঝে খুবই খারাপ ব্যবহার পাই। সেটা অবশ্য ওর জন্য। ও যে কালো দেশী মেয়ে সেটা আমার জাতের পছন্দ নয়।'

মেয়েটা হাসল। মিষ্টি, প্রাণখোলা হাসি, সরলতা বই কোন নোংরামি নেই। বললে—'আমরা কিন্তু বেশ ভালোই আছি।'

নর্মি বললে 'ওকে বারবার বলছি আমার সঙ্গে সিড্‌নী যেতে, কিন্তু ও কিছুতেই যাবে না।'

মেয়েটা মাথা নাড়লো, "না সোনা না ওখানে কেউই আমাকে পছন্দ করবে না।"

'ও আমার দেশে যাবে না কিন্তু আমাকে ওর দেশে গিয়ে থাকতে হবে। পশ্চিমে যেতে আমার অবশ্য কোন আপত্তি নেই।'

—'ওদিকটা বেশ ভালো জায়গা, তাই না ডটি ?'

মনে হল বেটির মতো বাস্তব জ্ঞান খুব কম লোকেরই আছে। ওদের দুজনের পক্ষে বেটির দেশই একমাত্র স্থান। ও কখনোই নর্মির দেশের সমাজে স্থান পাবে না। কিন্তু নর্মি, সে কি পারবে তার সবকিছু পিছনে ফেলে বেটির কাছে, ওর দেশে চিরদিন কাটাতে ?

রাস্তার বাঁকে 'উই নামের' লেখা সাদা খুঁটিটা অন্ধকারে ঝক্‌মকিয়ে উঠল। জিওফ্ বলল, 'আমাদের জায়গায় এসে গেছি।'

নর্মি ব্যস্ত হয়ে বললে, 'ধন্যবাদ, অনেক ধন্যবাদ। এখান থেকে ভালোভাবেই যেতে পারবো আমরা।'

গাড়ির গতি কমে এলো।

জিওফ্ দ্বিধান্বিত স্বরে শুধোল, 'আর কতটা যেতে হবে তোমাদের?'

বাক্সগুলো সরাতে সরাতে নর্মি বললে, 'বেশী নয়, আর কয়েক মাইল মাত্র। অসুবিধা হবে না। বাস বা যাহোক কিছু ধরে নেবো।'

জিওফের পায়ে চাপ দিলাম, নিঃশব্দে ঠোঁট নেড়ে জানালাম ওদের ঘরে পৌছে দিতে। ও মাথা নাড়লো। একই সঙ্গে আমাদের দুজনের চোখের সামনে ভেসে উঠল একটা ছবি--ওরা রাস্তার ধারে দাঁড়িয়ে। মেয়েটা অন্ধকারে গা ঢাকা দিয়ে আছে, কেবল তার সাদা সুতির জামাটা আবছা দেখা যাচ্ছে, আর ছেলেটা পথচলতি গাড়ি থামাতে হন্যে হয়ে চেষ্টা করছে। আমরা দুজনে কেউই সে দৃশ্য সহ্য করতে পারলাম না।

জিওফ্ বললো, 'চলো, তোমাদের বরং পৌছে দিই।'

—'ওঃ তাহলে তো দারুণ হবে।' দুই জীবন সংগ্রামীই স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলল।

স্ট্রবেরীর খামার খুঁজে বার করতে পুরো দু ঘণ্টা লাগলো। পাহাড়ী কাঁচা রাস্তায় অনেক ঘুরতে হয়েছে।

একটা পথের বাঁকে হঠাৎ বমি করে ফেললাম।

বেটি জিজ্ঞাসা করলে, 'তোমার কি শরীর খারাপ?'

—'না, না, বাচ্চা হবে তাই।'

—'আমারো তো একই অবস্থা। চার মাস চলছে।"

'এই কি তোমার প্রথম বাচ্চা?'

—'না, দ্বিতায়। প্রথমবার ছেলে হয়েছিল। এবারও একটা ছেলে চাই—নর্মির জন্য। বেটি হাসল। কি সহজে বললে কথাগুলো। তবু ওর স্বরে দুঃখের রেশ পেলাম—'ছেলে হয়েছিল।' ও কি কিছু লুকোতে চাইল? ওর ছেলেটা এখন কোথায়? সে কি ওর পশ্চিমের স্বপ্নের দেশেই রয়ে গেছে। ওর স্মৃতির টুক্‌রো হয়ে? ওকি তাকে আর দেখতে পাবে? নাকি দুরন্ত গতি পৃথিবীর অন্ধকারে তলিয়ে গেছে? ও যেন একটা কুয়োর মতো, কিছুই লুকোয় না—সমস্তই মেনে নেয়।

বেটি বলল, আমি ওপর দিক থেকে এখানে এসেছি। ডারউইন্, ইশা পার হয়ে টাউনস্‌ভিল্। সেখান থেকে কাইরনস্। খুব ভালো জায়গা। উত্তরের দিকে লোকেরা খুব ভালো হয়। কাইরনস্ এই ওর সঙ্গে দেখা।' বেটি হাসলো। বেটির কথা চিন্তা করতে লাগলাম। নিঃসঙ্গ একটি মেয়ে বিশাল এই মহাদেশটা পার হয়ে চলেছে, কখনও ঘোড়ায়, কখনও বিনা ভাড়ায় পথ চলতি গাড়িতে, হেঁটে, লম্বা রেলপথে বিনা টিকিটে পাড়ি জমিয়ে। একা, একদম একা চলেছে, অবিরাম গতি, অক্লান্ত পায়ে। দ্বিতীয় শ্রেণীর রেল কামরার দিকে ফিরেও দেখছে না। যেন ওকে ওরা দেখতে পায়নি। সবকিছু তুচ্ছ করে সে এগিয়ে চলেছে। অবশেষে দেখা হল নর্মির সঙ্গে। নিউটাউনের বখাটে ছেলে নর্মি। দুজনের সাক্ষাৎ আর দু'জনের দুজনের মধ্যে হারিয়ে যাওয়া। কানে বাজতে লাগলো নর্মির কথাগুলো—'ও খুব ভালো। সব কাজে আমায় সাহায্য করে। আমরা ভালোই আছি।' তার সঙ্গে যোগ হয় বেটির নিঃসঙ্কোচ উক্তি—'আর একটা ছেলে চাই—নর্মির জন্যে।'

পাহাড়ের বাঁকে সাদা বিজ্ঞপ্তিটা নজরে পড়ল—"স্ট্রবেরী বাগানে শ্রমিক আবশ্যক।" বাতাসে ভেসে এলো থেঁৎলানো স্ট্রবেরীর গন্ধ আর ভিজে মাটির সুবাস।

ওরা নেমে দাঁড়ালো।

'আর কোনদিন দেখা হবে না হয়তো। মন খারাপ লাগছে। তবে কি জানো, গাড়িতে চড়ে আসার এমন সৌভাগ্য আমাদের আগে কোনদিন হয়নি। অবস্থাটা তোমরা নিশ্চয়ই অনুভব করতে পারছ! অনেক অসুবিধে করেছি। তোমাদের দুজনকে আন্তরিক ধন্যবাদ।' নর্মি বললে।

বেটি হাত বাড়িয়ে বললে, 'ভগবান তোমার মঙ্গল করুন।'

ওরা এগিয়ে গেল। বিজ্ঞাপনের খুঁটির নীচ দিয়ে জোৎস্নালোকিত রাস্তা ধরে তারা সামনে এগিয়ে চলেছে। মেয়েটা পিছনে ফিরে হাত নাড়ল—

'আনন্দে থেকো তোমরা, খুশী থেকো।'

কালো কালো পাহাড়গুলোকে ছুঁয়ে ছুঁয়ে তার শেষ কথাগুলো প্রতিধ্বনিত হয়ে ফিরতে লাগল।

অনুবাদ | কৃষ্ণা বসু

তরুণ চিকিৎসক

লি ওয়াই লুন

নদীর ওপারের কুয়াশার আবরণ ভেদ করে চাঁদ উঠল। গ্রামের পূর্বপ্রান্তে একটা টালির ঘর। দেওয়ালগুলো লতানে ফুলে ভর্তি। চারিদিক মৌ মৌ করছে মিষ্টি গন্ধে। চাঁদের আলোয় ঘরের দেওয়ালে একটা ছায়া এসে পড়েছে। একটি মেয়ের ছায়া। মেয়েটি জানলার পাশে হাঁটুর ওপর মাথা রেখে বসে আছে।

মেয়েটির নাম ইয়ে, পি, চেন। পেশায় ডাক্তার। একটা সাদা বেড়াল ছানা তার হাতটা নিয়ে খেলা করছে আর মাঝে মাঝে ইয়ে, পি, চেনের আনমনা মুখটার দিকে তাকিয়ে দেখছে।

বাইরে পায়ের শব্দ শোনা গেল। তাড়াতাড়ি চোখের জল মুছে আলোটা জ্বালল চেন। তারপর একটা বই নিয়ে পড়তে শুরু করল। যেন এতক্ষণ সে বই-ই পড়ছিল। পায়ের আওয়াজটা ক্রমশ এগিয়ে এসে দরজার সামনে থামে। বই ফেলে তাড়াতাড়ি এসে দরজাটা খুলে দিলো চেন। দরজার সামনে দাঁড়িয়ে ডঃ চৌ, তিং, সাং। দেখেই বুঝতে পারল ডঃ চৌ গ্রাম থেকে রোগী দেখে ফিরছে।

একটু এগিয়ে চেন এসে চৌ-এর হাত থেকে ব্যাগটাকে নিল। চেনের দিকে তাকাল চৌ। ওর ঠোঁটের কোণে ফুটে উঠল একটা স্নিগ্ধ হাসি। আলোর কাছাকাছি আসার আগেই চেন ভাল করে চোখ দুটোকে মুছে নিয়েছিল যাতে চৌ ওর কান্নার কথা টের না পায়। একটা চেয়ার টেনে নিয়ে চৌ বসতেই চেন বলল—'চৌ তোমার কোটের একটা বোতাম ছিঁড়ে গেছে। কোটটা খুলে দাও। বোতামটা এক্ষুণি লাগিয়ে দিচ্ছি।'

কোটটা খুলে দিতে দিতে চৌ বলল—'তোমাকে একটা কথা বলব ভাবছিলাম।'

চৌ-এর চোখে চোখ রেখে চেন বলল—'বল, কি বলবে?'

'কাল আমি চলে যাচ্ছি।' তারপর একটু থেমে খানিকটা ইতস্ততঃভাবে বললেন, 'একটু আগেই খবরটা পেয়েছি।'

মনে মনে চমকে ওঠে চেন। হাত থেকে ছুঁচটা পড়ে যায়। মাথাটা নিচু করে নিঃশব্দে বসে থাকে।

'তোমায় আমি চিঠি দেব চেন। তুমি দেবে তো?'

চেনের ঠোঁট দুটো থরথর করে কাঁপছিল। অস্ফুট কটা শব্দ বেরিয়ে এল ওর মুখ থেকে—'নিশ্চয়ই দেব চৌ।'

চৌ শান্ত চোখ দুটো তুলে বলল—'চেন, আমার সবচেয়ে প্রিয় বন্ধু বলতে তুমি। অনেকগুলো দিন আমরা এক সঙ্গে কলেজে কাটিয়েছি। একসঙ্গে পড়াশোনা করেছি। পাশ করে বেরুনোর পরও আমরা অনেকদিন একসঙ্গে কাজ করেছি। কেমন করে তোমাকে ভুলব চেন। তোমাকে ভোলা আমার পক্ষে অসম্ভব। তোমার কথা আমার মনে থাকবে চেন। মনে থাকবে।'

'তোমাকেও আমি মনে রেখে দেব চৌ। সারা জীবন মনে রেখে দেব।' খুব ধীর শান্ত কণ্ঠস্বর চেনের।

চৌ আবার বলল—'আমায় ক্ষমা করেছ তো চেন? যেতে যে আমাকে হবেই। আর এটাই বোধহয় ভাল হল।'

চেনের মুখে কোন কথা সরে না। একভাবে মাথা নীচু করে বসে থাকে। চোখ দুটো ওর জলে ভরে ওঠে।

কারো মুখে কোন কথা নেই। দুঃসহ ক্লান্তিকর নীরবতা শুধু দীর্ঘশ্বাস ফেলে।

একটু আগে ডাঃ চৌ চলে গেছে। অব্যক্ত একটা কান্নায় চেনের গলাটা বুজে আসে। সবকিছু যেন আজ শূন্য হয়ে গেছে। ছুটে গিয়ে আছড়ে পড়ে চেন বিছানাটার ওপর। তারপর বালিশে মুখ গুঁজে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে থাকে একটানা।

চার বছর আগে। চেন তখন মেডিক্যাল কলেজের প্রথম বর্ষের ছাত্রী। ওর নিত্যকার অভ্যেস ছিল ভোরবেলা ঘুম থেকে উঠেই লেকের ধারে গিয়ে পড়াশোনা করা। চিকন সবুজ ঘাসের ডগায় ডগায় জমে থাকা শিশির বিন্দুগুলোর ওপর প্রথম সূর্যের আলো পড়ে ঝলমলিয়ে উঠত। মুগ্ধ চোখে তাকিয়ে তাকিয়ে দেখতো চেন ঘাসের ডগায় সেই আলোর নাচন। ভোরের স্নিগ্ধ বাতাস শীতল পরশ বুলিয়ে দিত ওর সারা দেহ মনে তারপর নদীর বুকে ঢেউ-এর লহর তুলে বয়ে যেত আপন খেয়ালে। চেন রোজই দেখত ওর মত আরো একটি ছেলে সামনের ওই ঝাঁকড়া গাছটার নীচে বসে নিবিষ্ট মনে বই পড়ে যাচ্ছে।

এমনি চলছিল দিনের পর দিন। একদিন চেন ওর নির্দিষ্ট জায়গায় বসে পড়াশোনা করছে। ছেলেটিও রোজকার মত একমনে বই পড়ছে গাছটার নীচে বসে। পড়তে পড়তে চেন একটি জায়গার অর্থ কিছুতেই উদ্ধার করতে পারছিল না। মনে মনে ভাবল যদি ছেলেটির কাছ থেকে অর্থটি জেনে নেয় তাহলে কি ব্যাপারটা খুবই

বিসদৃশ হবে? ভাবতে ভাবতে পায়ে পায়ে কখন এগিয়ে যায় চেন ছেলেটির দিকে। খুব লজ্জা পাচ্ছিল নিজে থেকে যেচে কথা বলতে। কথা বলতে কাছে গিয়ে অবাক হয় চেন! ছেলেটি মনযোগ দিয়ে উল বুনছে! চেনের খুব হাসি পাচ্ছিল। শেষকালে হাসি আর চাপতে না পেরে খুব জোরে হেসে উঠল ও। হঠাৎ হাসির দমকে চমকে ওঠে ছেলেটি। চোখাচোখি হয় দুজনের। লজ্জা পেয়ে মুখটা নীচু করে চেন। রাত্রে হস্টেলে বসে অনেক ভেবেছে ও। দুনিয়ায় এত করার কাজ থাকতে ছেলেটি উল বুনতে বসেছিল কেন?

কয়েকদিনের মধ্যেই ছেলেটির নাম জেনে নিয়েছিল চেন। চৌ তিং শান। ওদেরই কলেজের ফাইনাল ইয়ারের ছাত্র। এর পর থেকে যখনই পড়াশোনার ব্যাপারে কোন সমস্যার সৃষ্টি হয়েছে চেন তখনই চৌ তিং শান-এর কাছে গিয়ে তা সমাধানের চেষ্টা করেছে। চৌ-ও যথাসাধ্য চেষ্টা করত চেনের পড়াশোনায় সাহায্য করতে। এমনি করে, আস্তে আস্তে পরস্পরের সান্নিধ্য ওদের কাছে ক্রমশ আকর্ষণীয় হয়ে উঠতে লাগল। সময় পেলেই দুজনে হ্রদের ধারে চলে আসত। উন্নতগ্রীবা রাজহংসদের জলকেলি দেখত হ্রদের জলে। চৌ শান-এর মধ্যে একটা দ্রুত পরিবর্তন লক্ষ্য করে পি, চেন। সাজ-পোশাক, কথাবার্তা, চালচলনে এই পরিবর্তন আরো স্পষ্ট হয়ে উঠতে লাগল।

স্পষ্ট মনে আছে চেনের, গরমের ছুটির আগের দিন ওদের বিদায় মুহূর্তটিকে স্মরণীয় করে রাখার জন্য ওরা সেদিন হ্রদের ধারে একটা চেরী গাছ পুঁতেছিল। অনেকক্ষণ ধরে হাত ধরে ঘুরে বেড়িয়েছিল ওরা সেদিন হ্রদের ধারে।

এরপর বেশ কিছুদিন পার হয়ে গেছে। তখন শীতকাল, হঠাৎ একদিন চৌ শান এসে বলল, 'আমি তোমায় ভালবাসি চেন।' বিস্ময়ে চমকে উঠেছিল চেন! কি বলতে চাইছে চৌ! খুশিও

হয়েছিল খুব। এই প্রথম একজন পুরুষ ওকে ভালবাসার কথা জানাল।

চো-এর কথাগুলো, ওর মুখ চোখের পরিবর্তন, খুবই উত্তেজিত করেছিল চেনকে। কি উত্তর দেবে, কি করবে, কিছুই মাথায় আসছিল না চেনের। একথা সত্যি চৌ-এর সাহচর্য, ওর সান্নিধ্য ভাল লাগে চেনের। ভাল লাগে ওর সঙ্গে হাত ধরে হ্রদের ধারে ঘুরে বেড়াতে, গল্প করতে। কিন্তু তাকে কি প্রেমে পড়া বলা চলে? এমন চিন্তা পি, চেনের মাথায় তো কই একবারও আসেনি! কোন সন্দেহ নেই এ বয়েসটা প্রেমে পড়ারই বয়েস। তবু ঠিক সায় দিতে পারে না চেন ব্যাপারটায়। নিজেকে এত সহজলভ্য ভাবতে খুব খারাপ লাগে ওর। তাছাড়া চৌ-এর আছেটাই বা কি! অত্যন্ত সাধারণ সাদামাটা একজন চিকিৎসক। অতিরিক্ত গুণ বলতে সূচী-শিল্প নিপুণ। সেটা কোন প্রশংসার ব্যাপার নয়। অথচ ওর চিরদিনই ইচ্ছে ছিল এমন একজন মানুষকে ও ভালবাসবে যে হবে অসাধারণ, মহান। এ সবের বাইরেও একটা অন্য কারণও তো তার রয়েছে। ঠিক এই মুহূর্তে কাউকে ভালবাসতে চায় না চেন। নিজেকে তৈরি করার সময়ে কাউকে ভালবাসতে গিয়ে নিজেরই ক্ষতি হয়। চেন তা চায় না। ওকে অনেক বড় ডাক্তার হতে হবে। এখনও পুরো বয়েস পড়ে আছে। ভালবাসার সময় অনেক পাওয়া যাবে।

নতমুখে খুব ধীর ভাবে পি, চেন বলল, 'চৌ, আমরা কি পরস্পরের বন্ধু হতে পারি না? এই তো বেশ!' চৌ-এর চোখে চোখ রাখে চেন।

চৌ-এর ঠোঁট দুটো কেঁপে ওঠে। কোন কথা বলতে পারে না চৌ।

চেন বলল—'আমাকে ক্ষমা কর চৌ। এছাড়া কিছু আর করার নেই। কেননা সামনে অনেক কিছু আমাদের জন্যে অপেক্ষা করছে।'

চৌ নিরুত্তর।

কথাগুলো বলে চৌ-এর মুখের দিকে তাকায় চেন। ব্যথা আর বিষণ্ণতার ছায়া চৌ-এর চোখে মুখে। আরো নরম করে কথাগুলো বলতে পারত চেন! কিন্তু চৌ-ও বা এমন করল কেন? বেশ তো তারা বন্ধুভাবে ঘুরে বেড়াতো, গল্প করত, পরস্পরের সমস্যা নিয়ে আলোচনা করত। সেই বেশ ছিল। তাছাড়া, কলেজে তো আরো অনেক মেয়ে আছে। তাদের মধ্যে কোন একজনকে তো চৌ ভালবাসতে পারত। নিজেকে দোষ না দিয়ে পারে না চেন। ও যদি একটু সংযত হত চৌ নিশ্চয়ই এতখানি এগোতে পারত না। নিজেকে সে গুটিয়ে নেবে। প্রথম প্রথম চৌ হয়তো কষ্ট পাবে। তবু যত কষ্টই হোক সময় ওকে সব ভুলিয়ে দেবে। হয়তো বিয়ে থা করে সুখীও হতে পারবে।

এর পর থেকেই যতটা সম্ভব চৌ-কে এড়িয়ে চলতে লাগল চেন। যত কম দেখা সাক্ষাত হবে ততই মঙ্গল দুজনের পক্ষে। মাঝে মধ্যে হঠাৎ কোনদিন চৌ এর সঙ্গে দেখা হয়ে গেলে চেন বেশ বুঝতে পারত চৌ-এর দিনগুলো খুব যন্ত্রণায় কাটছে। চেনের উপেক্ষা সহ্য করতে পারেনি চৌ। কিন্তু চেনেরই বা কি করার আছে এতে। চৌ-এর কষ্ট ওকে খুব দুঃখ দেয় ঠিকই। কিন্তু শুধু দুঃখ আর সহানুভূতি নিয়ে তো কাউকে ভালবাসা যায় না। আর তা ঠিকও নয়।

শীত শেষ হল। বসন্তও এসে গেল গুটি গুটি পায়ে। এখন গ্রীষ্মকাল। চৌ কলেজ ছেড়ে পাশের একটা গ্রামের হাসপাতালে গেল শিক্ষানবীশ হয়ে।

পি, চেন প্রায়ই লক্ষ্য করত চৌ তার যন্ত্রপাতি নিয়ে ওর জানলার পাশ দিয়ে যাতায়াত করে। কিন্তু কখনো চোখ তুলে তাকায় না। অনেক রাত পর্যন্ত চৌ-এর ঘরে আলো জ্বলে। চেন বুঝতে পারে না এত রাত অবধি চৌ জেগে কি করে। পরে শুনল

সোভিয়েত ডাক্তারদের এক আবিষ্কারের ওপর ও নতুন ভাবে গবেষণা করছে, যাতে করে কম সময়ে এবং কম কষ্টে টন্‌সিল অপারেশন করা যায়। কিন্তু এই কাজে ওর এখন এমন একজন লোকের প্রয়োজন যে ওকে রাশিয়ান ভাষা থেকে অনুবাদ করে সাহায্য করতে পারবে।

পি, চেন সমস্তটাই রাশিয়ান ভাষা থেকে অনুবাদ করে চৌ-এর কর্মসচীবের হাতে দিল। কিন্তু তাকে সাবধান করে দিল, চেন যে এ ব্যাপারে সাহায্য করেছে সে কথা যেন চৌ কোন রকমেই জানতে না পারে।

একদিন গভীর রাতে চেনের হঠাৎ ঘুমটা ভেঙে গেল। চৌ এর ঘরের দিকে নজর পড়তেই দেখল ঘরে আলো জ্বলছে। বিছানায় শুয়ে ছটফট করছিল চেন। কিছুতেই ঘুম আসছে না। ও শুনেছে চৌ নিজের ওপরেই পরীক্ষা চালাচ্ছে। পরের জীবনের জন্যে হাসি মুখে চৌ নিজের জীবন উৎসর্গ করেছে। চৌ সত্যি মহান। চেন ভাবে চৌ-কে সে এতদিন ঠিক চিনতে পারেনি। এবার প্রথম সুযোগেই সে তার নিজের ভুল শুধরে নেবে।

চৌ এর অক্লান্ত পরিশ্রম এবং অধ্যবসায় শেষ পর্যন্ত সফল হল। সর্বত্র সমাদৃত হল ওর গবেষণা। চেনের খুব ইচ্ছে করে চৌ এর এই সাফল্যে তাকে অভিনন্দন জানাতে। কিন্তু চৌ যদি তার এই আন্তরিক ইচ্ছেটার অন্য ব্যাখ্যা করে! দ্বিধা কাটিয়ে চেন কিছুতেই চৌ এর মুখোমুখি হতে পারে না। অনুতাপদগ্ধ হৃদয় বার বার ওকে শুধু অস্থির করে তোলে।

এরপর কোরিয়াতে যুদ্ধের দামামা বেজে উঠল। আমেরিকান সৈন্যরা যথেচ্ছ লুঠতরাজ আর হত্যালীলা চালাতে লাগল কোরিয়ার বুকে। কলেজের তরফ থেকে স্বেচ্ছাসেবী বাহিনীতে যোগ দিতে চেয়েছিল চেন। কিন্তু মেডিক্যাল ছাত্রছাত্রীদের স্বেচ্ছাসেবী বাহিনীতে নেওয়া হলনা।

এরপর পড়াশোনার মধ্যে গভীর ভাবে ডুবে গেল চেন। অনেক বড় ডাক্তার হতে হবে তাকে। বৃহত্তর জীবনের কাজে নিজেকে সে পুরোপুরি উৎসর্গ করতে চায়। রাতের পর রাত জেগে চলল চেনের আদর্শ চিকিৎসক হবার সাধনা। রাত্রে হস্টেলের আলো নিভে গেলে টর্চ জ্বেলে চেন পড়াশোনা করতে লাগল। কোন কিছুতেই সে দমবে না। কিন্তু এই অমানুষিক পরিশ্রম সে সহ্য করতে পারল না। কিছুদিনের মধ্যেই চেনকে শয্যা নিতে হল। ভাগ্যের কি নিষ্ঠুর পরিহাস! কোথায় সে চিকিৎসক হয়ে রোগীর সেবা করবে, তা না সে নিজেই রোগী হয়ে বসে থাকল।

রোগশয্যায় শুয়ে শুয়েই চেন শুনল তাদের শহর থেকে এক দল চিকিৎসক কোরিয়ার যুদ্ধে যোগ দিতে যাচ্ছে। ওই দলে চৌ-ও আছে। ডাক্তারের অনুমতি চাইল চেন, একটি বারের জন্যে ও শুধু চৌ-এর সঙ্গে দেখা করতে যেতে চায়। কিন্তু চেনের শরীরের কথা বিবেচনা করে ডাক্তার ওর আর্জি মঞ্জুর করলেন না। বেচারী চেন। দূর থেকে বসে মনে মনে শুধু প্রার্থনা করে, ওরা যেন যুদ্ধক্ষেত্রে সফল হয়ে নিরাপদে ফিরে আসে। আর চৌ যেন একটি বারের জন্যেও এসে ওকে চোখের দেখা দিয়ে যায়।

হতাশ হল চেন। ওর কল্পনা বাস্তবে রূপায়িত হল না। চৌ চলে গেছে আর চেনের সঙ্গে দেখা না করেই।

চিঠি লিখতে বসে চেন। অসংখ্য চিন্তা ভাবনা ওকে আনমনা করে।—'যাও চৌ, আদর্শ আর কর্তব্যের মহান দায়িত্ব পালন করতে তুমি এগিয়ে যাও। দেশের মুখ উজ্জ্বল কর। সাফল্য আর জয়ের মালা নিয়ে ফিরে এস, নিরাপদে ফিরে এস চৌ……।' ঠিক কি যে লেখা উচিত কিছুই ভেবে পায় না চেন।

কিছুদিন পর চেন খবর পেল চৌ চিঠি দিয়েছে। প্রায় সবাইকেই দিয়েছে, শুধু তাকে বাদ দিয়ে।

সত্যিই কি চৌ ওকে ভালবাসত ? ভাবনার গভীরে তলিয়ে যায় চেন। কেন ও চিঠি লিখবে ? কাকে লিখবে ?

কোরিয়ায় তখন জোর লড়াই চলছে। শত্রুপক্ষ ক্রমশ পিছিয়ে পড়ছে। অবশেষে শত্রুপক্ষ ওদের সৈন্যবাহিনীর কাছে নতি স্বীকার করে সন্ধি করতে বাধ্য হল। কিন্তু চৌ এর আর কোন খবর পাওয়া গেলনা। চিঠি দেওয়া বন্ধ করেছে চৌ। চিন্তায় ভাবনায় একবারে ভেঙে পড়ল চেন।

যুদ্ধক্ষেত্র থেকে সকলেই প্রায় ফিরে এসেছে। ডাক্তারের মধ্যে বেশির ভাগই ফিরে এসেছেন। ওদের মুখেই চেন শুনল, চৌ-এর মর্মান্তিক দুর্ঘটনার কথা। চৌ এখন কোরিয়ারই একটি সামরিক হাসপাতালে। যুদ্ধে ওর একটি চোখ সম্পূর্ণ ভাবে নষ্ট হয়ে গেছে। কান্নায় ভেঙে পড়ে চেন। পায়ে পায়ে এগিয়ে আসে চেরী গাছটার নীচে। ওদের আনন্দময় দিনগুলোর স্মৃতি বুকে নিয়ে আজও দাঁড়িয়ে আছে গাছটা। পাতায় ভরে গেছে ওর ডালপালাগুলো। আনমনা হয়ে পড়ে চেন। পুব দিকের আকাশটা মেঘে মেঘে কালো হয়ে উঠল। তারপর শুরু হল মুষলধারে বৃষ্টি। পুরোন দিনের স্মৃতি-গুলো ওর চোখের সামনে ছবির মতো ভেসে উঠল। এই চেরী গাছের নীচে দাঁড়িয়েই চেন নির্মমভাবে চৌ এর ভালোবাসাকে প্রত্যাখ্যান করেছিল। মনে আছে চেনের, চৌ-এর চোখদুটো সেদিন উপেক্ষার বেদনায় কেমন ব্যথাতুর হয়ে উঠেছিল। কোন কথা বলতে পারেনি চৌ। কেন সেদিন চেন অমন ব্যবহার করেছিল ! কেন ফিরিয়ে দিয়েছিল চৌ-কে। অথচ চৌ তো সত্যিই ওকে ভালবাসত। সেদিনের সেই প্রাণ প্রাচুর্যে ভরা উচ্ছল মানুষটা আজ অসহায়ভাবে পড়ে আছে বিছানায়। ভাবতে ভাবতে চেনের চোখ দুটো জলে ভরে ওঠে। হঠাৎ পায়ের শব্দে পিছন ফিরে তাকায় চেন। ওদের ইউনিট সেক্রেটারী লু, ছাতা মাথায় দিয়ে দাঁড়িয়ে। লু-কে দেখে চেন ওকে জড়িয়ে ধরে উন্মাদের মতো কাঁদতে লাগল। লু

নীরবে চেনের পিঠে হাত বুলোতে থাকে। 'সিস্টার লু…' পি, চেন কাঁদতে কাঁদতে বলল—'আমি…'

'আমায় বলতে দাও পি, চেন?' চেনকে থামিয়ে দিয়ে লু বলল,—'তুমি কোনদিনই আমায় কিছু বলনি। তোমায় একটা কথা বলা দরকার, তোমার অসুস্থ অবস্থায় চৌ-ই তোমায় রক্ত দিয়েছিল। কিন্তু তুমি তা জানতে পারনি, কারণ চৌ একথা তোমায় বলতে বারণ করেছিল। পাছে তুমি ভাব যে তুমি তার কাছে কৃতজ্ঞতার ঋণে জড়িয়ে পড়েছ। চেন, আজ সে একটি চোখ হারিয়েছে, দেখতে সে সত্যি কোনদিন সুন্দর ছিল না, কিন্তু ওর হৃদয়টা যে কতবড় সে তোমার অজানা নয়। এখন সব কিছুই তোমার ওপর নির্ভর করছে। তুমি বুদ্ধিমতী মেয়ে, তুমিই ঠিক করবে কি করা উচিত।'

চারিদিকে নিশ্ছিদ্র অন্ধকার। হস্টেলের ছাত্রছাত্রীরা সবাই গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন। শুধু একজনের চোখেই ঘুম নেই। গায়ে বর্ষাতি চাপিয়ে আস্তে আস্তে বেরিয়ে এল পি, চেন। বোমার আক্রমণের জন্য সর্বত্র 'ব্ল্যাক আউট' ঘোষিত হয়েছে। এক জায়গায় ঘেরাটোপের সামান্য আলো। সেই আলোর তলায় বসে পড়ে চেন। চিঠি লিখতে শুরু করে……

"প্রিয়তম চৌ,

যদি তোমায় আঘাত করে থাকি তবে তা সম্পূর্ণ না বুঝে। আমি তোমায় চিনতে পারিনি চৌ। আমার এই অনিচ্ছাকৃত অপরাধ মার্জনা করো। তুমি জান না, তুমি চলে যাবার পর সেই চেরী গাছটার তলায় দাঁড়িয়ে কতবার তোমার নাম ধরে ডেকেছি। তোমার মহত্ত্বের পরিচয় আমি পেয়েছি চৌ। আজ শুধু বারবার তোমার কথা, আমাদের বিদায় মুহূর্তের কথা মনে পড়ছে। তোমার ভাবনা আমার নিঃসঙ্গ মনকে ভরিয়ে রাখে। ভেব না, তোমার অসহায় অবস্থার সুযোগ নিয়ে তোমায় অনুকম্পা দেখানোর চেষ্টা করছি। এ আমার প্রাণের কথা, একেবারে নিভৃত অন্তরের কথা চৌ। প্রিয়তম আমার,

আমার মনের সবটুকু উজাড় করে তোমায় ভালবাসতে শিখেছি। আমায় দূরে সরিয়ে দিও না সোনা—। আমরা আবার এক হব। চিরদিনের জন্যে আবার আমরা পরস্পর মিলিত হব।"

চিঠিটা ডাকবাক্সে ফেলার পর থেকেই রোজ চেন চিঠির জন্যে বসে থাকে। চেন ভাবে চৌ নিশ্চয় তাকে তাড়াতাড়ি উত্তর দেবে। অনেক দিন পেরিয়ে গেল, কিন্তু উত্তর এল না। চেনের মুখের হাসি ক্রমশ মিলিয়ে যেতে লাগল। রোগা হতে লাগল চেন। বারবার শুধু নিজেকে প্রশ্ন করে চেন, ও কি উত্তর দেবে না? কিন্তু কেন? চৌ কি আজও রেগে আছে তার ওপর? অনেকদিন অপেক্ষা করার পর উত্তরের আশা ছেড়ে দিল চেন।

একদিন সন্ধ্যেবেলা চেন পড়াশোনা করছে। একটি মেয়ে এসে বলল চেনের নামে সামরিক বাহিনীর ছাপ মারা একটা চিঠি এসেছে।

উত্তেজনায় ফেটে পড়ে চেন······'আমার চিঠি?'

'হ্যাঁ, তোমারই চিঠি। কিন্তু সে চিঠি তো তুমি এখন পাবে না। দেখে মনে হল চিঠিটা একেবারেই মামুলী, কাজেই ওই চিঠির জন্যে এত উত্তেজিত না হওয়াই ভাল।'

কোন কথায় কান না দিয়ে চেন ছুটে গেল চিঠির বাক্সটার দিকে। কাঁচের মধ্য দিয়ে দেখা যাচ্ছে ওর নামেরই চিঠি। আর ঠিকানার লেখাটা চৌ এর হাতের লেখা ছাড়া আর কারো নয়। চেনের ইচ্ছে করছিল এক ধাক্কায় বাক্সটাকে ভেঙে ফেলে, তারপর ছুটে গিয়ে চাবিটা এনে বাক্সটাকে খুলে ফেলে। চৌ এর চিঠি! চৌ তাহলে ওকে ক্ষমা করেছে। আনন্দে চেনের বুকটা নেচে ওঠে।

'পি, চেন, আমি জানি তুমি অন্তত আমার জন্যে সুখী', এই দিয়ে চিঠি শুরু—'এক চক্ষু বিশেষজ্ঞ আমার চোখ ভাল করে তুলেছেন, নিশ্চয় তুমি খুশি হচ্ছ,' পড়তে পড়তে পি, চেন আনন্দে কেঁদে ফেলল—'তোমার চিঠিটা সযত্নে আমার জামার বুক পকেটে

রেখে দিয়েছি। রোজই আমি চিঠিটা পড়ি। আমিও মানুষ, চোখের জল আমারও পড়ে। চিঠিটা যতবারই পড়ি আমার দুচোখ জলে ভরে ওঠে। আমার জীবনের সব চাইতে দুঃসময়ে তুমি আমায় মনে রেখেছ, তোমার ভালোবাসার কথা আমায় জানিয়েছো। আমি কেন আকুল হব না বল ? অনেক কথা বলার আছে তোমাকে। কিন্তু কোথা থেকে যে শুরু করবো ভেবে পাচ্ছি না। বিশ্বাস কর, আমি তোমায় অনেক চিঠি লিখেছি। কিন্তু একটাও পাঠাতে পারিনি। আমি তোমায় নিশ্চয় সব কিছু জানাব। সুস্থ হলে আমি আমাদের পুরনো কলেজে ফিরে যাব।'

কিন্তু এখন সে কি করবে! চৌ চিঠিতে জানায়নি ঠিক কবে ও ফিরছে।

কিছুদিন পর, চেন পায়ে পায়ে চেরী গাছটার কাছে এসে দাঁড়াল। ধীরে ধীরে সন্ধ্যার অন্ধকার ঘনিয়ে আসছে। হঠাৎ ভাল করে তাকিয়ে চেন নিজের চোখকে বিশ্বাস করতে পারে না। অন্ধকারে চৌ দাঁড়িয়ে! সত্যিই চৌ! এক লহমায় সমস্ত পৃথিবী চেনের চোখে যেন অপূর্ব হয়ে ওঠে। কি মনোরম এই আকাশ, বাতাস। আবেগে চেন চেঁচিয়ে ওঠে, 'চৌ, তুমি ? কখন এলে ? তোমার চোখ দুটো যে আরো উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে চৌ···!'

'পি, চেন!' বিস্ময়ে চৌ-র চোখ দুটো নেচে ওঠে। আনন্দে বিহ্বল হয়ে পড়ে চৌ। এতদিন পরে পি, চেনের সঙ্গে দেখা। কি কথা দিয়ে যে শুরু করবে, কি বলবে, কিছুই বুঝতে পারে না সে। মনে মনে প্রস্তুত হয় চৌ, তারপর বলতে শুরু করে—'তোমার স্নাতক হবার জন্যে প্রথমেই তোমায় অভিনন্দন জানাচ্ছি চেন······এরপর কি করবে ?'

চৌ-এর দিকে তাকায় চেন। বুঝতে চেষ্টা করে, সত্যি কথাগুলো চৌ ভালবাসা থেকে বলছে কিনা। তারপর জবাব দেয়, 'কোন গ্রামে ডাক্তারী করবো। আমি অসুস্থ মানুষদের চিকিৎসা

করবো, তাদের সুখী করার চেষ্টা করবো। এ বিষয়ে তোমার অভিমত কি ?'

'এর চেয়ে ভালো আর কি হতে পারে চেন।' চৌ বলতে থাকে—'আমি জানতাম, তুমি অন্য মেয়েদের চাইতে আলাদা। আমারও ইচ্ছে কোন গাঁয়ে গিয়ে আর্ত মানুষদের সেবা করবো।'

'আচ্ছা, আমরা একসঙ্গে যদি কাজ করি, খুব ভাল হয়, তাই না ?' অস্ফুটে কথাগুলো বলে চেন, কথা বলার সময় ওর মুখটা লজ্জায় রক্তিম হয়ে ওঠে। ঠোঁট দুটো কেঁপে কেঁপে ওঠে। বেচারী চেন, ও জানে না ওর এই স্বপ্ন ভেঙে খান খান হয়ে যাবে, কোনদিনই তা হবে না।

কিছুক্ষণ নীরব থেকে চৌ বলল—'চেন, জীবনটা যদি এত সহজ নাও হয়, তবু আমার বিশ্বাস, চলার পথে তুমি তোমার সাহস আর শক্তি নিয়ে মাথা উঁচু করেই থাকবে।' চৌ এর গলা ধরে আসছিল, কোন কথা আর বলতে পারছিল না। তারপর অনেক চেষ্টায় নিজেকে সংযত করে স্বাভাবিক ভাবে বলে—'আমি একদিন তোমায় ভালোবাসতাম চেন, খুব ভালোবাসতাম। চাইতাম তুমিও আমায় একই ভাবে ভালোবাস। কিন্তু যে কোন কারণেই হোক তুমি সেদিন তা পারনি। আমি খুব আঘাত পেয়েছিলাম চেন। তাই তোমার কাছ থেকে আমি দূরে সরে গিয়েছিলাম। অনেক দূরে। তোমাকে ভুলতে চেয়েছিলাম, মন থেকে তোমাকে মুছে ফেলতে চেয়েছিলাম। কারণ, আমি জানতাম সেটা আমাদের দুজনের পক্ষেই মঙ্গলকর হবে। আর তাই আমি চিঠি দিয়ে তোমার সঙ্গে যোগাযোগ করিনি।'

'আমার চৌ···' কান্না ঝরে পড়ে চেনের কণ্ঠে—'আমার ওপর আর কোন রাগ রেখ না—'

'না চেন, তোমার ওপর আমার কোন রাগ নেই। আর রাগ তোমার ওপর কি করে করবো বল ?' তাড়াতাড়ি কোন রকমে কথা

গুলো বলে গেল চৌ। 'আমি জানি না, আমি তোমায় কি করে বোঝাব তখন আমার মনের মধ্যে কি ঝড় বইত। তুমি বুঝতে পারবে না, কি আকুলভাবে আমি প্রার্থনা জানাতাম তুমি সুখী হও। কিন্তু এরপরও অনেক কথা আছে, অনে-ক কথা……। আমি, আমি তোমায়……বিশ্বাস কর চেন, আমি আর তোমায় আগের মতো ভালবাসতে পারি না। অবশ্য একথা অস্বীকার করি না, আজও তোমায় আমার ভাল লাগে। খুব ভাল লাগে। কিন্তু…পি, চেন, আমি যে একজনকে ভালবেসে ফেলেছি।'

অনর্গল একটানা বকে চলে চৌ… পি, চেনের আশা ছেড়েই দিয়েছিল চৌ। কোনদিন ভাবতে পারেনি, চেন আবার তাকে কাছে টানতে পারে। কোনদিন আর কোন মেয়েকে যে ও ভালবাসতে পারে তেমন ভাবনাও ওর মনে আসেনি। শুধু ভাবতো ওরও তো অনেক কিছু করার আছে। ব্যর্থতা আর হতাশা নিয়ে বাকী সময়টুকু নষ্ট করাও উচিত নয়। তবু জীবনে অনেক অপ্রত্যাশিত ঘটনা ঘটে। বাঁচার তাগিদেই ঘটে। যুদ্ধক্ষেত্রে হোসিও চেনের সঙ্গে পরিচয় হল চৌ-এর। যুদ্ধে ভীষণভাবে আহত হবার পর হোসিও চেন তার সমস্ত দরদ দিয়ে নিজের হাতে তুলে নিল চৌ-এর শুশ্রূষার ভার। অনেক বিনিদ্র রাত, দুঃসহ দিন হোসিও চেন কাটাল তারই শয্যার পাশে। অর্ধচেতন অবস্থায় সে শুনতে পেত হোসিও চেনের আকুল কান্না। প্রশ্ন করেছিল চৌ, কেন সে এক অনাত্মীয়ের জন্যে এমন ভাবে চোখের জল ফেলে ? কোন উত্তর দেয়নি হোসিও চেন। ওর নীরব ক্রন্দন চৌ-এর প্রশ্নের উত্তর দিয়েছিল সেদিন। তারপর থেকেই ওরা পরস্পরকে গভীরভাবে ভালবাসতে শুরু করে। পরস্পরের প্রতি প্রচণ্ড বিশ্বাস আর আস্থা নিয়ে ওরা নতুনভাবে বাঁচতে চাইল। ঠিক এই সময়ই পি, চেনের আহ্বান এল চৌ এর কাছে। ধীরে ধীরে মুখ তোলে চৌ। পি, চেনের চোখে চোখ রাখে।

কোন কথা বলতে পারে না চেন—শুধু বোবা দৃষ্টি মেলে তাকিয়ে থাকে চৌ-এর দিকে।

কি করে যে পি, চেন তার ঘরে ফিরে এসেছিল এখনও মনে করতে পারছে না। বিছানায় শুয়ে সারারাত জেগে কাটিয়ে দিল, ঘুম এল না কিছুতে। আকাশটা তারায় তারায় ভরে গেছে। ধীরে ধীরে চাঁদ উঠল। চেন কোটটা গায়ে দিয়ে লেকের দিকে এগিয়ে চলল। চেরীগাছটার তলায় গিয়ে বসল চেন। একটা তারা আকাশ থেকে খসে পড়ে আকাশেই মিলিয়ে গেল। ঠিক যেন ওর ভালবাসার মতো। যে ভালবাসার জন্যে ও এতদিন অধীর আগ্রহে প্রতীক্ষা করেছে আজ আর তা ফিরে পাবার কোন আশাই নেই। প্রাণ ভরে কাঁদতে চাইল চেন, কিন্তু চোখ দিয়ে একফোঁটাও জল বেরুল না। ভোর হয়ে এল। প্রথম সূর্যের লাল আভায় পাহাড়ের চূড়োটা রাঙা হয়ে উঠল। একদল মেয়ে চেনের দিকে এগিয়ে এসে বলল—'ডঃ পি, চেন, আমরা তোমার সাফল্য কামনা করি। জনগণ তোমায় চায় পি, চেন। তুমি ওদের মধ্য দিয়েই তোমার সমস্ত দুঃখ ভুলে যাবে। কাজের মধ্যে ডুবে গিয়ে তুমি আনন্দ পাবে চেন।'

চৌ-ও সেদিন এসেছিল চেনকে বিদায় জানাতে। চেন ওর দিকে মুখ তুলে তাকাতে পারেনি। চুপ করে দাঁড়িয়েছিল ওর পাশে। চৌকে দোষ দিতে পারে না চেন। তার বিরুদ্ধে কিছু বলারও নেই ওর। এখনও সে চৌ-কে ভালবাসে। মাথা নীচু করে ধীর পায়ে চেন গাড়িতে উঠে বসল। গাড়ি ছেড়ে দিল।

জীবনে সুখ দুঃখ চক্রাকারে আসে। কিন্তু সুখই জীবনে প্রাধান্য বিস্তার করে। পি, চেন গ্রামের একজন ডাক্তার হিসেবে তার কর্ম জীবন শুরু করল। যে গ্রামে তাকে পাঠান হয়েছিল চেন যাবার পর সেখানে প্রাণের স্পন্দন দেখা দিল। গ্রামের পরিবেশ আস্তে আস্তে পাল্টে যেতে লাগল। গ্রামের সর্বত্র পি, চেন ঘুরে বেড়ায়। কোথাও

সে ডাক্তার, কোথাও বা কমরেড। গ্রামের সবাই তাকে ভালোবাসে। গ্রামের লোকেরা পি, চেনকে শ্রদ্ধা করে ভালোবাসে। গ্রামবাসীর প্রাণোচ্ছল জাবনের মধ্যে মিশে গিয়ে সব দুঃখ ব্যথা ভুলে থাকতে চায় পি, চেন। দিন কেটে যেতে লাগল। একদিন চেন খবর পেল তাকে সাহায্য করতে একজন ডাক্তার তাদের গ্রামে আসছেন। নবাগত ডাক্তারকে অভ্যর্থনা জানাতে চেন ফেরিঘাটে এল। নৌকা থেকে ডাঃ চৌ-কে নামতে দেখে হতবুদ্ধি হয়ে পড়ে চেন। জীবনে অপ্রত্যাশিত ঘটনাগুলো কি বারবার এমনি ভাবেই ঘটে!

গ্রামে চলে আসার আগে পি, চেন মনস্থির করেছিল পুরনো দিনের সব কথা সে ভুলে যাবে। ফেলে আসা জীবন থেকে সরে এসেই সে জীবনের জটিলতা থেকে নিজেকে মুক্ত করতে পারে। জীবনের সামনে অনেক আনন্দ অনেক খুশী দাঁড়িয়ে আছে, তাকে সে সাদরে আহ্বান জানাতে চায়। শুধু ব্যর্থতা আর হতাশা নিয়ে মানুষ কি বাঁচতে পারে! কিন্তু ভাগ্যের কি নিদারুণ পরিহাস, যাকে এড়িয়ে যাবার জন্যে সে সুদূর গ্রামে চলে এসেছে, আজ সে-ই তার চোখের সামনে দাঁড়িয়ে। চেন ভালো করেই জানত আবার একসঙ্গে কাজ করার অর্থ, অসহ্য অসহায় প্রেমের বাঁধনে জড়িয়ে পড়া। একজন সহকর্মীর প্রয়োজন তার অবশ্যই আছে—কিন্তু তাকে চৌ-ই হতে হবে এমন কোন কথা নেই। আবেগের বহিঃপ্রকাশকে বাধা দিতে গিয়ে চেনের মুখে কথা হারিয়ে গেল। এই অস্বস্তিকর অবস্থার হাত থেকে অব্যাহতি পাবার জন্যে দুজনেই কথা বলতে চাইল—কিন্তু দু একটা কাজের কথা ছাড়া কোন কথাই ওরা বলতে পারল না। আপ্রাণ চেষ্টা করে চেন মন থেকে চৌ-এর সব চিন্তা ঝেড়ে ফেলে দিতে। কিন্তু অবাধ্য চোখ দুটো বারবার অনুসরণ করে ফেরে। চেন ভাবে এটা সে ঠিক করছে না। চৌ একজন ডাক্তার, জনগণের সেবা করাই তার একমাত্র লক্ষ্য, ব্যক্তিগত স্বার্থের গণ্ডিকে ডিঙিয়ে তা অনেক মহৎ কাজে উৎসর্গীকৃত।

চৌ-কে নিয়ে এমন চিন্তা করাও তাকে অসম্মান করা। জীবনের খুঁটিনাটি ব্যাপার দিয়ে তাকে বিচার না করে, বৃহত্তর স্বার্থের জন্য তার সাহায্য নিশ্চয়ই নেবে চেন।

একদিন রোগী দেখে বাড়ি ফেরার পথে প্রচণ্ড ঝড় বৃষ্টির মধ্যে পড়ে কোনক্রমে দৌড়তে দৌড়তে একটা চালা ঘরে এসে আশ্রয় নিল। অনেকক্ষণ পার হয়ে গেল, বৃষ্টি থামার কোন সম্ভাবনা নেই। এদিকে ক্রমশ অন্ধকার ঘনিয়ে আসছে। কি করবে চেন, কিছুই বুঝতে পারছে না। হঠাৎ হবাক হয় চেন, ডাঃ চৌ এই দিকেই এগিয়ে আসছে। মাথায় চাষীদের ডোঙা, হাতে ছাতা।

চৌ কাছে এসে চেনকে ডোঙা আর ছাতাটা দিল। তারপর নিজে কাকভেজা হয়ে চেনের সঙ্গে বাড়ির দিকে পা বাড়াল। নদীর কাছাকাছি পৌঁছতে বৃষ্টিটা একটু কমে এল—চারিদিক নিঃশব্দ, মাঝে মাঝে শুধু ঘরে ফেরা মোষেদের গলার ঘণ্টার টুংটাং আওয়াজ ভেসে আসছে। তুজনেই নীরব। চলতে চলতে কখন অন্যমনস্ক ভাবে চেন ঘাসের একটা শীষ ছিঁড়ে নিয়েছিল। হাতে নিয়ে সেটাকে টুক্‌রো টুক্‌রো করে ছিঁড়ে ফেলল। চেন-এর চোখ তুটো ব্যগ্র হয়ে ওঠে। কি যেন বলতে চায়। কিন্তু মনের কথা কিছুতেই ভাষায় প্রকাশ করতে পারে না সে। বাড়ির কাছে এসে সব বাধা কাটিয়ে হঠাৎ চেন মুখ ফুটে বলে ফেলল—'তোমার জামাটা আমায় দাও চৌ, আমি কেচে পরিষ্কার করে দেব, ভিজে একেবারে নোংরা হয়ে গেছে—'

এত কাছে থেকে এমন ভাবে দূরে দূরে আর থাকা যায় না, তাছাড়া সত্যি তো তাদের মধ্যে হৃদ্যতা আর বন্ধুত্বে কোন অভাব নেই, বাধাও নেই কোন। আস্তে আস্তে ডাঃ চৌ-এর সব কাজ নিজের হাতে তুলে নিল চেন। চৌ-এর জন্যে একটা সোয়েটার বুনতে শুরু করলো। প্রতিটি কাঁটা বোনা হত আর চেনের মন এক আশ্চর্য সুখানুভূতিতে ভরে উঠত। নিজেকে ধন্য মনে করত

চেন। কিন্তু অপর পক্ষের কঠিন নীরবতা ওকে বেদনাহত করত।

দক্ষতা এবং অভিজ্ঞতায় চৌ ডাক্তার হিসেবে চেনের চেয়ে বেশি এগিয়ে আছে। তার দক্ষতার সবটুকুই সে উজাড় করে চেনকে শেখাতে চায়। বাড়ির কাজে চেনকে নানাভাবে সাহায্য করে চৌ।

দুজনে খুব খোলাখুলি বন্ধুভাবে মিশলেও ডাঃ চৌ কোনদিনই চেনের সঙ্গে হোসিও চেনকে নিয়ে কোন আলোচনা করতো না। হোসিও চেনের কোন ছবি বা কোন চিঠি চেনের নজরেও কোনদিন পড়েনি। মনে মনে চেন ভাবতো, হোসিও চেন নিশ্চয় খুব সুন্দর মেয়ে। কিন্তু কখনো তার প্রতি কোন ঈর্ষা অনুভব করতো না। ক্রমশ চৌ এবং চেন সব কাজই প্রায় এক সঙ্গে করতে লাগল। গ্রামে মিটিং হলে দুজনেই একসঙ্গে তাতে যোগ দিতে যেত। অবসর সময়ে একসঙ্গে নদীর ধারে বেড়িয়ে আসত। কোন চাষীর বাড়ি গিয়ে এক কাপ চা নিয়ে দুজনে একসঙ্গে গল্প করত। মাঝে মাঝে মনটা বিদ্রোহ করত। কিন্তু চেন নিজের অবাধ্য মনটাকে সর্বদা বোঝাতো, সব সম্পর্কের ওপর সত্যিকার বন্ধুত্বের সম্পর্ক। সে সম্পর্ক সুন্দর এবং মঙ্গলময়। পর মুহূর্তে, চৌ-র সঙ্গে হোসিও চেনের অন্তরঙ্গ সম্পর্কের কথাটা যখন মনে হত ব্যথা পেত চেন। নিজের মনের আগুনে জ্বলে পুড়ে মরতো। তারপর ভাবতো এখনো তো সময় আছে, চৌ এখনো অবিবাহিত। পরক্ষণেই নিজের নির্লজ্জতায় দীনতায় নিজেই লজ্জা পেত চেন। চৌ-কে এত হাল্কা ভাবে বিচার করা সত্যিই অন্যায়।

মনের আগুনের জ্বালা বাইরের হাসি দিয়ে ঢেকে রাখত চেন। বাস্তবের সেই নিষ্ঠুর দিনটার কথা ভেবে নির্ভয়ে হেসে উঠত চেন। সেদিন তো এগিয়ে আসবেই, চৌ যেদিন হোসিও চেনকে তার একান্ত আপন করে নেবে। ঘাটের ওপর স্থানুর মতো বসে আছে চেন।

দু'গাল বেয়ে অঝোরে ঝড়ে পড়ছে চোখের জল। অবুঝ মনটা কিছুতেই বোঝ মানতে চায় না যে!

তবু সহ্য তো একজনকে করতেই হবে—হয় চেন নয় হোসিও। কিন্তু না, চেনকেই মেনে নিতে হবে সেই অমোঘ বিধান। হোসিওর সুখ সে কেড়ে নিতে পারে না, কেড়ে নেবার তার কোন অধিকারও নেই। কিন্তু তবু তাকে তো বাঁচতে হবে? বাঁচবে সে কেমন করে? নিজের প্রশ্নের জবাব নিজেই খুঁজে পায় না চেন। পৃথিবীতে এমন কোন প্রাণী আছে যে চৌ-কে তারচেয়ে বেশি ভালবাসে? এমন কি হোসিও-ও? কিন্তু তবু তাকে নিজেকে লুকিয়ে নিয়ে পালাতে হবে? কেন? তাকে বিয়ে করলে চৌ সবচেয়ে সুখী হবে, একথা চেনের চেয়ে আর ভাল করে কে জানে। হঠাৎ লাফিয়ে ওঠে চেন। মনের সব দ্বিধা দ্বন্দ্বকে ঝেড়ে ফেলে সোজা ছুটে যায় চৌ-এর সঙ্গে দেখা করতে।

দরজার সামনে গিয়ে থামতেই ভেতর থেকে ডাঃ চৌ-র গম্ভীর গলা শোনা গেল···

'কে ওখানে?'

'আমি, চেন।'

'একি! তুমি? এত রাতে? ঘুমোও নি?'

'ঘুমোতে পারছি না চৌ। তুমি কি করছ?'

হালকা হলুদ রঙের আলোতে টেবিলের ওপর পড়ে থাকা একটা চিঠি আর ঘড়িতে হেলান দিয়ে রাখা হোসিওর ছবিটাকে পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে। সুশ্রী, গালে টোল পড়া মুখশ্রী—মাথায় নার্সের টুপি। মুখে মৃদু হাসি নিয়ে তার দিকে তাকিয়ে আছে হোসিও।

'এইমাত্র হোসিওর চিঠি পড়ে জানলাম, ওর হাসপাতাল তাকে আমার সঙ্গে কাজ করতে পাঠাতে ইচ্ছুক,' খুশি মুখে উত্তর এল ডাঃ চৌ-র কাছ থেকে। যদিও নিজের এই সহজ উক্তিতে পরক্ষণেই অনুভবের স্নিগ্ধতায় লজ্জায় রাঙা হয়ে উঠল চৌ।

'তুমি খুব খুশী তাই না চৌ?' চেন প্রশ্ন করল।

'নিশ্চয়, আমি খুব খুশী।' উজ্জ্বল চোখে তাকাল চৌ। মধুর অনুভবের স্নিগ্ধতা তার সারা মুখে।

চেন ওর নরম সুন্দর চুলগুলো দিয়ে ওর লজ্জাকে আড়াল করতে চায়। নিজের প্রশ্নের ছেলেমানুষির হাত থেকে বাঁচতে চায় চেন। চেনের এই পরিবর্তন লক্ষ্য করল চৌ। কিছু না বলে চকিতে ঘর ছেড়ে চলে গেল চেন।

পুকুরের ধারে গিয়ে দাঁড়াল চেন। পদ্মপাতায় শিশির বিন্দু থির থির করে কাঁপছে। চারিদিকের নিঃশব্দতাকে খান্ খান্ করে ব্যাঙের কর্কশ ডাক ভেসে আসছে। হৃদয় নিঙড়ানো কান্না তু'গাল বেয়ে গড়িয়ে পড়ছিল চেনের! আকাশে চাঁদ উঠেছে। চেন নিজেকে সংযত করে। কোন রকমে দেহটাকে টেনে নিয়ে আবার সে চৌ-এর ঘরের দিকে এগোতে থাকে।

'চৌ তেং সান্, আমার সমস্ত হৃদয় জুড়ে যে গভীর বিহ্বলতা আকুল হয়ে কেঁদে মরছে তা তোমায় বলতে চাই---' সব কথা খুলে বলে চেন।

চেনের হাতটা নিজের হাতের মধ্যে নিয়ে চৌ মৃত্থ ভাবে চাপ দিল। ওর মুখটা ফ্যাকাশে হয়ে গেছে। চোখ তুটো এক তীব্র বেদনার যন্ত্রণায় ক্লান্ত। ক্লান্ত চোখে প্রত্যাখ্যানের আহত দৃষ্টি। শ্বাসরুদ্ধ এক নিস্তব্ধতা ছেয়ে ফেলে সেই মুহূর্তটাকে।

মানসিক দ্বন্দ্বে ক্ষত বিক্ষত চৌ। কেমন করে সে বোঝাবে চেনকে, তার ইচ্ছেটা আজ আর শুধু তার হাতে নেই। চেনকে সে আর ভালবাসতে পারে না। হোসিও-ও তাকে ভালবাসে সমস্ত হৃদয় দিয়ে। আজ যদি হোসিওকে সে তার জীবন থেকে চলে যেতে বলে তাহলে জটিলতা আরো তীব্রতর হবে। হোসিওকে দূরে ঠেলে দিয়ে সে মরেও শান্তি পেতে পারে না। চেনও কি সুখী হতে পারবে তাতে? ভালবেসে মানুষকে তুঃখ দেওয়া কি যায়?

দুজনেই মূক। নিস্তব্ধতাকে ভেদ করে শুধু ঘড়ির কাঁটা এগিয়ে চলে।

পি, চেন কথা বলতে গিয়ে থমকে থেমে গেল! হোসিও চেনের হাসি মাখানো ফটোটা তার দিকে চেয়ে আছে। মাথা নীচু করে রইল চেন। মুখ দিয়ে ওর কোন কথা বেরোল না। চেনের মনে পড়ল চৌ তাকে একদিন বলেছিল চেনের কাছে চৌ-এর ভালোবাসা যখন প্রত্যাখ্যাত হল তখন তার সেই দুঃসহ মানসিক অবস্থায় হোসিও চেন তার ভালোবাসা নিয়ে হাসিমুখে অভ্যর্থনা জানিয়েছিল চৌ-কে। শুধু দয়া বা সহানুভূতি নিয়ে হোসিও তাকে বিয়ে করতে চায়নি। তার অন্তরের গভীর ভালোবাসা দিয়েই সে চৌ-কে আপন করে নিয়েছিল। চৌ-এর আহত চোখ ওর অনুভূতিকে গ্রাস করতে পারেনি। সত্যি হোসিও চেন চৌ-কে ভালবাসে। আর কাউকেই সে ভালবাসতে পারে না···

আস্তে আস্তে মুখ তোলে চেন। তারপর চৌ-এর দিকে তাকিয়ে বলে—'হোসিও-র সুখকে কেড়ে নেবার কোন অধিকার তোমার নেই চৌ—তোমার প্রতি ওর ভালোবাসা আমার চেয়ে কিছু কম নয়।'

হঠাৎ বাইরে থেকে একটা আর্ত চিৎকার ভেসে এল। 'ডাঃ ইয়, ডাক্তার ইয়সিন্ এখানে আছেন—।' সে ডাকে ঘরের দেওয়াল-গুলো যেন কেঁপে কেঁপে উঠল। ছুটে গিয়ে চেন দরজা খুলে দিল। দরজার ওধারে এক যুবক দাঁড়িয়ে। চেনকে দেখেই ওর হাত দুটো ধরে উত্তেজিত ভাবে যুবকটি বলল—'ডাঃ ইয়, সু, মী মরতে বসেছে—ওকে আপনি বাঁচান।'

'হা ঈশ্বর—'চেন অস্ফুটে বলে ওঠে—তারপর যুবকটিকে বলে, 'আপনি একটু অপেক্ষা করুন আমি এখুনি আসছি।'

ঘরের মধ্যে গিয়ে চৌ-এর ব্যাগটা নিয়ে বেরিয়ে আসতে আসতে চেন বলল—'চৌ, আমি রুগী দেখতে যাচ্ছি, তোমাকে আর আসতে হবে না।'

তিং-সান ইতস্ততঃ করছে দেখে চেন বলল—'কিছু মনে করোনা, সহজ ভাবেই নিও ব্যাপারটাকে।'

নৌকায় যেতে যেতে আবছা ভাবে মনে পড়ল চেনের সু, মী-র সঙ্গে প্রথম আলাপের দিনটার কথা। সেদিন ও বাড়ি ফিরবে বলে খেয়াঘাটে এসে হাজির হয়েছিল। ঘাটে এসে দেখল কেউ কোথাও নেই। অসহায় ভাবে ভাবতে লাগল চেন, কেমন করে এখন বাড়ি ফিরবে সে। দূর থেকে ভেসে আসা কুকুরের ডাককে অনুসরণ করে চেন জেলেদের পট্টিতে এসে হাজির হল। একটা চালাঘরের সামনে এসে দেখল ঘর থেকে এক চিলতে আলো বেরিয়ে আসছে। চেন ডাক দিতেই একটি ট্যোলিস মেয়ে বেরিয়ে এল। এরই সাহায্যে সেদিন চেন বাড়ি ফিরতে পেরেছিল। সেদিনের সেই মেয়েটিই আজকের সু, মী। সু, মী একদিন চেনকে ওর কথা বলেছিল। ও হী নী-কে ভালবাসে। ওদের বিয়েও হবে খুব শিগ্‌গির। চেনকে আমন্ত্রণ জানিয়েছিল সু, মী ওদের বিবাহ বাসরে আসতে। হী, নী-ই আজ এই মর্মান্তিক সংবাদ নিয়ে তার কাছে হাজির হয়েছে! হী, নী-র মুখের দিকে তাকাল চেন। ভয়ে দুর্ভাবনায় ওর মুখটা বিষণ্ণ হয়ে উঠেছে। উত্তেজনায় সারা মুখে বিন্দু বিন্দু ঘাম জমে উঠেছে। পি, চেনের বার বার মনে হতে লাগল, আজ তারই হাতে দুটি উজ্জ্বল তরুণ তরুণীর সম্ভাবনাময় ভবিষ্যৎ জীবন নির্ভর করছে। দায়িত্ব তার বড় কম নয়। তাড়াতাড়ি পৌঁছনর জন্য অধীর হয়ে উঠল চেন।

নৌকাটা সামনের দিকে তরতর করে এগিয়ে যাচ্ছে। পাশের শান্ত গ্রামটা অন্ধকারের কোলে যেন মুখ গুঁজে পড়ে আছে। দু'ধারে গাছগুলো যেন বিষন্ন মুখে থমকে দাঁড়িয়ে আছে। বাতাস ভেদ করে কার যেন কান্না ভেসে আসছিল। বার বার চিৎকার করে কুকুরগুলো যেন সতর্কবাণী উচ্চারণ করছিল।

হী, নী-র সঙ্গে সু, মী-র বাড়ির দোরগোড়ায় এসে দাঁড়াল চেন।

দরজার সামনে দুহাতের মধ্যে মুখ গুঁজে কাঁদছিল একটি মেয়ে, ওদের আসতে দেখে মুখ তুলে মেয়েটি বলল—'সু, মী—নেই।'

যন্ত্রণায় ডুকরে ওঠে পি, চেন। একরাশ দমকা বাতাসের মতো বেগে ঘরের মধ্যে ঢুকলো হী, নী। সু, মী-র মা অচৈতন্য অবস্থায় ঘরের মেঝেতে পড়ে আছে। সু, মী তখনও বিছানায় পড়ে। ওর চুলগুলো অবিন্যস্ত ভাবে ছড়িয়ে পড়ে আছে সাদা বালিশটার ওপর। মুখটা পাণ্ডুর।

হী, নী চিৎকার করে ডুক্‌রে ওঠে—'আমাদের এমন ভাবে ভয় দেখাচ্ছ কেন সু, মী?'

শান্ত সংযত ভাবে পি, চেন একটার পর একটা পরীক্ষা চালিয়ে যেতে লাগল। নাড়ী টিপে দেখল, মৃত্যু শীতল স্তব্ধতায় তার গতি নিস্পন্দ। স্থির নিস্পলক দৃষ্টি। সারা দেহ জুড়ে শুধু মৃত্যুর শীতলতা।

অনেকক্ষণ ধরে অনেক চেষ্টা করার পর সু, মী-র দেহটা একটু নড়ে উঠল। বুকে কান পেতে কি যেন শুনতে চাইছে চেন। মনে হল ও যেন কোন কিছু আবিষ্কার করেছে। অনেক দূর থেকে ভেসে আসা জীবনের কলধ্বনি—ক্ষীণ, দুর্ব্বল, তবু প্রাণ স্পন্দনের সাড়া মিলেছে। সু, মী ধীরে ধীরে সুস্থ হয়ে উঠল। ঘাড় তুলে তাকিয়ে দেখতে লাগলো হী, নী-কে। পি, চেনের চোখ দুটো আনন্দের আতিশয্যে জলে ভরে ওঠে। সত্যি আজ সে দুটো জীবনকে সুখী করতে পেরেছে। পি, চেনও আজ সত্যি সুখী। কোন গ্লানি নেই আজ আর তার জীবনে। ওর দু'গাল বেয়ে চোখের জল গড়িয়ে পড়তে লাগল। হঠাৎ সম্বিৎ ফিরে পায় চেন——সু, মী-র মা তার পাশে বসে চেনকে আদর করে বললেন—'সোনা মেয়ে, ধন্যবাদ তোমায়, ধন্যবাদ তোমার মা, বাবাকে যারা তোমাকে সার্থক ভাবে মানুষের মতো করে গড়ে তুলেছেন।' কৃতজ্ঞতায় ওঁর চোখ দুটো প্রশান্ত হয়ে ওঠে।

ওষুধের বাক্সটা গুছিয়ে নিয়ে ফেরার জন্যে তৈরি হল চেন। দরজার কাছে এসে একবার পেছন ফিরে ঘরের সবাইকে দেখে নিল শেষ বারের মতো। সু, মী শান্তভাবে গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন। ওর ঠোঁট দুটোয় জড়িয়ে আছে স্নিগ্ধ হাসি। সুন্দর চুলগুলো বালিশের চারদিকে ছড়ানো। সু, মী-র মা ওর মুখের দিকে এক দৃষ্টে তাকিয়ে বসে আছেন। হী, নী-র চোখ দুটোয় ফুটে উঠেছে কৃতজ্ঞতা আর ভালবাসার দৃষ্টি। হী, নী-র দিকে তাকিয়ে স্নিগ্ধ মুখে হাসে পি, চেন। চেনের আজ মনে হচ্ছে এত বড় পৃথিবীটায় সেই বোধহয় একমাত্র সুখী মানুষ।

চেন বাড়ি ফিরছিল। সকালের শুকতারা জ্বলজ্বলে চোখ মেলে চেয়ে আছে ওর ফেরার পথে। নতুন এক ভাবনায় আচ্ছন্ন হয়ে পড়ে চেন। হোসিও চেন সত্যি এখন কি করছে! ভাবতে চেষ্টা করে চেন—হোসিও হয়তো তার নতুন জীবনের আনন্দঘন দিনগুলো নিয়ে রঙীন স্বপ্ন দেখছে, সুখী সুন্দর এক জীবনের স্বপ্ন। যে হাতে চেন মৃত্যুর শীতল গহ্বর থেকে একটা প্রাণকে টেনে তুলে নিয়ে এসে জীবনের পথে সচল করতে সক্ষম হয়েছে, সেকি সেই হাতে অন্য কারো মধুর স্বপ্ন ভেঙে দিতে পারে! সে কি একজনের সুন্দর সুস্থ জীবনকে নষ্ট করে দিতে পারে!

চাঁদ ডুবে গেছে। চেন ধীরে ধীরে ঘরে ঢুকল। স্নিগ্ধ শীতল হাওয়া পরশ বুলিয়ে যাচ্ছে ওর গায়ে। বন্ধ জানালার শার্সি বেয়ে একটা আলোর ধারা ঘরে এসে পড়ছিল—চৌ-সিং তানের ঘরে তখনও আলো জ্বলছে।

জানলার কাছে পায়ে পায়ে এগিয়ে যায় চেন। কাঁচে টোকা দিতে গিয়ে দেখে, টেবিলের পাশে স্থির হয়ে উলটো দিকের দেওয়ালে চোখ রেখে বসে আছে চৌ। টেবিলের ওপর একটা চিঠি আর ফটো। বিমর্ষ মুখ, ক্লান্ত দেহ, চেন বুঝতে পারে একটা মানসিক যন্ত্রণায় চৌ-এর হৃদয় ছটফট করে মরছে।

প্রতিটি মুহূর্তেই যার যন্ত্রণায় সে ক্ষতবিক্ষত হচ্ছে, কেন তাকে চেন এক অনিশ্চয়তার জালে জড়িয়ে রাখবে। এ অন্যায়, অমানবিক! আস্তে আস্তে ঘরের দরজা খোলে চেন।

চেনকে দেখেই চৌ চমকে ওঠে তারপর নিজেকে সামলে নিয়ে বলে—'তোমার রোগী কেমন আছেন চেন?' রাত্রি জাগরণে তন্দ্রাহীন রক্তাক্ত চোখ। ক্লান্ত মুখ।

পি, চেন মৃদু হেসে বলল—'প্রথমে আশা ছেড়েই দিয়েছিলাম। পরে কিন্তু সত্যি তাকে সুস্থ করে তুলতে সক্ষম হয়েছি।' সংক্ষেপে সমস্ত ঘটনা আনুপূর্বিক বর্ণনা করে গেল চেন। ভাল করে সতর্ক দৃষ্টিতে চারদিকে তাকিয়ে দেখল একবার। অব্যবহৃত বিছানা, চৌ সারারাত জেগেই কাটিয়েছে। চিঠিটা ওরই দেওয়া। পথের আলোয় যেটা চৌ-কে সে লিখেছিল তার অন্তরের আকুতি জানিয়ে! ফটোটা হোসিও চেনের।

হঠাৎ খুশি হয়ে ওঠে চেন। চৌ-এর দিকে তাকিয়ে বলল—'তিং সান, সকাল হয়ে গেছে। এসো, বাঁধাছাদা সব সেরে ফেলি। যাবার সময় হয়ে এল, সময় তো আর বেশী নেই।' এ যেন আর এক পি, চেন। উজ্জ্বল প্রশান্ত দুটো চোখ, স্নিগ্ধ কল্যাণময়ী মুখ। কোথাও কোন উত্তেজনার ছায়া নেই।

চৌ তিং সান্ থমকে গেল—চেনের হঠাৎ এই পরিবর্তনের কারণ কি!

সংযত ধীর স্বরে চেন বলতে লাগল—'চৌ, এমন কিছু কথা আছে যা বলে ঠিক বোঝান যায় না, তবু বলি আমি তোমায় চেয়েছিলাম, সত্যি চেয়েছিলাম, কিন্তু চেয়ে ভুল করেছিলাম। সেটা সম্পূর্ণ আমারই দোষ—।' মুহূর্তের জন্য একবার হোসিও-র গালে টোল-পড়া ছবিটার দিকে তাকাল চেন। এবার সে সত্যি নিশ্চিন্ত। সে সু, মী-র জীবন বাঁচিয়েছে। সু, মী-কে বাঁচাতে গিয়ে চেন বিরাট শিক্ষা লাভ করেছে—জীবন বড় সুন্দর আর মূল্যবান। শুধু নিজের

ভালোলাগা দিয়ে আর একজনের জীবনকে অহেতুক নষ্ট হতে দেওয়া উচিত নয়। তাছাড়া চেন একজন দায়িত্বশীল ডাক্তার। মানুষকে রোগমুক্ত করে শান্তি দেওয়া, সুখী করাই তার ধর্ম। তার জন্য চেন গর্বিত। সাধারণ মেয়েদের মতো নিজের সুখের জন্য অন্যাকে অসুখী করা তার পক্ষে সম্ভব নয়। 'হোসিও চেন বড় ভাল মেয়ে, তার সুখী হবার অধিকার আছে। কারো ক্ষমতা নেই তাকে অসুখী করে।'——একটানা কথাগুলো বলে চুপ করে চৌ এর দিকে তাকিয়ে রইল চেন।

আবেগ জড়ানো গলায় চৌ ডাকলো—'পি, চেন!'

'আমি ঠিক আছি তিং সান্'—চৌ তিং সান-কে থামিয়ে দিয়ে চেন বলে চলল– 'আমার কথা ভেবনা চৌ, আমায় নিয়ে ভেবে ভেবে অকারণ নিজেকে আর কষ্ট দিও না—আমি ভালই আছি, ভালো থাকবোও। সব দ্বিধা দ্বন্দ্বের হাত থেকে আমি আজ মুক্ত চৌ, তোমাদের দুজনের জন্য আজ আমি আনন্দিত। তোমরা সুখী হও।'

'তুমি অতুলনীয়া চেন——তোমাকে আমি চিরদিন মনে রেখে দেব।' আবেগে ঠোঁট দুটো কেঁপে ওঠে চৌ-এর। কিন্তু চেন, তুমি যত সহজে এটাকে মেনে নিলে আমি তা পারলাম না। তবু তোমায় ধন্যবাদ জানাই, আমার অন্তরের অন্তঃস্থল থেকে তোমায় ধন্যবাদ জানাই চেন।'

আজ পি, চেন সব আবেগকে জয় করতে পেরেছে, কেননা সে এখন একজন দায়িত্বশীল ডাক্তার, যুব লীগের কর্তব্য পরায়ণ সদস্যা। সব কিছুর বাইরে বৃহত্তর জীবনের ডাক তাকে আকুল করে। কিন্তু একদিন তার প্রাণের আবেগ তাকে ঘিরেই আকুল হত, তাই সেদিন আজকের মতো সে সুখী হতে পারেনি।

* * *

পি, চেন আর চৌ খেয়াঘাটে এসে যখন পেঁছিল তখন নতুন দিনের সূর্য তটরেখাকে রক্তিম করে নদীর বুক থেকে উঠে আসছিল।

সূর্যের প্রথম আলো পি, চেনের মুখের ওপর পড়ে ওর মুখটাকে উজ্জ্বল করে তুলেছে। সেই উজ্জ্বল মুখের দিকে তাকিয়ে আনন্দে চৌ-এর সমস্ত হৃদয়টা ভরে উঠল।—'বিদায় তিং—সান্। তোমার যাত্রা নিরাপদ আর শুভ হোক্।' স্নিগ্ধ হাসি দিয়ে বিদায় জানাল চেন।

'বিদায় পি, চেন—-—চির সুখী হও।' অস্ফুট কটা শব্দ বেরিয়ে এল চৌ-এর মুখ থেকে। হাত তুটো দিয়ে পরম আন্তরিকতায় চেনের হাত তুটো চেপে ধরল চৌ-তিং সান। বোবা দৃষ্টি মেলে পরস্পর পরস্পরের দিকে চেয়ে আছে। চৌ বলল—'তোমার মত সুন্দর মেয়ে কোনদিনই অসুখী হবে না চেন—তুমি সুখী হবে---নিশ্চয় সুখী হবে—'

নদীর স্রোতে গা ভাসিয়ে পাতার মতো ভেসে গেল নৌকাটা-- কিছুক্ষণের মধ্যেই চোখের আড়ালে চলে গেল। সকালের সূর্যের আলোয় মাছধরা জালগুলোর ছায়া নদীর বুকে পড়ে মাকড়শার জালের মতো শোভা পেতে লাগল।

অনুবাদ | রবীন ভাতুড়ী

সাও

অজ্ঞাত

বন্দী লোকটা প্রায় ছ' ফুট তিন ইঞ্চির মত লম্বা। লোকটার সুন্দর কোঁকড়ানো চুল, গভীর নীলচে ছাই রঙের চোখ, চওড়া কপাল আর দু'দিনের না কামানো দাড়ি। দেখে মনে হচ্ছিল ওর বয়স সরকারী হিসেব মতো বাইশ বছরের থেকে বেশীই হবে।

পাঁচজনের বন্দীর দলটার মধ্যে ছিল আদিওত্তি—ইতালীয়, আল্পসের একটা ছোটো গ্রামের বাসিন্দা; পিয়ের—ফরাসী, লয়ার অঞ্চলে চাষ আবাদ আছে; মহম্মদ—মরোক্কোর লোক; হেক্‌তমাদ—জার্মান, হামবুর্গের বাসিন্দা এবং আগে যার কথা বলা হয়েছে সেই লোকটি। প্রথম দর্শনেই আমরা তার প্রতি বেশ আকৃষ্ট হয়েছিলাম, কিন্তু এ ধরনের অনুভূতির কারণ কি জানি না। সম্ভবতঃ লোকটা অন্যদের থেকে লম্বা ছিল বলে, অথবা পাঁচজনের দলটার মধ্যে বয়সে সবচেয়ে ছোটো ছিল বলে, অথবা তার একগুঁয়েমির জন্য, অথবা সে একজন বিমান চালক বলে,—ঠিক কোন্‌টা তা আমরা জানি না।

তার সঙ্গে রক্ষীর হাতে কাগজে তার বর্ণনা ছিল অল্প কয়েক লাইনে—'দে লাবেরী, ৪ঠা আগষ্ট ১৯৩১ সালে একজন পদস্থ কর্মচারীর পরিবারে প্যারিসে জন্ম; আইনের ছাত্র; ১৯৫০ সালে

বিমান চালনায় শিক্ষণপ্রাপ্ত ; ১৯৫২-র ফেব্রুয়ারীতে ভিয়েতনামের মাটিতে অবতরণ করে।' সে বন্দী হয় ভিয়েতনামে আসার পাঁচমাস পরে।

থাচ আর আমার ওপর দায়িত্ব ছিল ঐ পাঁচজন বন্দীকে সঙ্গে করে কুয়াং ইয়েন থেকে থাই ন্‌গুয়েনে নিয়ে যাওয়া। দু'দিন পর থেকে লাবেরী ছাড়া সবাই আমাদের সঙ্গে কথা বলতে শুরু করে। লাবেরী সব সময় সকলের পিছনে, অনেক দূরে থাকত। তার পিঠে থাকত একটা মার্কিনী ন্যাপস্যাক আর পাঁচটা নেসলের দুধের কৌটো ভর্তি একটা ব্যাগ তার কাঁধে দুলত।

আমাদের কথাবার্তায় কোনোরকম কান না দিয়ে সে ক্রমাগত একটা দুধের টিন চুষতে চুষতে হাঁটত। মাঝে মাঝেই তার সঙ্গীরা তার দিকে লোভাতুর চোখে তাকাতো, কিন্তু সে তাদের খেয়ালই করতো না। থাচ একদিন রেগে লাফিয়ে উঠলো, 'দাঁড়াও, ওকে আমি দেখে নেব। লাবেরী! এসো! এদিকে এসো!'

ফরাসী বন্দীটি মাথা তুলে তাকালো, তার হাত দুধের ব্যাগের ওপর রেখে পা ঘষে ঘষে এগিয়ে এল। থাচ ক্রুদ্ধ কণ্ঠে বলল, 'দেখেছো, ও কাউকে পাত্তাই দেয় না। এই লোকটা ভালো কথার মানুষ নয়।'

থাচের মন খুব বিষন্ন হয়ে ছিল। তার মা, স্ত্রী আর সন্তান ট্রেঞ্চে বোমা পড়ায় ছিন্নভিন্ন হয়ে গেছে। থাচ বাড়ি ফিরে কেবল তিনটে তরতাজা কবর দেখতে পেয়েছে।

আমি খুব ভালোভাবেই জানি থাচ প্রাণপণে রাগ চাপার চেষ্টা করছে।

আমিও এই উদ্ধত যুদ্ধ বন্দীটিকে সহ্য করতে পারছিলাম না। তাই রুক্ষভাবে বললাম, 'আপনাকে আরো পা চালিয়ে আসতে অনুরোধ করা হচ্ছে, হুজুর।'

আমাদের অনুপস্থিতিতে লাবেরী অনেক বেশী প্রাণোচ্ছল

থাকতো। একবার হেক্‌তমাদ আমাকে চুপি চুপি বললো, 'আমরা আমাদের সৈনিকসুলভ আচরণ হারিয়ে ফেলেছি আর এই হলুদ চামড়া লোকগুলোর কাছে আত্মসমর্পণ করেছি বলে লাবেরী আমাদের বক্তৃতা দিচ্ছিল।'

লাবেরী একবার মহম্মদকে ঘুষি মারলো।

আমি চেঁচিয়ে উঠলাম, 'লাবেরী!' তার উত্তরের অপেক্ষা না করেই তার দিকে তেড়ে গেলাম। সে অ্যাটেন্‌শনে দাঁড়িয়ে সেলাম ঠুকে বললো, 'ক্যাপ্টেন?'

আমি বললাম, 'তুমি এক্ষুণি কি করলে?'

সে লজ্জিত হয়ে আমার ক্রুদ্ধ দৃষ্টি এড়াতে মাথা নিচু করল।

'মহম্মদের ন্যাপস্যাকটা বয়ে নিয়ে চল।'

মরোক্কোর লোকটি আমার দিকে সম্ভ্রমের দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল। লাবেরী জোর করে তার ন্যাপস্যাকটা ছিনিয়ে নিল এবং আরো চুপচাপ হয়ে গেল।

সেদিনটা ছিল প্যাচপেচে গরম। পথের ধারে গাছের সারি রোদের তাপে বিবর্ণ। সূর্যরশ্মি গাছের পাতার মধ্যে দিয়ে সোনালী বিন্দুর মত আমাদের চোখ ধাঁধিয়ে দিচ্ছিল।

লাবেরী হাঁ করে দম নিচ্ছিল।

আমরা একটা সরু রাস্তায় পৌছে দেখলাম লাবেরী একাই একটা চায়ের দোকানে বসে বিশ্রাম নিচ্ছে। সে আমাদের আসতে দেখে অস্বস্তিতে একটা বোতল পিছনে লুকিয়ে ফেলল।

'মদ?' আমি অবাক হয়ে প্রশ্ন করলাম।

আমি ওর কব্জির দিকে তাকিয়ে সোনার ঘড়িটা আর দেখতে পেলাম না। ঘড়ি দিয়ে পানীয়ের দাম দিয়েছে বলে বুঝতে পেরে আমার করুণা হল। আমি দামটা দিয়ে দিলাম আর চায়ের দোকানের মালিককে ওর ঘড়িটা ফেরত দিতে বললাম। লাবেরী চোখ বড় করে আমার দিকে তাকিয়ে শ্রদ্ধাভরে করমর্দন করল।

'আপনি কেন এটা করলেন, আমি বুঝতে পারছিনা ক্যাপ্টেন। আপনাকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি।'

'তুমি কি পানে অভ্যস্ত, লাবেরী?'

'ওটাই আমার দোষ।'

'এরকম আর কোরো না।' আমি গম্ভীরভাবে বললাম।

সে মাথা নত করে চটির ডগাটা দিয়ে মাটিতে আঁচড় কাটতে লাগলো।

'একটা সোনার ঘড়ির বদলে এক বোতল মদ?' আমি কাঁধ ঝাঁকিয়ে বললাম।

'দেখুন—একজন যখন অভাবে পড়ে—— এই ঘড়িটা মা আমাকে ভিয়েৎনামে আসার আগে দিয়েছিলেন।' লাবেরীও কাঁধ ঝাঁকিয়ে উত্তর দিল।

আমি ব্যঙ্গভরে হাসলাম—'তার মানে এটা একটা স্মৃতিচিহ্ন বলো। তুমি চমৎকার লোক তো হে!'

'আমি জানি আমি ঠিক করিনি। কিন্তু আমার কোন উপায় ছিল না।'

ও এবার ওর পরিবারের গল্প বলল। প্যারিসে ওর মার আর ছোট বোনের সঙ্গে ও থাকতো। বন্দী হবার আগে প্রতি সপ্তাহে তাদের কাছ থেকে একটা করে চিঠি পেয়েছে—'শরীরের যত্ন নিও, তাড়াতাড়ি ফিরে এসো।'

লাবেরী দুঃখের সঙ্গে বললো, 'পাঁচ মাস পার হয়ে গেছে। কিন্তু আমার মনে হয় এই সময়টুকু যেন একটা শতাব্দী।'

'তোমার বোধহয় প্যারিসের জন্য মন কেমন করছে।'

লাবেরী দূরের দিকে তাকালো, আমার প্রশ্নের কোন সোজাসুজি উত্তর দিল না। 'গ্রীষ্মকালে আমরা মেইন নদীর তীরে বেড়াতাম। মা আমাকে খুব আদর করতো কিন্তু আমি ক্ষেপে যেতাম। মা আমাকে একেবারে বাচ্চা মনে করতো।'

সুদূর পশ্চিমের সুদৃশ্য শহরের আনন্দময় দিনগুলোর কথা স্মরণ করছিল লাবেরী। তার মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠছিল।

এই বন্দীগুলো অসম্ভব টাকা ওড়াতো। লাবেরী একটা পুরো মুরগী একাই খেতে পারতো। সারা দিনের বরাদ্দ পাঁচটা সিগারেট সে সঙ্গে সঙ্গে খেয়ে ফেলতো। একবার আমি একটা পোড়া সিগারেটের টুকরো ফেলে দিয়েছিলাম। পিয়ের সেটা তুলে নিয়ে একটা লম্বা টান লাগাল। লাবেরী কিন্তু মুখ ঘুরিয়ে নিয়েছিল।

আমি লাবেরীর দিকে একটা সিগারেট ছুঁড়ে দিলাম। সে সেটা সোজা করে নিল, ঠোঁটের ফাঁকে রেখে হাত মেলে আমার দিকে করুণ চোখে তাকালো। ওকে আমি এবার দেশালাইটা ছুঁড়ে দিলাম। সিগারেটটা ধরিয়ে লাবেরী আমাকে ধন্যবাদ দিল।

আমরা আবার হাঁটা শুরু করলাম। আমাদের আগে আগে খয়েরী জামা আর কালো প্যান্ট পরা একটি তরুণী একটা বিরাট ব্যাগ নিয়ে অস্বস্তির সঙ্গে হাঁটছে। সূর্যের আলোয় তার সাদা তালপাতার টুপি চক্‌চক্ করছে।

'দেখ, 'পুতুল প্রশাসনে'র অধিকৃত এলাকার মেয়ে।' আমি থাচকে বললাম।

তাড়াতাড়ি পা চালিয়ে মেয়েটির কাছে এসে দেখলাম তার বয়স এখনো বছর কুড়ি পেরোয়নি। চোখের পাতা খুব লম্বা ও বাঁকানো। রোদ লেগে গাল দুটো রক্তিম হয়ে গেছে, ঘামে ভেজা চুলগুলো তার চওড়া কপালের ওপর পড়েছিল।

মনে হল মেয়েটিকে কোথাও যেন দেখেছি। কিন্তু কিছুতেই মনে করতে পারলাম না।

মেয়েটি যুদ্ধবন্দীদের দিকে অবাক দৃষ্টিতে তাকাল, তার হাঁটার গতি মন্থর হয়ে এল। সম্ভবত ভয় পেয়েছে, আমিও আমার গতি

কমালাম। ব্যাগটার প্রচণ্ড ভারে তার কাঁধ নুয়ে গিয়েছে। পাতলা খয়েরী জামার উন্মুক্ত প্রান্ত দিয়ে সাদা অন্তর্বাসটা দেখা যাচ্ছে, দৃঢ়গঠিত বক্ষের ওপর চেপে বসেছে জামাটা।

যুদ্ধবন্দীরা তাদের চলার ক্লান্তি ভুলে খোশমেজাজে গল্প করতে শুরু করল। কেবল লাবেরী মদের ঝোঁকে ঝিম মেরে একটাও কথা বলছিল না।

মেয়েটি তার গতি আরো শিথিল করে ভুরু কুঁচকে তাকাল। আমি সাহস ভরে কথা বলতে শুরু করলাম, 'মনে হচ্ছে তোমাকে কোথাও দেখেছি।'

মেয়েটি আমার দিকে তাকিয়ে বলল, 'আপনি কি তান্?'

অবাক হয়ে বললাম, 'হ্যাঁ, তুমি কি করে জানলে?'

'আপনি একবার আমার বাড়ি এসেছিলেন', খুশী ঝরে পড়ল তার কণ্ঠস্বরে।

'তুমি কি থুই ন্‌গুয়েন থেকে আসছো?'

'না।'

'তাহলে আমি ভুল করেছি।'

মেয়েটি এবার মুখ ঘুরিয়ে আমার দিকে তাকিয়ে হাসল, 'হ্যাঁ, হ্যাঁ,—আমি থুই ন্‌গুয়েনেই থাকি। আপনি চাউ-এর সঙ্গে এসেছিলেন না?'

'ওঃ হো। তুমি সাও না! এখন মনে পড়েছে। তুমি এখানে কি করছ? একা কেন?'

'আমি আমার এক পুরোনো বন্ধুর সঙ্গে দেখা করতে যাচ্ছি।'

'কোথায়?'

'ভো নাই-তে।'

'আমিও তো ভো নাই-তে যাচ্ছি।'

'আমার কি সৌভাগ্য! ভয় হচ্ছিল হয়তো রাস্তাটা চিনতে পারবো না।'

'আমাদের সঙ্গে চলো।'

মেয়েটির সঙ্গে আমাকে কথা বলতে দেখে শুধু লাবেরী বাদে সব যুদ্ধবন্দীরাই আমার দিকে ফিরে তাকাল। সাও তার টুপিটা নামিয়ে নিল।

আমি হেসে বললাম, 'ভয় পেয়ো না। আমরা এখন থুই নগুয়েনে নই, মুক্তাঞ্চালে আছি।'

'আপনি এদের কোথায় নিয়ে যাচ্ছেন?' মেয়েটি আমাকে প্রশ্ন করলো।

'কনসেণ্ট্রেশন ক্যাম্পে।'

কিছুক্ষণ স্তব্ধতার পর সে অন্য একটা প্রসঙ্গ উত্থাপন করে বলল, 'জানেন, কন্ মারা গেছে। আপনার কি তাকে মনে আছে? জেলা গেরিলা কমিটির সদস্য ছিল।'

মেয়েটির কথায় আমি প্রচণ্ডভাবে ধাক্কা খেলাম, 'কবে মারা গেল?'

'এই বছরের গোড়ায়।'

মুখ মুছে সাও বললো কন্‌কে ধরবার পর শত্রুরা ওকে বন্দুকের কুঁদো দিয়ে পিটিয়েছিল, কন। তার চোখ বড় করে বলেছিল, 'আমাকে অমন কোরো না। আমি তোমাদের লেফটেন্যাণ্টের সঙ্গে দেখা করব।' লেফটেন্যাণ্ট তাকে কিছু পানীয় এবং একটা রোস্ট করা মুরগীর ঠ্যাং দিয়েছিলো। কন্ মদটা এক নিঃশ্বাসে শেষ করে কাপটা আর মুর্গীর ঠ্যাংটা লেফটেন্যাণ্টের মুখে ছুঁড়ে মারে। সাও বলল, 'ওরা কন্‌কে গিয়াই ভু-তে মেরেছে। আমি তখন সেখানে ছিলাম। মারা যাওয়ার আগেই ওরা কনের দেহটা এত বিকৃত করে দিয়েছিল যে দেখে আমি ভয় পেয়েছিলাম।'

সাও এরপর মহম্মদের দিকে হাত দেখিয়ে বললে, 'যে মেরেছে তাকে অনেকটা ওই রকম দেখতে।' লাবেরীকে দেখিয়ে বলল, 'আমাদের লেফটেন্যাণ্ট—একজন কর্সিকার লোক—ওই রকম

দেখতে। ওরা কনের চুল ব্রিলিয়ানটাইন দিয়ে আঁচড়ে বাজারের মধ্যে ওর মাথাটা টাঙিয়ে রেখেছিল।'

রাগে আমার গলা বুজে গিয়েছিল। আমি ঠিক ভাবে কথা বলতে পারছিলাম না। ওই দু'জনের উপস্থিতি সহ্য করতে না পেরে ওদের অনেক আগে আগে হাঁটিয়ে নিয়ে যাবার জন্য থাচকে বললাম।

'এদের অন্যায়ের প্রায়শ্চিত্ত হিসাবে মৃত্যুই যোগ্য শাস্তি।' রাগে দাঁতে দাঁত ঘষে থাচ বললো।

সাও আর আমি আরো আস্তে আস্তে হাঁটতে লাগলাম।

'আচ্ছা তোমার মা কেমন আছেন ? তোমার স্বামীর কাছ থেকে কোনো খবর পেয়েছো ?' আমি কথা ঘুরিয়ে নিলাম।

'ধন্যবাদ, মা এখন খুবই ভালো আছেন। স্বামীর খবর আগেই পেয়েছি।'

'সে এখন কোথায় ?'

'ভু নাই-তে।'

আমি হো হো করে হেসে উঠলাম। 'ওহো, এই ব্যাপার! আমি ভাবছিলাম এত বিপদ সত্ত্বেও থুই ন্‌গুয়েন থেকে কে তোমাকে আসার প্রেরণা যোগাল!'

সাও আর ভু, স্বামী স্ত্রী পরস্পরকে যে কি ভালোবাসে আমি জানতাম। গত বছর যখন আমি ওর বাড়ি ছিলাম, তখন মাঝে মাঝেই ওকে দেখতাম অ্যাং মনের দিকে তাকিয়ে আছে, যেখানে কামানগুলো গর্জন করছে। কিন্তু সে এমন ভাব দেখাতো যেন বিশেষ কিছুই চিন্তা করছে না। আমার সন্দেহ দূর করার জন্য একটা ঝাঁটা নিয়ে ঘর ঝাঁট দিতে শুরু করতো। আমি সঙ্গে সঙ্গে চলে যেতাম। যে লোকটির সঙ্গে বিবাহের সাত দিন পর থেকেই সে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে, তার চিন্তায় মগ্ন থাকা আদৌ অস্বাভাবিক নয়।

তখন শীতকাল, সময়টা ছিল ভীষণ ঠাণ্ডা আর শুকনো। সব গাছপালা কুঁকড়ে গিয়েছিল। গোলাপের পাতায় মাটি ঢাকা থাকতো। সাও একা বাড়িতে থাকত, সব্জীক্ষেতে জল দিত আর সময়ে সময়ে তাকাতো সীসে-রঙা আকাশের দিকে। অনেক দূরে ছিল দাউ কাউ-এর ফাঁড়ি।

ভু চিঠি লিখতে গেলে এতো বিরক্ত হোতো কেন কেউ জানতো না।

তারপর শোনা গেল সেই গুজব, সে নাকি ১৮ নং সড়কে একটা যুদ্ধে মারা গেছে। ভিত্তিহীন এই গুজব মুখে মুখে ছড়িয়ে গেল আর সাও কেঁদে চলল শ্রান্তিহীনভাবে।

আমরা ওকে সান্ত্বনা দেবার ব্যর্থ চেষ্টা করেছিলাম। সে সারা রাত্রি আমাদের মাটির নীচের আশ্রয়টা সারিয়েছিল আর আমরা বহুবার অনুরোধ করা সত্ত্বেও ঘুমোতে গেল না। আমরা বুঝতে পারছিলাম যে সে যতই তার স্বামীর কথা ভাবছে, ততই আমাদের যত্ন নিচ্ছে। সাও আমার স্ত্রীর গল্প শুনতে খুব ভালোবাসতো। আমার স্ত্রী থাকতো শত্রুপরিবেষ্টিত হ্যাদং প্রদেশে-----

'গত বছর থেকে আপনার স্ত্রীর সঙ্গে দেখা করার কোনো সুযোগ পাননি?' ও আমাকে প্রশ্ন করল।

আমি মাথা নাড়তে ও একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলল।

যখন বাড়িতে কেউ থাকতো না, তখনও সাও ভু-র চিঠি বার করে পড়তো, চিঠিগুলো অত্যন্ত ছোটো এবং কোনো ভালোবাসার স্বাক্ষরই তাতে থাকতো না। তবুও সে চিঠিগুলো প্রচণ্ড আবেগের সঙ্গে পড়ত, লেখা কথার ফাঁকে ফাঁকে না-লেখা বাণীকে ধরতে চাইত। পড়া হয়ে গেলেও স্তব্ধ হয়ে বসে থাকতো আর দীর্ঘশ্বাস ফেলত। আমরা ওর যন্ত্রণাকে শ্রদ্ধা জানিয়ে চুপ করে থাকতাম।

এখন আমরা পাশাপাশি হাঁটছি, তার সুখ মনে হচ্ছিল আমাকেও ছুঁয়ে যাচ্ছে।

'তুমি কি করে ওর ঠিকানা পেলে ?' আমি বললাম।

'আমার কাকা শহরের সেনাবাহিনীতে কাজ করেন, তিনি আমাকে লিখেছেন যে, তিনি ভু নাই-তে একটা সভায় গিয়েছিলেন, তখন হঠাৎই আমার স্বামীর সঙ্গে দেখা হয়ে যায়।'

'কি সৌভাগ্য তোমার।' আমার কথা শুনে ও হাসল, তারপর আরেকটা বিষয়ের অবতারণা করল, 'আমরা যখন ভ্যান্ নদীটা পার হই, সবাই মুক্তাঞ্চলে পৌঁছে যাবার আনন্দে প্রচণ্ড লাফিয়েছিলাম, আমার এত আনন্দ হয়েছিল যে আমি গান গাইছিলাম আর একজন পুলিশ যখন আমার কাছে কাগজ পত্র দেখতে চাইল, তখন ভুলেই গিয়েছিলাম যে সেগুলো আমার হাতেই আছে——নদীটা কি বিশাল! রাষ্ট্রপতি হো-র ছবিওলা এখানকার কাগজের টাকাগুলো কি সুন্দর।'

আমি থুই নগুয়েন থেকে আসার রাস্তাটার কথা ভাবছিলাম। কি বিপজ্জনক। এখানে আসার জন্য আমাদের নাম তাও আর বাক দাউ, পাহাড়ী রাস্তার পাশে বানানো দুটো গুরুত্বপূর্ণ ফাঁড়ি পেরিয়ে আসতে হয়েছে। আমাদের সবরকম বিপদের সম্ভাবনার জন্য প্রস্তুত থাকতে হয়েছিল। লুক দাউ গিয়াং, যেটা সবচেয়ে বিপজ্জনক কিন্তু শেষ সুরক্ষিত ঘাঁটি, নদীটা সেখানে যেন সমুদ্রের মত চওড়া। শত্রুদের মোটর বোটগুলো ফা লাই থেকে এই অংশটা সারা রাত পাহারা দেয়। আমরা শুনেছিলাম যে নিরাপদে পার হবার জন্য এক মা তাঁর শিশুর কান্না থামাতে তার গলা টিপে রেখেছিলেন। সেই শিশুটি নিঃশ্বাস না নিতে পেরে অজ্ঞান হয়ে গেছিল।

'তুমি আসার পথে ভয় পাওনি ?' আমি সাওকে জিজ্ঞেস করলাম।'

'ভয় পাবো কেন ? এমনকি রাস্তাটা যদি দশগুণ বেশি বিপজ্জনক হতো তাহলেও অনায়াসে চলে আসতাম।'

একটা সরাইখানায় পৌঁছে সাও তার ব্যাগ হাতড়ে একটা সিগারেটের প্যাকেট বার করে আমাদের দিল। আমি নিতে আপত্তি জানিয়ে বললাম, 'এগুলো তোমার স্বামীর জন্য রেখে দেওয়াই ভালো।'

কিন্তু সে আমাদের দু'জনকে সিগারেট নিতে বাধ্য করলো। যুদ্ধবন্দীরা 'ফরাসী সিগারেট' বলে চেঁচিয়ে উঠল।

আমি সাওকে বললাম, 'এই যুদ্ধবন্দীরা কিছুক্ষণের মধ্যেই বন্দী বিনিময়ের পর চলে যাবে।'

সাও অনেকক্ষণ বন্দীদের দিকে তাকিয়ে রইল, তারপর থাচের হাতে সিগারটগুলো দিয়ে বললো, 'এগুলো ওদের দিন।'

যুদ্ধবন্দীরা সিগারেটগুলো খুশিতে আঁকড়ে ধরলো। লাবেরী তার ভাগের সিগারেটটা দু'হাত পেতে নিল। সিগারেটের জন্য পাগল। নম্রভাবে মাথা নত করে সাওকে বললো, 'ধন্যবাদ।'

আমরা গরম ধূলিধূসর রাস্তা দিয়ে এগিয়ে চলেছি। মাঝে মাঝে সাও পেছিয়ে পড়ছে। এই প্যাচপেচে গরমটার জন্য ও ঘামে চুপ্‌চুপে হয়ে গিয়েছে।

ওকে এত ক্লান্ত দেখে আমি বললাম, 'আমি কি তোমার ব্যাগটা নেব?'

সাও আপত্তি জানিয়ে বললো, 'ভার বইতে অভ্যস্ত নই ঠিকই কিন্তু বয়ে নিয়ে যেতে পারব। একটা বাঁক পাওয়া গেলে বেশ ভালো হত।'

একটা চায়ের দোকান থেকে সত্যিই একটা বাঁক যোগাড় করে ফেলল সাও। আমার ন্যাপস্যাকটাও ও বইতে চাইছিল। আমি ওকে ধন্যবাদ জানিয়ে নিরস্ত করলাম।

লাবেরী ওর দিকে অবাক হয়ে তাকাল। ও অনেক পিছনে নেতিয়ে পড়েছিল, শেষের দিকে আর এক পা-ও হাঁটতে পারছিল না,

অসুস্থ বোধ করছিল। ওর মুখ লাল হয়ে গেছে, নাক দিয়ে সর্দি পড়ছে আর ভীষণ ঘামছে।

আমি সাওকে বললাম, 'তুমি ওদের সিগারেট্ দিলে কেন?'

'কেন আমি জানি না। বোধহয় ওদের করুণা করতে শুরু করেছি।' লাজুকভাবে সাও বলল।

আমার হঠাৎই মনে পড়ল সেই সমস্ত মুহূর্তগুলো—যখন সে বাড়ির একটা কোণে তার স্বামীর কথা চিন্তা করছে—সেই তল্লাসীর রাতে তার জীবন যখন একটা সুতোর ওপর ঝুলেছে—যখন সে একটা প্লাবিত ট্রেঞ্চের মধ্যে বসে থাকতে বাধ্য হয়েছে, অথবা শত্রুদের রাইফেলের সামনে দিয়ে হেঁটে যেতে হয়েছে তাকে।

এখন শত্রুরা এখানেই আছে। অত্যন্ত দুঃখিত আর হতাশ অবস্থা তাদের। হবেনা কেন, তারা যে আর মাতাল আর হত্যাকারীর জীবন যাপন করতে পারছে না। এখন তারা সাও-এর দেওয়া সিগারেট খেতে বাধ্য।

লাবেরী সিগারেটে টান লাগিয়ে খুব আনন্দ পেয়েছে। মাঝে মাঝে সে চোরা দৃষ্টিতে সাওকে দেখছে আর অধিকাংশ সময়েই রৌদ্রোজ্জ্বল দিগন্তের দিকে তাকিয়ে আছে।

'না, আমি আর এক পাও যেতে পারব না। আমাকে এখানেই মরতে দাও। ওগো ইভোন্নে···!' লাবেরী কাঁদতে কাঁদতে একটা গাছের গোড়ায় শুয়ে পড়ল।

কি করা যায় বুঝতে না পেরে আমরা সবাই থেমে গেলাম।

'আমার ওপরে এভাবে অত্যাচার করার থেকে বরং আমাকে গুলি করে মেরে ফেল।' ও বলল।

আমি ওকে আমাদের সঙ্গে একমাত্র যে ওষুধ ছিল, কুইনিন, তারই কয়েকটা বড়ি দিলাম। ও ওষুধ নিতে অস্বীকার করল, 'আমার ম্যালেরিয়া হয়নি, আমি এই বিশ্রী ওষুধটা খেতে পারব না।'

আমরা এখানে রাত্রিটা থাকতে পারবো না, কারণ আমাদের বন্দী হস্তান্তরিত করার দিন এগিয়ে আসছে।

'নিশ্চয়ই ওর সর্দিগর্মি হয়েছে।' থাচ আস্তে আস্তে বলল। আমি ওকে সান্ত্বনা দেবার চেষ্টা করলাম, 'হাঁটবার চেষ্টা করো। যদি রাস্তায় কোনো ওষুধ পাওয়া যায়, কিনে নেব।'

কোন উত্তর না দিয়ে স্থির হয়ে শুয়ে রইল লাবেরী।

সাও আমাকে এক কোণে ডেকে নিয়ে বলল, 'আমার কাছে কতকগুলো ওষুধ আছে, কিন্তু কোন্ কাজে লাগে জানি না।'

লাবেরী এবং অন্য যুদ্ধবন্দীদের উৎসুক চোখের সামনে সাও তার ব্যাগের সাদা কাপড়ের বাণ্ডিল, অন্তর্বাস আর তোয়ালের মধ্যে থেকে একটা ছোট প্যাকেট বার করে আনলো। তাতে ছিল কুইনিন, গ্যানিভান আর অ্যাসপিরিনের বড়ি। প্রয়োজনীয় ওষুধ পেয়ে লাবেরী চেঁচিয়ে উঠল।

যুদ্ধবন্দীরা একজায়গায় জড়ো হলো। লাবেরী উঠে বসলো আর ওষুধগুলো বাধ্য রোগীর মত খেয়ে নিল। তারপর সে সাও এর দিকে তাকিয়ে বলল, 'আপনাকে অনেক ধন্যবাদ।'

সাও লাবেরীর জন্য গলা ভাত রেঁধে দিল; লাবেরী গরম ভাতের পাত্রটা দেখে সাও-এর দিকে বিস্ময় আর কৃতজ্ঞতা ভরা চোখে তাকিয়ে রইল।

সাও খুব শান্ত হয়ে গেল আর বাচ্চাদের সঙ্গে খেলতে লাগল, লাবেরী ধীরে ধীরে খেল।

সে আরো কয়েক বার ওষুধ খাবার পর সুস্থ হয়ে উঠল, আরো তাড়াতাড়ি হাঁটতে শুরু করল। মাঝে মাঝে সে সাও-এর দিকে উঁকি মেরে দেখছিল আর বিষণ্নভাবে মাথা নিচু করে ছিল।

লাবেরী আমাকে বললো, 'এই ভিয়েতনামী মহিলাদের মধ্যে এমন কিছু গুণ আছে যা কোনো ফরাসী মহিলার মধ্যে পাওয়া

যাবে না। যদিও আমি তার শত্রু, কিন্তু সাও আমার সঙ্গে বোনের মত ব্যবহার করেছে।'

আমার মেজাজটা বেশ খুশী হতে আমি লাবেরীকে সাও আর ভু-র ভালোবাসার গল্প বললাম। যে ওষুধটা ও লাবেরীকে দিয়েছে সেটা যে ও সৈন্যবাহিনীতে নিযুক্ত স্বামীর জন্য নিয়ে যাচ্ছে সেটাও বললাম। লাবেরী যেন আগে কখনো দেখেনি এমন ভাবে অল্পবয়স্কা মেয়েটির পা থেকে মাথা পর্যন্ত দেখল। তারপর দীর্ঘশ্বাস ফেলল, 'হায় ইভোন্নে!'

লাবেরী আমাকে বললো, 'দ্যাখো, ভালোবাসা কি আশ্চর্য জিনিস! ভালোবাসা সব বিপদের মুখে হাসতে পারে। মাত্র সাত দিন একসঙ্গে থেকে তারা দু'বছরের জন্য বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে, এবার আবার তারা মিলিত হবে। কি আনন্দ! আমি আর কখনো ইভোন্নেকে দেখার আশা রাখি না।'

'ইভোন্নে কি তোমার স্ত্রী?'

'না, সে আমার প্রেমিকা।'

আমি একজন ফরাসী তরুণীকে কল্পনা করলাম, যার বয়স কুড়ির মধ্যে, ছিপছিপে, কপালের ওপর পড়া কোঁকড়ানো রেশমী চুল, হাসি হাসি কিন্তু চিন্তান্বিত আর দুঃখী চোখ।

সে বলল, 'ইভোন্নে আর আমি পরস্পরকে এক বছরেরও বেশী ভালোবাসি। জানো, আমি একটা পার্কে মাঝে মাঝে শুয়ে থাকতাম। আমার ওপর এক পা রেখে ও বলত,—'আগে বলো আমার কাছে আত্মসমর্পণ করেছ কিনা?'—শুনতে আমার খুব ভালো লাগতো।'

ওর মনে কত স্মৃতি ভিড় করে আসছে। খুব শিশুসুলভ আর করুণার পাত্র মনে হচ্ছে। ওকে মনপ্রাণ ভরে চিন্তা করার জন্য একলা থাকতে দিয়ে আমি সাও-এর কাছে চলে এলাম। ও তখন শান্ত নদীর দিকে শূন্য দৃষ্টিতে তাকিয়েছিলো। বাঁধের দরজা দিয়ে

খুব তোড়ে জল পড়ছিল, ও বললো, 'এখানে মাঠের কাজে কোন কষ্ট নেই। সেচের দরকার হয় না। পাইপ দিয়ে জল সোজা মাঠে চলে আসে। কিন্তু আমাদের ওখানে সেচের ব্যবস্থা করা একটা সমস্যা।'

কয়েকজন চাষীকে ক্ষেতে কাজ করতে দেখে ও বললো, 'এখানে চাষের জন্য কেবলমাত্র বলদ ব্যবহার করা হয়। আমাদের ওখানে, যেখানে এঁটেল মাটি বেশী, সেখানে খুব শক্তিশালী মোষের দরকার।' সব কিছুই ওকে অবাক করে দিচ্ছে—চারণ ভূমিতে স্বচ্ছন্দবিহারী মোষের পাল ; সব জন্তু জানোয়ারগুলোর গলায় বাঁধা কাঠের ঘণ্টা : জ্বালানী কাঠ, চিরহরিৎ মির্‌টিল্‌ গাছ আর তার সুস্বাদু ফল।

থাই ন্‌গুয়েন শহরটা পেরিয়ে আমি বললাম, 'আমরা আমাদের গন্তব্যের কাছাকাছি এসে গেছি।'

'আর কত কিলোমিটার বাকী আছে?' ও জিজ্ঞেস করল।

'তাড়াতাড়ি পা চালাও. এক্ষুণি পৌছে যাবে।' থাচ থোর উচ্চারণকে নকল করে বলল।

আমরা সবাই হো হো করে হাসলাম। সাও আনন্দ চাপতে পারছিল না। চুলগুলো আর মুখ মুছে আরো তাড়াতাড়ি হাঁটতে শুরু করলো।

থাচ বলল, 'তুমি এত তাড়াতাড়ি করছ কেন বলতো? নিশ্চিন্ত থাকো, আজ রাত্রের মধ্যেই পেঁৗছচ্ছি।'

সাও হাসলো।

ডুবন্ত সূর্যটা উপত্যকা আর সমতল ভূমিকে জাফরান রঙে ধুইয়ে দিয়েছে। কি অদ্ভুত সুন্দর দৃশ্য! মোষগুলো ক্লান্তভাবে চরছে ; পাহাড়ের গায়ে ক্যাসাভা গাছে নিড়ানি দিচ্ছে ; বিশাল নীলাকাশের পটভূমিতে তাদের ঘন নীল বিন্দুর মত লাগছে। দুটো গরুর গাড়ি পাহাড়ের অন্য দিকে নামছে, একদল সৈন্য রাস্তার ধারে পাতার

আড়ালে ওত পেতে আছে। এখানে ওখানে ঘাসের সুগন্ধ বাতাস ভরে রেখেছে।

এই পরিচিত দৃশ্য আমাদের পথের ক্লান্ত ভুলিয়ে দিল, জানিয়ে দিল আমাদের যাত্রা শেষ। মহম্মদ আর লাবেরীর মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠল।

আমরা লং গিয়াং সেতুতে পেঁৗছে থামলাম। সাও-এর অস্থিরতা বুঝতে পেরে বললাম, 'তুমি এগিয়ে যাও, আমরা এখানে কিছুক্ষণ থাকবো।'

ও দ্বিধা করছে দেখে আমরা তাড়া দিলাম, 'ভয় পাবার কিছু নেই। এখান থেকে রাস্তাটা খুব সহজ। তুমি না থেমে হাঁটলে আজ সন্ধ্যায় পেঁৗছে যাবে। তোমাকে আমাদের জন্য অপেক্ষা করতে হবে না। আজ আটকা পড়লে আমরা কাল সকালে রওনা দেব।'

সাও আমাদের বিদায় জানালো। লাবেরীও শুভেচ্ছা জ্ঞাপন করল।

আমরা অনেক দূর পর্যন্ত তার দিকে তাকিয়ে রইলাম। একটা ছোট নদীর কাছে পেঁৗছে, সাও তার ব্যাগটা নামিয়ে রেখে নদীর জলে মুখ ধুল। পকেট থেকে কি যেন একটা বার করল, বুঝতে পারলাম একটা আয়না।

দূর থেকে থাচ সাবধান করে দিল, 'তাড়াতাড়ি কর, নইলে ও বেচারা তোমরা জন্য হাপিত্যেশ করে বসে থাকবে।'

সাও আমাদের দিকে তাকাল। থাচের সুখের জীবন শেষ হয়ে গেছে। তাই অন্যদের সুখী হতে দেখলে তার মন ভরে ওঠে। সে তার শিরস্ত্রাণটা নাড়তেই; তার উত্তরে সাও তার টুপি নাড়ল, যুদ্ধবন্দীরা সাও-এর দিকে একদৃষ্টে তাকিয়েছিল। লাবেরী বিড়বিড় করছিল, 'বিদায়! বিদায়!'

সাও চলে গেল। এই নির্জন পাহাড় আর বনের মধ্যে রাত্রি

নামছে তখন, সাও-এর দৃপ্ত হাঁটার ভঙ্গি দৃশ্যাবলীর সৌন্দর্য আরো বাড়িয়ে দিল। শেষ সূর্যরশ্মিতে উজ্জ্বল ঝাউবনের মধ্যে অদৃশ্য হয়ে গেল সাও।

লাবেরী ওর দিক থেকে চোখ ফিরিয়ে নিলো। আমার দিকে ফিরে বললো, 'আমার খুব ইভোন্নের কথা মনে পড়ছে। সাও-এরই মতো ঠিক এমনি কোমল আর মিষ্টি মেয়ে ইভোন্নে।'

লাবেরী একটা ডায়েরী বার করল তার ন্যাপস্যাক থেকে।

ডায়েরীর প্রথম পৃষ্ঠায় একজোড়া ঠোঁটের লাল ছাপ, নীচে লেখা—'তোমাকে অনেক অনেক চুমু, তোমার দুর্ভাগিনী ইভোন্নে।'

দ্বিতীয় পাতায় পড়লাম, 'ইভোন্নের চিঠি পেয়ে দারুণ খুশী হয়েছি। ওর কাছ থেকে একমাস দূরে থাকা এক বছরের সমান। ওর চিঠিগুলো বার বার পড়ি। ও আমাকে জুলাই এর সন্ধ্যাগুলোর কথা, ছুটির দিনগুলো আর মেইন নদীর তীরে হাতে হাত ধরে হাঁটার দিনগুলোর কথা মনে করিয়ে দেয়।

'আলোয় আলো প্যারিসের জন্য, আমার প্রিয়তমা প্যারিসের মেয়ে ইভোন্নের জন্য আমার মন কেমন করে। যেদিন আমি চলে এলাম, সেদিন ও ঠোঁট রাঙিয়েছিল। আমি প্রশ্ন করেছিলাম, কিন্তু ও রহস্য ভাঙেনি। তারপরে ও একটা নোটবই বার করে প্রথম পাতায় ঠোঁট ছুঁইয়ে আমাকে সেটা চুম্বন করতে বলে···

'ক্যাটবিতে পেঁ ৗছেছি। হাইফং একটা ছোট আর সংকীর্ণ জায়গা, কিন্তু সুন্দরী মেয়েতে গিজগিজ করছে। সবাই ছিপছিপে, কাজল কালো চোখ, কালো চুল আর দারুণ প্রাণচঞ্চল।

'ভিয়েতনামের আকাশে একটা হেলক্যাটে প্রথম ওড়া এবং প্রথম বোমাবর্ষণ। একটা পুরো গ্রাম আগুনের সমুদ্রের মত পুড়ছে, যেন একটা একটা আঁকা ছবি। বিদ্রোহীরা ঘন জঙ্গলের মধ্যে। জায়গাটা পাহাড় আর বনে ভর্তি। যথেচ্ছ ভাবে

বোমাবর্ষণ করা হয় এবং কামান দাগা হয়। লক্ষ্য ভেদ করে কিনা কে জানে······

'···ইভোন্নের কাছ থেকে আরেকটা চিঠি পেয়েছি। আমি খুব কম ও ছোট ছোট চিঠি দিয়েছি বলে অনুযোগ করেছে। প্রশ্ন করেছে, কি করে তাকে ভুলে গেলাম। 'সম্ভবতঃ হলুদ চামড়ার পরীরা তোমার ইভোন্নোকে ভুলিয়ে দিচ্ছে।' ইভোন্নে লিখেছে যে, সে গল্প শুনেছে ভালো ভালো সৈন্যরা ভিয়েতনামে থাকার পরই খারাপ হয়ে যায়। কেন এমন হয়?

'পল ঠিকই বলেছিল। আমি এখন কি করব? মদ, মেয়েমানুষ বা আকাশে ওড়া ছাড়া আর কি করার আছে? বিমান ঘাঁটিটা কাঁটাতার দিয়ে ঘেরা আর আমরা এখানে সবাই বন্দীর মত থাকি। পল আমাকে বেশ্যালয়ে যেতে বলেছে। ঘৃণ্য মেয়ের দল। 'হে ভগবান! আমাকে বাঁচাও!'

আমি কয়েকপাতা চোখ বুলিয়েই বিরক্ত হয়ে উঠেছিলাম, লাবেরীকে ডায়েরীটা ফেরত দিলাম।

'তোমরা সকলেই এইভাবে কালি মাখ।' আমি বললাম।

'হ্যাঁ, প্রত্যেকেরই সমুদ্র পারে একজন প্রেমিকা আছে,' ঝটিতি উত্তরে আমি বুঝলাম ও ঈঙ্গিতটা ভুল বুঝেছে।

'কিন্তু এখানে অনেক স্বামী স্ত্রী আছে, যুদ্ধের বিরাট সমুদ্র যাদের বিচ্ছিন্ন করে রেখেছে।'

'হ্যাঁ, সুন্দরী সাও-এর ব্যাপারটা তাই। কিন্তু সে এখনই সমুদ্রের ওপারে পেঁছিবে।'

লং গিয়াঙে অল্পক্ষণ থামার পর আমরা আবার যাত্রা শুরু করলাম। একদল সৈন্য রাস্তার ধারে বিশ্রাম করছিল, তারাও চলতে শুরু করল। লাবেরী তাদের দিকে তাকিয়ে বলল, 'তোমরা

যুদ্ধে জেতার জন্য পাহাড় আর বনের ওপর খুব নির্ভর কর, তাই না ?'

আমি স্থির করলাম, আমাদের যুদ্ধে জেতার আসল কারণটা লাবেরীকে বলবো। হঠাৎ মাথার ওপর একটা এরোপ্লেনের শব্দ শুনতে পেলাম। কোনক্রমে শুধু মাটিতে চিৎ হয়ে শুয়ে পড়ার সময় পেলাম, দেখলাম একটা হেলক্যাট একেবারে পাহাড়ের চুড়ো ছুঁয়ে নিচু দিয়ে উড়ছে। উড়োজাহাজটা এলোপাথাড়ি কিছু গুলি ছুঁড়ল। প্লেনটা যেদিকে যাচ্ছিল সেদিকে বকের মত গলা বার করে লাবেরী ঈর্ষাকাতর চোখে তাকাল।

একটা বিন্দুর মত ছোট হয়ে এরোপ্লেনটা পর্বতমালার পিছনে হারিয়ে গেলে আমরা উঠে দাঁড়ালাম। রাত নামছে। আমরা আন্দাজ করলাম সাও তার গন্তব্যে পেঁাছে গেছে, তার স্বামীর সঙ্গে দেখা হয়েছে। এই দম্পতির মিলন সুখের কথা আমরা কল্পনা করার চেষ্টা করলাম। হয়তো ভু-র দলের সঙ্গীরা ওকে আর ওর স্ত্রীকে ঘিরে বসে আছে। ভু আজ কিছু আনন্দপিয়াসীর হাসির উপলক্ষ্য হয়ে উঠেছে নিশ্চয়। এই যুগলের জন্য নির্দিষ্ট একটা কুঁড়েতে ভু-র হাত তার স্ত্রীর গলাকে ঘিরে থাকুক, আজ রাতে তারা তাদের বিবাহ রাতের থেকেও বেশি সুখী হবে।

অন্ধকারে দৃশ্য পরিবর্তিত হয়ে গেল। যে রাস্তা দিয়ে আমরা যাচ্ছিলাম, সেটা একটা সাদা রেখার মত লাগছিল। পাহাড় আর বনে আঁধার নামছিল, মনে হচ্ছিল রাজ্যের রহস্য যেন জমা হয়ে আছে এখানে।

বিশাল আকাশে ঝিকমিকে তারার মতই পাহাড়ের ঢালের অল্প কয়েকটা কুঁড়েতে আলো জ্বলে উঠেছে। আবহাওয়া আবার সুন্দর হয়ে গেল। বাতাস বইতে লাগল।

আমরা একটা জ্বলন্ত মশালের পেঁাছে দেখলাম একটি মৃতদেহকে ঘিরে বহু মানুষের সমাবেশ ঘটেছে। অনেকগুলো গলা শোনা গেল—

'প্লেনটা তো অল্প কয়েকটা গুলি ছুঁড়েছিল।'

'আমি মাঠে কাজ করছিলাম, এমন সময় লুটিয়ে পড়তে দেখলাম।'

জনতার মধ্যে দিয়ে আমরা পথ করে নিলাম। দেখলাম একটি রক্তাক্ত নারীদেহ, পা ভেঙে গেছে, ছেঁড়া খোঁড়া প্যান্ট।

আমি তোয়ালে সরিয়েই চমকে উঠলাম। মৃতদেহটি সাও-এর। চোখদুটো প্রাণহীন, আলুথালু চুল রক্তে মাখামাখি। আমি জোর করে আমার ঠোঁট চেপে রইলাম, যাতে আমার মুখ দিয়ে কোনো অভিশাপ না বেরিয়ে আসে।

শেষ বিকেলেও সাও আমাদের সঙ্গে খোশমেজাজে কথা বলছিল আর এরই মধ্যে মৃত্যু তাকে ছিনিয়ে নিয়ে চলে গেছে। কি বীভৎস মৃত্যু! সাওকে লোকে ভুলে যাবে চিরকালের জন্য। তার মৃত্যু আজ একজন পাইলটের রূপ ধরে এসেছে, যার কাঁধে অপরাধের ভার, যে একটা জ্বলন্ত গ্রামকে একটা ছবির মত মনে করে।

সাও আমাদের বেশ কয়েক দিনের যাত্রার সঙ্গী। তার স্বামীর কাছে আসার জন্য সে থুই ন্‌গুয়েনের সমুদ্র তীর থেকে শত শত কিলোমিটার আর প্রচুর সৈন্য ফাঁড়ি পার হয়ে এসেছে। এখন সে চিরকালের মত এমন একটা জায়গায় শুয়ে আছে যেখান থেকে তার স্বামী খুব দূরে নয়, অথচ দুটো জগৎ তাদের বিচ্ছিন্ন করে দিয়েছে। তার কত ভালোবাসা ছিল স্বামীর জন্য, কত আশা করেছিল সাও স্বামীর কাছ থেকে, কত উদ্বেগের কথা তার বলবার ছিল দীর্ঘ দু'বছরের বিচ্ছেদের পর? হায়! তার সব আশাই তার মৃত্যুর সঙ্গে লুপ্ত হয়ে গেল।

একটা কফিন আনা হলো, কে যেন বললে, 'ওকে নতুন কাপড় পরিয়ে দাও।'

সাও-র ব্যাগ হাতড়ে দেখা গেল সব কাপড়ই হয় রক্তে ভিজে অথবা গুলিতে ফুটো হয়ে গেছে। সিগারেটের প্যাকেটটাও রক্তে মাখামাখি হয়ে গেছে।

দু'জন লোক সাও-এর দেহটা কফিনের মধ্যে রাখতেই থাচ চেঁচিয়ে উঠলো, 'দাঁড়াও! এর স্বামী বেশি দূরে থাকে না। তাকে একবার শেষ দেখা দেখতে দাও।'

আমি জানি না তারা কি বলাবলি করল। সাও-এর দেহটা যাই হোক কফিনে রাখেনি। আমি অনুভব করলাম, রাগে আমার কান ঝাঁ ঝাঁ করছে। আমার চোখ থেকে জল পড়ছিল। যুদ্ধ বন্দীদের সামনেই আমি কাঁদলাম আর জ্বলন্ত দৃষ্টিতে তাদের দিকে তাকালাম।

থাচ-ও বিষদৃষ্টিতে তাকাল। হেক্‌তমাদ, আদিয়াত্তি, পিয়ের আর মহম্মদ একটা গাছের নীচে দাঁড়িয়েছিল। ভয় পেয়ে তারা চুপি চুপি কথা বলছিল। হেক্‌তমাদ ভিড় ভেঙে এগিয়ে এল। পথের পাশে বসে জার্মান ভাষায় বলল—'বীভৎস!'

আমার চোখে পড়ল লাবেরী আমার দিকে সাগ্রহে তাকিয়ে আছে। আমি মনে মনে ভাবলাম, এই মুহূর্তেও ওই বদমাইশটা কি করে এত খুশি খুশি থাকতে পারে। আমি কাঁদছিলাম, চাইছিলাম ওকে জীবন্ত পুড়িয়ে মারতে। ও আমার চোখে চোখ রাখছে না। হয়তো সত্যিই আমার দিকে তাকাচ্ছে না, হয়তো দূরের দিকে দেখছিল। ও বোধহয় বুঝতে পারেনি যে রাগের বশে ওকে আমি খুন করতে পারি। লাবেরী খোলা ব্যাগটার দিকে, রক্তের দাগ-লাগা সিগারেটের প্যাকেটটার দিকে, এখানে সেখানে ছড়ানো অ্যাসপিরিনের বড়িগুলোর দিকে তাকাচ্ছে। চোখেব দৃষ্টিতে সাও-এর পোড়া গাছের মত দেহটা দেখছে।

কাঠের মশালের চট্‌পট্ শব্দ ছাড়া সর্বত্র একটা মৃত্যুর স্তব্ধতা। যুদ্ধবন্দীরা চুপি চুপি হেক্‌তমাদ যেখানে হতাশ ভাবে বসেছিল সেখানে চলে গেল, লাবেরী নড়ল না।

থাচ রাগে গরগর করে উঠল, তারপর লাবেরীর একটা হাত ধরে হিড়হিড় করে টেনে নিয়ে গেল, 'তোর কোনো বন্ধুই এই কীর্তি করেছে, বুঝলি!'

লাবেরীকে ও যখন টেনে নিয়ে যাচ্ছে তখনো ও সাও-এর দিকে তাকিয়েছিল। লাবেরী হঠাৎ আকাশের যেদিকে হত্যাকারী এরোপ্লেনটা উড়ে গিয়েছে সেদিকে তাকাল। ওর দৃষ্টিতে যেন প্রার্থনা ঝরছে, মনে হচ্ছে কথাগুলো যেন তার গলার কাছে আটকে আছে। লাবেরী থেমে থেমে উচ্চারণ করল : 'পল···আমি বুঝেছি, নিশ্চয়ই, আমি বুঝেছি, সব বুঝেছি···'

দু'হাতের মধ্যে মুখ ঢেকে অঝোর ধারায় কেঁদে চলল লাবেরী।

অনুবাদ | শাশ্বতী ঘোষ

সাইপ্রিয়ান এক্‌ওয়েন্‌সি

চিনি ওদের মধ্যেই আছে। লক্ষ কোটি মানুষের ভিড়ে মিশে আছে। আজ নাইজিরিয়ার শহরে শহরে রাস্তায় রাস্তায় ঘুরে বেড়াচ্ছে লক্ষ লক্ষ কোটি কোটি মানুষ। আজকের রাত মুক্তির রাত। রাজধানীর পথগুলো এখন উপচে পড়ছে মানুষে মানুষে। অস্থির, গল্পে মশগুল, বিষণ্ণ আরনীরব, প্রত্যাশী বা বিহ্বল—শুধু মানুষের স্রোত বয়ে চলেছে। অন্যদিকে দলে দলে মানুষ জটলা জমিয়েছে রাস্তায়, আলোর নীচে—স্বাধীনতার অজানা রহস্যের কিনারা করতে। কিছু মানুষ এই শহরে নবাগত। দূর দূরান্তের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে তাদের আগমন, যাদের কাছে আফ্রিকা মানে অন্ধকার। ওরা এখন ঝাঁক বেঁধে দাঁড়িয়ে আছে পার্কের মধ্যে। মাথার ওপর দিয়ে ছুটে যাচ্ছে একের পর এক হাউই, তারপর চোখ ধাঁধানো আলোর ঝর্ণা হয়ে ফেটে পড়ছে আকাশের বুকে। এই তো স্বাধীনতা!

ক্রা-কা-আ-টু-য়া! ক্রাকাটুয়া! সশব্দে বাজি ফাটে। ফ্রান্সিসের আরো কাছে ঘেঁষে এল চিনি। ফ্রান্সিস বলিষ্ঠ হাতে নিবিড় করে চিনির কোমর জড়িয়ে ধরল।

'কি রোম্যান্টিক দেখছো সোনা ? ভারী রোম্যান্টিক লাগছে না ?' ফ্রান্সিস বলল।

'এত সুখ আমি সইতে পারছি না।' ফিস ফিস করে উঠল চিনি। 'আমি মরতে চাই। তোমার বুকের মধ্যে মুখ গুঁজে মরতে চাই। আমি নতুন নাইজিরিয়ার জন্যে মরতে চাই।'

'মরতে পারলে তো ভালই হয় সোনা। সব সমস্যা শেষ করে দেওয়া যায়। এই মুহূর্তে মরতে পারলে খুব ভালই হত।'

চকিতে ঘুরে দাঁড়িয়ে চিনি ওর মুখের দিকে তাকাল, 'সত্যিই কি তাই ?'

'ফ্রান্সিস হাসল। নয়ই বা কেন ? এটা একটা চরম মুহূর্ত। সাম্রাজ্যবাদের মৃত্যু আর নাইজিরিয়ার স্বাধীনতার সূত্রপাত।'

আকাশের দিকে আঙুল তুলে দেখালো ফ্রান্সিস। বাজির ঝলসানির মধ্যে চিনি দেখল এলিজাবেথের মাথার মুকুটটা যেন গলে গলে খসে পড়ছে। 'এতদিনে সাম্রাজ্যবাদের খেলা সাঙ্গ হল।' ফ্রান্সিস দীর্ঘশ্বাস ফেলল। 'দীর্ঘ একশ বছর পরে।'

নাইজিরিয়ার সুন্দরী মেয়ে চিনি। উজ্জ্বল তামাটে গায়ের রঙ। ছিপছিপে দোহারা গড়ন। দেহের প্রতিটি ভাঁজে ভাঁজে খোদাই করা পাথরের তীক্ষ্ণতা। চিনির দেহের এই মোহময়ী সৌন্দর্য ফ্রান্সের ছেলে ফ্রান্সিসের মুগ্ধ চোখের দৃষ্টিকে কেড়ে নিয়েছে বার বার। চিনি অনেক সময় অনুযোগ করেছে, ফ্রান্সিস চিনির প্রেমে পড়েনি। প্রেমে পড়েছে চিনির দেহের।

ফ্রান্সিস হাসে আর বলে, সে যাই হোক না কেন, ওর দেহের আগুন তার বুকে আগুন জ্বালে। ওর দিক থেকে সে নজর ফিরিয়ে রাখবে কেমন করে !

চিনির নিশ্বাসে প্রশ্বাসে ভালবাসা আর দৃষ্টিতে তারই পরিপূর্ণতা। চিনি লাবণ্যময়ী কিন্তু রূপ সম্বন্ধে অসচেতন। ইংরেজদের পোশাকে সে উগ্র আধুনিকা সাজে আর নাইজিরিয়ার পোশাক পরে স্নিগ্ধতায়

মন মাতায়। ওর অঙ্গের সামান্য একটি তরঙ্গও ফ্রান্সিসকে উদ্বুদ্ধ করে। সে তখন অনর্গল কবিতা আউড়ে যায় আর চিনি অস্বস্তি বোধ করে।

হঠাৎ চিনি দু হাত বাড়িয়ে ওকে আঁকড়ে ধরল, 'আমায় মেরে ফেল, ওগো আমায় শেষ করে ফেল।' ফ্রান্সিসের বুকে মুখ গুঁজে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে লাগল চিনি। লক্ষ লক্ষ মানুষের কণ্ঠ হতে ভেসে আসছে নাইজিরিয়ার জাতীয় সঙ্গীত—

নাইজিরিয়া আমার নাইজিরিয়া
আমার সোনার জন্মভূমি,
ভিন্ন জাতি ভিন্ন ভাষা তবু
ভ্রাতৃত্বের অটুট বাঁধনে
তোমার চরণ চুমি—

'আমি সত্যি খুব সুখী হতে পারতাম এখন, এই মুহূর্তে। কিন্তু তোমার সঙ্গে কেন আমার দেখা হল ফ্রান্সিস? তা না হলে আমিও মুক্ত হতে পারতাম, কেননা আমার মাতৃভূমি আজ মুক্ত। কিন্তু তবু—তবু আমি বন্দী।'

ফ্রান্সিসের শক্ত দুটো বাহুর দৃঢ় আলিঙ্গনে নিজেকে বিলিয়ে দেয় চিনি। ওর নরম গালে দাড়ি ঘষতে ঘষতে ফ্রান্সিস আবেগ জড়িত কণ্ঠে বলে, 'চিনি, চিনি, তুমি আমার।'

'হ্যাঁ ফ্রান্সিস, আমি তোমার, শুধু তোমারই।'

'আমার সঙ্গে প্যারিসে যাবে চিনি? যদি—?'

ফ্রান্সিসের সবল হাতের বাঁধনে চিনির দেহটা ভাললাগার যন্ত্রণায় ছটফট করে ওঠে। ফ্রান্সিস ওকে চুমুতে চুমুতে ভরিয়ে দেয়। মুক্তির আনন্দে উন্মত্ত উল্লসিত জনতার ভিড় ক্রমশ ওদের দিকে এগিয়ে আসে। চিনি ফ্রান্সিসকে সামনের দিকে একটু ঠেলে দিয়ে বলে, 'এই যাঃ—কি হচ্ছে! দেখছ না আমরা রাস্তায় দাঁড়িয়ে।' ফ্রান্সিস একটু হেসে ঠোঁট দুটোকে চিনির ঠোঁটে চেপে ধরে। 'আমি ওসব কিছু জানি না, কোন কথা শুনতে চাইনা।'

ওদের গাড়িটা ভিক্টোরিয়া বিচের দিকে ছুটে চলেছে। কারুর মুখে কোন কথা নেই। সামনের দিকে তাকিয়ে আছে চিনি। মনের মধ্যে তোলপাড় করে চলেছে—স্বাধীনতা, ফ্রান্সিস, প্রেম, বিবাহ। স্বাধীনতা—স্বাধীনতা—মুক্তি ···· ···

চিনি বিকেল বেলায় ফ্রান্সিসের সঙ্গে দেখা করতে এল ওর কাজের জায়গায়। রাশ রাশ মানুষের ভিড় ঠেলে ফ্রান্সিসের দেখা পায় চিনি। নিচে মজুররা আগুনের শিখা দিয়ে স্টীলের পাত কাটছে, আর ফ্রান্সিস ওদের কাছে দাঁড়িয়ে কাজের তদারকি করছে। চোখ ঝলসানো আলোয় ফ্রান্সিসের পৌরুষ দৃপ্ত মুখটা জ্বল জ্বল করছে। পরণে সাদা জামা আর সাদা হাফ প্যাণ্ট। পরিশ্রমের ক্লান্তিকে অগ্রাহ্য করার সুস্পষ্ট প্রখরতা ওর চোখে মুখে। চিনি নিঃশব্দে ফিরে যাচ্ছিল। ফ্রান্সিস পেছন ফিরে হঠাৎ ওকে দেখতে পেয়েই ডাকল—

'চিনি! এই চি—নি···'

চিনি প্রায় লাফিয়ে উঠল। ফ্রান্সিস ওর প্যাণ্টের পেছনে হাত দুটো মুছে নিয়ে উলটো দিকে তাকিয়ে দুজন শ্বেতাঙ্গকে তাড়াতাড়ি কি যেন নির্দেশ দিল।

ফ্রান্সিস লাফাতে লাফাতে চিনির কাছে এগিয়ে এল। দমকা হাওয়ায় স্কার্টটা ফুলে উঠতেই চিনি এক হাতে সেটাকে চেপে ধরে অন্য দিয়ে মাথার স্ট্র হ্যাটটাকে সামলাতে লাগল।

'সত্যি, তোমায় যা দেখাচ্ছে না চিনি!' ফ্রান্সিস চিনির হাত দুটোকে নিজের হাতের মধ্যে নিয়ে আবেগ ভরে চুমু খেল। ফ্রান্সিস নির্মীয়মান স্ট্যাণ্ডটার দিকে ফিরে আঙুল দেখিয়ে বলল, 'কেমন দেখছো?' চিনি কিন্তু ফ্রান্সিসের মুখের দিকে তাকিয়ে ছিল। ফ্রান্সিস ওর দিকে ফিরে বলল, 'ভারী সুন্দর না?'

'কোন্‌টা—স্ট্যাণ্ডটা—না আমি?'

ফ্রান্সিস হাসল। 'তুমি তো বটেই। কোথায় যাবে বলো, কফি চলবে ?' ফ্রান্সিস কি করে এভাবে কথা বলছে ও বুঝতে পারছে না। যন্ত্রণায় ওর বুকটা যেন জ্বলে পুড়ে যাচ্ছে। আর চোদ্দ দিন পরেই ওকে চলে যেতে হবে। এদেশে ওর ঠাঁই হবে না। অন্ততঃ কানাঘুষা থেকে সেই রকম শুনছে চিনি। গভর্নর জেনারেলের ধারণা ফ্রান্সিসের নাইজিরিয়া ত্যাগ করাটা জনসাধারণের পক্ষে মঙ্গলকর। তবু ফ্রান্সিস চিনিকে কোন কথাই বলেনি। ও কি সত্যিই চিনিকে বিয়ে করতে চায় ? নাকি চিনি মিথ্যেই সব কিছু জলাঞ্জলি দিয়েছে ?

কফি-স্ট্যাণ্ডে গিয়ে দাঁড়াল দুজনে। চিনি ভাবছিল, কদিন পরে এখানে আর টেডি বয় বা বিটনিকরা ভিড় জমাবে না। ভিড় জমাবে নাইজিরিয়ার দুরন্ত ছেলেরা। চিনির মনে পড়ে গেল পুরনো দিনের কথা। একদিন তাকে প্রচণ্ড শীতের রাতেও চেলসিতে বসে পরীক্ষার পড়া তৈরি করতে হয়েছে। আজ তার উচ্চাকাঙ্ক্ষা সফল হয়েছে। চিনি এখন সেরা সেক্রেটারি টাইপিস্টদের একজন। দেশের সবচেয়ে গোপন সংবাদগুলো তার কানেই ডিক্টেশন হয়ে পৌঁছয়। আর সেই চিনিই কিনা প্রেমে পড়েছে এই ফরাসী লোকটির সঙ্গে, যাকে এদেশ ছেড়ে চলে যেতে হবেই।

'কি চিনি, স্বাধীনতা কেমন লাগছে ?'

'স্বাধীনতার স্বাদ তারাই পায় যারা মুক্তি পেয়েছে। একতা—বিশ্বাস—যত বড় বড় কথা।'

'নাইজিরিয়াকে আমি ভালবাসি। তোমরা নাইজিরিয়ানরাই আফ্রিকানদের মধ্যে সবচেয়ে সহিষ্ণু।'

'না ফ্রান্সিস—সাদা মানুষদের সামনা সামনি হলে সব আফ্রিকানরাই এক।'

'তুমি কি ভাব বলতো আমায় ? বাইরের লোক ?'

চিনি পায়ের ওপর পা তুলে বসল। ফ্রান্সিসের চোখ দুটো আকাঙ্ক্ষায় জ্বলে ওঠে। চিনির মত এমন সুঠাম পা খুব কমই দেখা যায়, তার ওপর ওর পরনে আজ সামনে বোতাম লাগানো স্কার্ট।

'তোমার মেজাজটা আজ ঠিক নেই, চিনি।'

চিনি কফির কাপে চামচ নাড়তে লাগল, সবে মুখে দিতে যাবে, অমনি চলকে খানিকটা কফি ওর জামায় পড়ল। রুমালটা হাতে নিয়ে ফ্রান্সিস এক লাফে এগিয়ে এসে চিনির স্কার্ট আর জামার ওপর কফির দাগগুলোকে আলতো করে মুছতে লাগল। বাঁ দিকের বুকের ওপর কফির দাগটা তুলতে একটু বেশিই সময় নিল ফ্রান্সিস।

সন্ধ্যেটা একেবারে মাটি হল। চটপট করে উঠে পড়ে চিনি। ফ্রান্সিস ওর হাতটা ধরে বলল, 'আমি দুঃখিত চিনি।'

'বারে, তোমার দোষ কোথায়। কিন্তু আমার কান্না পাচ্ছে।'

চিনি ঘাড় উঁচু করে সশব্দে জুতোর হিল ঠুকতে ঠুকতে চলতে লাগল। গাড়ির মালিকরা অনেকেই হর্ন বাজিয়ে হাত নেড়ে ওকে লিফ্‌ট্ দেবার ইচ্ছা প্রকাশ করল, কিন্তু চিনি কোন গ্রাহ্যের মধ্যেই আনল না ওদের। তাছাড়া ওর নিজেরই গাড়ি রয়েছে। ফ্রান্সিসেরও গাড়ি আছে। কিন্তু ওরা কি বুঝবে তার নিরুপায় প্রেমের জ্বালা? বুঝবে কি নিজের দেশের মানুষের চোখে অপরাধী সাব্যস্ত হবার জ্বালা? বিশেষ করে সে যখন আজ একটা বিশ্বাসভাজন পদে অধিষ্ঠিত এবং সেটি তাকে অনেক লড়াই করে অর্জন করতে হয়েছে।

'আমি ওকে ভালবাসি না—না, না, ভালবাসি···কিন্তু ও ফরাসী··· তাতে কি যায় আসে···নিশ্চয় যায় আসে···স্বাধীনতার আগে হলে কোন কথা ছিল না। কিন্তু এখন সব পাল্টে গেছে। আমাকে নিজের দেশে থাকতে হবে, কাজ করতে হবে, নতুন দেশ গড়তে হবে।'

চিনি হাঁটতে হাঁটতে এগিয়ে চলল।

সেদিনই সন্ধ্যেবেলাতে ওর সঙ্গে ফ্রান্সিসের কথা হচ্ছিল। ফ্রান্সিস বলল, 'নাইজিরিয়ার মেয়েরা প্রেম কথাটার মানে জানে না।'

'বলোনা ফ্রান্সিস, কি মানে?'

'বুঝিয়ে বলা বেশ শক্ত।'

ফ্রান্সিস সমুদ্রের দিকে তাকিয়ে ছিল। চিনিও তাকিয়েছিল কিন্তু ওর দৃষ্টিতে তখন নিজের চোখের জলটাই ধরা পড়ছিল।

'বুঝিয়ে বলা সত্যিই বেশ শক্ত', ফ্রান্সিস সিগারেট টানতে টানতে বলল, 'দুটি মানুষের মধ্যে নিতান্ত ব্যক্তিগত ব্যাপার এই প্রেম। কিন্তু বিশাল তার পরিধি।'

'এতো ইউরোপের কথা। আফ্রিকায় ওটা সর্ব সাধারণের ব্যাপার। প্রত্যেকেই এর সঙ্গে জড়িত। আমার মা জড়িত, মামার বাড়ির সকলে জড়িত। বাবা মারা গেছেন, কিন্তু আমার কাকারা আছেন। কাকার বাড়ির সকলকেই একথা জানাতে হবে। আকাশ থেকে তো আর পড়িনি। একটু বুঝতে চেষ্টা করো। তুমি বোধহয় ভাবো আমি খুব দুর্বল।'

'নাইজিরিয়ার হাতছানি।' ফ্রান্সিস বলল। হাসির ব্যর্থ চেষ্টা তার মুখে।

চিনি মাথা গরম করলেই ফ্রান্সিস এইভাবে ওর পিছনে লাগে। নাইজিরিয়ার হাতছানি। স্বাধীনতা লাভের পর থেকে ফ্রান্সিস এই কথাটা বলতে শুরু করেছে। 'এবার তোমরা নাইজিরিয়ানরা বুঝবে অন্যের আশ্রয়ে থাকা আর নিজেরাই নিজেদের ভার গ্রহণ করার মধ্যে তফাতটা কোথায়। কি ব্যক্তিগত জীবনে, কি সামাজিক জীবনে, তোমার প্রতিটি পদক্ষেপ নির্ভর করবে একটি নির্বাচনের ওপর। ব্যক্তি সত্ত্বা বনাম নাইজিরিয়ার দ্বন্দ্বে তুমি কাকে জেতাচ্ছ, তার ওপর। নাইজিরিয়া কিন্তু চিনি সারাক্ষণই তোমায় হাতছানি দেবে। নাইজিরিয়া তোমার রক্তে মিশে আছে। দেখো কি হয় শেষ পর্যন্ত। তবে তুমি যদি তোমার সত্তার ডাকে সাড়া দাও তাহলে যে পথে

যাবে, নাইজিরিয়ার ডাকে সাড়া দিলে কখনোই সে-পথে যেতে পারবে না।'

'আর কত খেপাবে আমায় ?'

'না, না, আর খেপাব না সুন্দরীকে।' চিনিকে চুমু খেল ফ্রান্সিস।

'আজ তুমি বড্ড শক্ত শক্ত কথা বলছ।'

'কেন বলব না বলো। যে দেশকে তুমি ভালবাসো, সেই দেশ ছেড়ে যদি তোমাকে চলে যেতে হয়, যে মেয়েটিকে তুমি ভালবাসো, সে যদি মনস্থির করতে না পারে, সবাই এমনি করবে।'

'কিন্তু ফ্রান্সিস আমি তো তোমায় ভালবাসি।'

'তুমি আমার সঙ্গে যাবে কি ?'

'বলা খুব শক্ত। এই মুহূর্তে আমি নাইজিরিয়াকে বুক দিয়ে আগলাতে চাই। কিন্তু সেইসঙ্গে এটাও জানি, তোমাকে আমি ভালবাসি। তোমার আমার ভাগ্য পুরোপুরি জড়িয়ে গেছে।'

'আমরা কি করব বলতো ?' অস্পষ্ট কণ্ঠস্বর ফ্রান্সিসের। ওর চোখে মুখে উন্মত্ততার প্রকাশ দেখল চিনি। ঘুরে দাঁড়িয়ে চিনিকে বুকের মধ্যে টেনে নিল। চিনি চোখ বুজল। তার ঠোঁটে ফ্রান্সিসের ঠোঁটের স্পর্শ। ক্ষুধার্ত ফ্রান্সিস !

'চিনি ! আমার চিনি ! তুমি আমার ব্রোঞ্জের মূর্তি ! রক্তে তোমার বনের পশুর উত্তাপ। আমার নিঃশ্বাস ভরে আছে তোমার দেহের গন্ধে, আমার রক্তে তুমি আগুন জ্বালিয়েছ। তোমায় ছাড়া আমি বাঁচতে পারিনা চিনি। বাঁচতে পারিনা—'

এই সোহাগভরা আকুলতার সামনে বোবা হয়ে যায় চিনি !

লাগোস। কর্মব্যস্ত আর উৎফুল্ল। রাস্তা দিয়ে বাস চলছে।

ফেরিতে করে লোক নদী পার হয়ে আপাপায় চলেছে। সেখানে কল কারখানার সংখ্যা কম নয়।

অফিসের জানালা দিয়ে চিনি দেখল, ডলফিনখানা ঝড়ের বেগে চলে গেল। ফ্রান্সিস ছাড়া আর কেউ না। বড় কর্তার গমগমে গলার আওয়াজে চিনি আবার ডিক্টেশনের দিকে মন দিল, শর্টহ্যাণ্ডের ফুল্‌ঝুরি ঝরতে লাগল প্যাডের ওপর।

'ব্যস, এই যথেষ্ট।' চিনির বড়কর্তা বলল।

চিনি উঠে পড়ল। কাগজপত্র গুছিয়ে বেরিয়ে যাবার মুখে হঠাৎ একটা কাগজ মাটিতে পড়ে গেল। চিনি নিচু হয়ে কাগজটা কুড়িয়ে নিল।

'চিনি—'

'স্যার—'

'দাঁড়াও একটু।'

চিনি দেখল ওনার মুখে গভীর চিন্তার ছাপ। ফাইল ঘেঁটে চলেছেন। উনি প্রায়ই এমনি কাজের মধ্যে তলিয়ে যান। একেবারে অন্য জগতে তখন তাঁর বাস।

চিনির মনের মধ্যে অনেক প্রশ্নের আনাগোনা। উনি কি ফ্রান্সিসের কথা জানেন? জানেন নিশ্চয়। চিনিকে উনি কিছু জিজ্ঞেস করবেন কি? চিনি সঙ্গে সঙ্গে গুটিয়ে গেল।

মুখ না তুলেই উনি বল্লেন, 'কয়েক দিনের মধ্যেই আমাকে টুরে বেরোতে হবে। একজন ভাল সেক্রেটারি টাইপিষ্ট সঙ্গে থাকা দরকার। জানো নিশ্চয়, কিছুদিন যাবত মিস ওয়েলসের শরীরটা তেমন ভাল যাচ্ছে না। তুমি গেলেই সবচেয়ে ভাল হয়। এ পর্যন্ত তো কখনো আমার সঙ্গে টুরে বেরোওনি।'

চিনি দেখল ফ্রান্সিস যেন হাসতে হাসতে বলছে, নাইজিরিয়ার হাতছানি। বড়কর্তা কি যেন বলছেন, কিন্তু সেটা চিনির কানে পৌঁছচ্ছে না। সব কেমন গুলিয়ে যাচ্ছে চিনির। ও কোথায়

রয়েছে? কে কথা বলছে? কি বলছে? উনি কি জানেন না এরপর ফ্রান্সিস কি কাণ্ডটা বাধাবে?

হঠাৎ চিনি খেয়াল করল বড়কর্তা চুপ করে বসে আছেন। ওর উত্তরের জন্য অপেক্ষা করছেন।

'তুমি যাবে তো?'

'আজ্ঞে—'

'যাবে তো?'

'হ্যাঁ—হ্যাঁ—স্যার—যাবো।'

ঘন লতাপাতার ঝাড় পেরিয়ে বাড়িতে ঢুকতে গিয়ে চুলগুলো এলোমেলো হল চিনির। জানালার উজ্জ্বল আলোটাই জানান দিচ্ছে যে ফ্রান্সিস এখনো শুতে যায়নি। বেশ গরম পড়েছে আজ। সারাদিন ধরে ফ্রান্সিসের খোঁজ করেও তাকে ধরতে পারেনি চিনি।

সিঁড়িতে পা দিতেই ফ্রান্সিসের ভৃত্য জিদ-এর সঙ্গে দেখা। জিদ বলল, 'সাহেবের তবিয়ত ভাল নেই।'

ওর বুকটা ধক্ করে উঠল। জিদকে একপাশে ঠেলে ছুটে গেল ঘরের ভেতরে।

ফ্রান্সিস বিছানায় শুয়ে আছে। মুখটা দেওয়ালের দিকে ফেরান। পাশে বলে চিনি ওর হাতটা ধরল।

'ফ্রান্সিস—আমি তোমায় ভালবাসি ফ্রান্সিস।'

'চিনি—'

কি করে ও ফ্রান্সিসকে কথাটা বলবে? চিনি দেখল ফ্রান্সিস ইতিমধ্যেই জিনিসপত্র গুছোতে শুরু করে দিয়েছে।

'বড্ড তেষ্টা পেয়েছে সোনা।'

ফ্রান্সিসের একথা বলার কারণ ও জানে। ফ্রান্সিস ওর হাঁটা চলা দেখতে বড্ড ভালবাসে। আস্তে আস্তে ফ্রিজের কাছে গেল

চিনি। আজ ওর পরনে দেশী পোশাক আর তার রঙ নীল। ফ্রান্সিস নীল রঙটাই পছন্দ করে।

ট্রেতে করে পানীয়টা এনে নামিয়ে রাখল চিনি। হঠাৎ একটা গরম হাতের ছোঁয়া লাগল গালের ওপর।

ফ্রান্সিসের চোখ দুটো উত্তাপে পীত বর্ণ। আলতো করে চিনি ওর হাতটা সরিয়ে দিল। 'তুমি কি অসুস্থ?'

'তুমিই আমার অসুস্থতা। আমি নাইজিরিয়াতেই মরতে চাই। আমি মরতে চাই- তোমার ভালবাসা শুদ্ধুই আমি মরতে চাই। তুমি কি মনস্থির করলে চিনি?'

'তোমার সঙ্গে ফ্রান্সে যাবার ব্যাপারে?'

'হ্যাঁ -তুমি কি যাবে?'

'তুমি তো জানো ফ্রান্সিস, আমি যেতে চাই কিন্তু---'

'কিন্তু নাইজিরিয়ার হাতছানি । জানি, জানি—'

এই ব্যঙ্গ অসহ্য লাগে চিনির। 'নিষ্ঠুর হয়োনা ফ্রান্সিস। নাইজিরিয়া হাতছানি দিচ্ছে সত্যি কিন্তু তোমার আহ্বান তার চেয়ে কম নয়। আমি তো শুনছি তোমার কথা। তুমি যে ভালবাস ফ্রান্সিস, না শুনে কি উপায় আছে!'

হে ভগবান। কেন, কেন আমি ওকে এরকম পাগলের মত ভালবাসলাম? কত ছেলে তো আমার বিয়ে করতে চেয়েছিল তবু কেন এরকম পাগল হলাম?

চিনি ওর কোলের ওপর ফ্রান্সিসের উষ্ণ হাতটার দিকে তাকাল। ফ্রান্সিসের চোখে অন্তর্ভেদী দৃষ্টি। চিনির মনে পড়ে গেল ওদের প্রথম সাক্ষাতের কথা! ভারী অদ্ভুত ভাবে ওদের আলাপ হয়েছিল আফ্রিকান সংস্কৃতির ওপর এক আন্তর্জাতিক আলোচনা সভায়।

শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত ঘরটায় আফ্রিকান বই ছবি আর ভাস্কর্যের মধ্যে বসে ফ্রান্সিস ভারী শান্তি পাচ্ছে।

চিনি ইয়ারফোন ছুটোকে দু'কানে ঠিক মত লাগিয়ে নিল। ও একটা টেবিলের সামনে বসে আছে। সবাই কথা বলাবলি করছে। দোভাষীরা আস্তে আস্তে থেমে থেমে কথা বলছে। চিনি উৎকণ্ঠা ভরে ফ্রান্সিসের কথা অনুধাবন করার চেষ্টা করছে। কিন্তু ফ্রান্সিসের কোন ভ্রূক্ষেপ নেই। মহা উৎসাহে অনর্গল বকে চলেছে।

'…এই জন্যেই এই সিদ্ধান্তে পেঁছিতে হয় যে সাম্রাজ্যবাদী শক্তিদের কাছ থেকে আমরা উত্তরাধিকার সূত্রে খুব ভাল কিছু অর্জন করিনি। আফ্রিকার শিক্ষিত সমাজের পেটি বুর্জোয়া মনোভাব থেকেই বোঝা যায়, সাম্রাজ্যবাদীরা যে মনে করত আফ্রিকানরা নিজেরাই নিজেদের সংস্কৃতির ধারক ও বাহক, সেটা ভুল।

'এখন সময় এসেছে, যখন…'

চায়ের সময় অভ্যাগতরা ছোট ছোট দলে ভাগ হয়ে গেল। উত্তেজিত আলোচনার মধ্যে ফ্রান্সিসের বক্তৃতা নিয়েও কথা হচ্ছিল। সবাই ঘুরে ঘুরে প্রদর্শনী দেখছে। চিনিও সেই দলে মিশে গেল।

ফরাসী আর ইংরিজি মেশানো অদ্ভুত রকমের সুরেলা ভাষায় ফ্রান্সিস কথা বলছে। তার অনুভবের সূক্ষ্মতা আবার তাতে আরো মাধুর্য মিশিয়েছে। ওর অর্ধেক কথাই ও বুঝতে পারছিল না। কিন্তু বোঝাবার জন্যে তার তেমন কোন ব্যাকুলতাও ছিল না। অবশ্য আলোচনাচক্রে একজন রিপোর্টার হিসেবে সে এসেছে। কি আলোচনা হচ্ছে একেবারে বোঝার চেষ্টা না করাটাও ঠিক নয়।

ওরা বই ছেড়ে কফিতে মন দিল, তারপর কফি শেষ করে নিজেদের নিয়ে পড়ল। ফ্রান্সিস প্রায় ছ ফুট লম্বা। টকটকে লাল একটা জামা পরেছে। হাতটা গোটানো। ঘন খয়েরী লোমে

ভর্তি হাত দুটো। সারাক্ষণই ঠোঁটের কোণে হাসির ইঙ্গিত। ভাব দেখে মনে হয় প্রফেসার, সমালোচক, নৃতত্ত্ববিদ আর দর্শক - যারা যারা এখানে আফ্রিকান সংস্কৃতির বিষয়ে আলোচনা করবে বলে জড় হয়েছে তাদের সবাইকেই ও চেনে। কে কি বলবে সবটাই ওর জানা।

আলোচনা সভায় যারা এসেছে, বেশবাসে তারা কেউই খুব পরিপাটি নয়। চিনি কিন্তু সযত্নে সেজেছে। চুলটাকে গোছা পাকিয়ে পিগ-টেল করেছে। পাতলা প্রিন্টের দামী কাপড়টাকে এক হাতের ওপর দিয়ে খানিকটা ঝুলিয়ে রেখেছে। এই নিখুঁত সাজসজ্জার ব্যাপারটাই এখন তার কাছে একটা বোঝার মতো ঠেকছে। চিনি অবশ্য একটু আশ্বস্ত বোধ করল টেবিলের উল্টো দিকে তাকিয়ে, এক চোখ-ধাঁধানো তরুণীকে নোট নিতে দেখে। তার পরণের স্বচ্ছ আবছা নীল নাইলনের কাপড়টা, বাতাসের মত ফুরফুরে আর গায়ে যেন একেবারে আষ্টেপৃষ্ঠে জড়িয়ে আছে। রঙ চঙ যা মেখেছে, আফ্রিকান কোন মেয়ে হলে হলে কি হয়, বিদেশী ফ্যাশনের মাপকাঠিতেও কোন খুঁত বার করা যাবে না। চিনি পরে জানতে পেরেছে, ইনি রেডিও নাইজিরিয়ার রিপোর্টার।

'আমি সেক্রেটারি টাইপিস্ট।' হাসতে হাসতে চিনি ফ্রান্সিসের প্রশ্নের উত্তর দিল। 'আঠারো জন সেক্রেটারির মধ্যে একজন।'

'তুমি কি পুরোপুরি ইংরিজিতে কথা বলো?'

'হ্যাঁ।'

'লিখতেও পারো?'

'না। কিন্তু পড়তে পারি। রিপোর্টার হিসেবে এসেছি। না, না, আমি লিখিনা। পড়ি, বই পড়ি, বিশেষ করে প্রেমের গল্প।'

ফ্রান্সিসের মুখটা লাল হয়ে উঠল। চিনির মনে হল কথাটা বড় বেফাঁস বলে ফেলেছে। ভুলটা শুধরে নিতে চাইল সঙ্গে সঙ্গে। 'প্রথম

যে প্রেমের গল্পটা আমার সত্যিকার ভাল লেগেছিল সেটার নাম—প্রেমের হাতছানি যখন…'

'ও আচ্ছা! মানে আমি, আমি নামটা শুনিনি।'

'অনেকদিন আগের কথা, আমি তখন কনভেন্টে পড়ি।' পুরো গল্পটাই চিনির মনে ছিল। সঙ্গে সঙ্গে সে শুরু করে দিল। গল্পের মাঝখানে হঠাৎ ওর খেয়াল হল এরকম একটা গুরুগম্ভীর আলোচনা সভায় এইসব গল্প ভীষণ বেমানান লাগছে। চিনি কথা থামাতেই দুজনে নীরবতার সমুদ্রে ডুবে গেল। অথচ আর সকলে তখন গল্পে মশগুল।

তারপর ঘণ্টা পড়তে যে যার সীটে গিয়ে বসল।

বছর ঘুরে গেছে, চিনি এখনো লাগসে কাজ করে। ওকে যারা চেনে তাদের কাছ থেকে ওর কথা শোনা যায়। দীর্ঘশ্বাস ফেলে বিষণ্ণভাবে ঘাড় নাড়তে নাড়তে ওরা সব কথাই জানায়। খুব বেশি মাথা ঘামাবার দরকার হয় না, এমনিতেই বোঝা যায় কেন ওকে কেন্দ্র করে অমন আন্তর্জাতিক বিতর্কের ঝড় বয়ে গেছল।

চিনি কিন্তু এখন একেবারে বোবা হয়ে গেছে। ভারী শান্ত আত্মমগ্ন আর গভীর। কাজের মধ্যে একেবারে ডুবে আছে। মাঝে মাঝে ওর বড়কর্তা ওকে নিজের ঘরে ডেকে পাঠান। বলেন, 'শোনো চিনি, বড্ড খাটুনি যাচ্ছে তোমার। কদিন বিশ্রাম নাও না।'

চিনি হাসে, রহস্যময় হাসি। বলে, 'তা হক। দেশের জন্যে কাজ করতে আমার ভাল লাগে।'

ও যখন এভাবে কথা বলে বড়কর্তা তাড়াতাড়ি সিগারেটটা নিবিয়ে ফেলেন। চিন্তিতভাবে নীরবে চেয়ে থাকেন। চিনি যেন তাঁর সত্তার গভীরে কোন কোমল জায়গা স্পর্শ করে।

'আমি কি যেতে পারি এখন?'

বড়কর্তার মুখে এরপর একটা মৃদু হাসি দেখা দেয়। চিনির কথাকে কোন গুরুত্ব না দিয়েই তিনি বলে চলেন—'দুর্ভাগ্যের হাত থেকে কেউই রক্ষা পায়না। তা বলে সারাজীবন কি এ রকম একা কাটাবে? ফ্রান্সিসের মৃত্যুর জন্যে তুমি কেন নিজেকে দায়ী করবে? তুমি ওকে ভালবাসতে ঠিকই। কিন্তু, কিন্তু এটা একটা দুর্ভাগ্যজনক ঘটনা।'

চিনির চোখ দিয়ে জল গড়াতে থাকে। দাঁড়াবার শক্তিটুকুও যেন হারিয়ে ফেলে। এদিক ওদিক তাকিয়ে একটা চেয়ার দেখতে পেয়ে অবশ দেহের ভারটা ছেড়ে দেয় তার ওপর। অফিসের বড়কর্তা এখন তার বন্ধুর মতো। তিনি জানেন চিনির যোগ্যতার কথা। তিনি অনুভব করেন, চিনির ব্যক্তিগত সুখদুঃখের সঙ্গে জড়িয়ে আছে তার কাজ করার ক্ষমতা।

'আচ্ছা চিনি, আর কোন ছেলেকে তোমার ভাল লাগে না? তুমি তো বেরোতেই চাও না। তুমি, তুমি—যাকগে, কি হবে এসব বলে।'

বলবার সব কথা যেন ফুরিয়ে যায়। যে মানুষটা লক্ষ লক্ষ লোককে শুধু কথা দিয়ে খেপিয়ে তুলতে পারে সেও নির্বাক হয়ে যায় চিনির সামনে। আর চিনি কে, না তাঁরই টাইপিষ্ট।

উনি কথা বলেন, চিনি শোনে, শুনতেই থাকে। এক সময় মনে হয় দেওয়ালের ওপার থেকে যেন কথাগুলো ভেসে আসছে। চিনির প্রখর ব্যক্তিত্ব ও নারীত্বের মর্যাদা দুজনের মাঝখানে একটা বিরাট ব্যবধান গড়ে তোলে। ভাবনার জগতের এই বিশাল ব্যবধানের ওপার থেকে চিনি ওনাকে দেখতে পায়না, ওনার কোন কথা ওর কানে এসে পেঁছিয় না—এখানে চিনি সম্পূর্ণ একা, নিঃসঙ্গ এক মূর্তিময়ী প্রেমিকা।

অনুবাদ | সিদ্ধার্থ ঘোষ, রমা ভট্টাচার্য

জেম্‌স্ ন্‌গুগি

সবাই বলতো ওদের মতো সুখী পরিবার সচরাচর দেখা যায় না। ওয়ারিউকি এক নামকরা বিত্তবান কাঠের ব্যবসায়ী আর মিরিয়ামু তার বিনীতা স্ত্রী, ঈশ্বরে বিশ্বাসী, স্বামী পরিবারের প্রতি কর্তব্য-পরায়ণ। পরস্পরের প্রতি ভালবাসা আর বিশ্বাস থাকলে একটি মানুষ আর তার স্ত্রী হাতে হাত মিলিয়ে জীবনে কতদূর উন্নতি করতে পারে ওরা তার সার্থক উদাহরণ। লোকটি খুবই লম্বা, একেবারে পেটানো চেহারা, আর তাঁর স্ত্রী ছোটখাট, শান্ত, স্বল্পভাষী। বিশাল দেহ স্বামীর পাশে আবছা ছায়ার মতো।

ওদের যখন বিয়ে হয় ওয়ারিউকি তখন কপর্দহীন, একটা খামারে দুধ বিক্রির হিসেব রাখত। মাসে তিরিশ শিলিঙ মাইনে। সে কালের হিসেবে তা যতই বেশি হক না ওয়ারিউকির মদের গেলাসেই সব উড়ে যেত। কিন্তু তখন সে যুবক—বেপরোয়া। বিষয়-আশয় কি ক্ষমতার মোহ তাকে মোটেই বিব্রত করতো না। তা বলে সে মজুরদের সঙ্গে জোট বেঁধে প্রতিবাদ বা বিক্ষোভ প্রদর্শনে অংশগ্রহণ করত না তা নয়। অনেক সময় সে মজুরদের হয়ে চিঠিও লিখে দিত। বিপজ্জনক ও সন্দেহভাজন চরিত্রের লোক বলে চিহ্নিত হওয়ায় দু'একটা খামার থেকে তার চাকরি অবধি গিয়েছিল।

ওয়ারিউক আসলে খেলাধুলোয় আর কয়েকটা সার্কাসের কসরত দেখানোর মধ্যে সত্যিকার আনন্দ পেত। একটা র‍্যালে বাই-সাইকেল ছিল ওর প্রাণ। সেটায় চড়ে বন্‌বন্‌ করে ঘুরে বেড়াত এখানে ওখানে আর গুনগুন করে পুরনো দিনের জনপ্রিয় রেকর্ডের গানের সুর ভাঁজত, জিম্‌ রজার্সের নকল করে গলা কাঁপাত। মাঝে মাঝে ও আবার মোলা শহরে উৎফুল্ল দর্শকদের সামনে সাইকেলের খেলা দেখাত—সাইকেলের ওপর ডান পা রেখে, বাঁ পা তুলিয়ে ব্যালেন্স রাখত আর পাখীর ডানার মতো মেলে ধরত তু'হাত। আবার কখনো স্রেফ প্যাডেল্‌ করেই উল্টোমুখে সাইকেল চালাত। দারুণ মজা পেত ছোট ছেলেমেয়েরা। সাইকেলটা পুরনো হলে কি হবে, রঙের বাহার কম ছিল না। চোখ-ধাঁধানো লাল নীল ও সবুজের ছড়াছড়ি। নিজের হাতে তৈরি কয়েকটা লাইটও সে সাইকেলে লাগিয়েছিল, আর পিছনে ঝুলিয়ে রেখেছিল একটা বিজ্ঞপ্তি—'ওভারটেক্‌ করেছ কি মরেছ!'

শুধু সাইকেলের কেরামতিতেই নয়, ব্যঙ্গ-কৌতুক অভিনয়েও কম যেত না ওয়ারিউকি। মাঝে মধ্যেই সে শ্বেতাঙ্গ প্রভুদের নকল করত—হাঁটাচলা, কথা বলা, আদব কায়দা, এমন কি কালো মানুষদের সঙ্গে তাদের আচরণের খুঁটিনাটি পর্যন্ত তার ব্যঙ্গ আক্রমণের আওতায় পড়ত। যেসব আফ্রিকান সাদাদের কৃপাভাজন হবার চেষ্টা করত, তারাও রেহাই পেত না। ব্যঙ্গ অভিনয়ের সঙ্গে সঙ্গে চলত তার নাচ। বেশ ভালই নাচত। একে কোমর তুলিয়ে মোম্বোকো নাচ তার ওপর প্যান্টের বাঁ পাটা হাঁটুর ওপর অবধি কাটা! বেশ ভালরকম বাহবা পেত ওয়ারিউকি। বিশেষ করে মেয়েদের কাছ থেকে। তারা তো ওর নাচ দেখার জন্যে অস্থির হয়ে থাকতো।

মিরিয়ামুকে ও প্রথম এইভাবেই আকৃষ্ট করে।

রবিবার বিকেল হলেই মিরিয়ামু ঠিক সুযোগ করে নিয়ে বাজারের

চত্বরে ছুটে আসত। সেখানে তখন ওয়ারিউকির ভক্তবৃন্দ জমা হত। মিরিয়ামুর মনটা তখন ওয়ারিউকির দুঃসাহসিক কার্যকলাপের সফলতার সঙ্গে সঙ্গে কিংবা তার কোমর-দোলানো নাচের তালে তাল মিলিয়ে নেচে উঠত।

বলতে গেলে মিরিয়ামুরা ছিল ও অঞ্চলের বেশ ধনী লোক। ওর বাবা ডগলাস জোন্সের মুদিখানা আর চায়ের দোকান ছিল। মিরিয়ামুর বাবা মা দু'জনেরই অগাধ বিশ্বাস ছিল ধর্মে। সকাল সন্ধ্যা তাঁরা প্রার্থনা করতেন। প্রার্থনা করতেন প্রত্যেকবার খাবার আগে। আশেপাশে যত শ্বেতাঙ্গ কৃষক তাঁদের শ্রদ্ধার চোখে দেখত। জেলার অফিসার সাহেব সুযোগ মতো প্রায়ই বাড়ি এসে কুশল বিনিময় করে যেতেন। গোঁড়া ক্রিশ্চান হিসেবে মিরিয়ামুর বাবা-মা মোটেই চাননি যে তাঁদের মেয়ে বিয়ে করে একটা পাপের মধ্যে, যন্ত্রণা আর দারিদ্র্যের মধ্যে গিয়ে পড়ুক। ওই মুরেবি জাতের লোকটার মধ্যে এমন কি দেখেছিল মিরিয়ামু? তাঁরা ওকে বারণ করে দিয়েছিলেন প্রতি রবিবার ওই বীরপূজার আসরে হাজির না হবার জন্যে। মিরিয়ামুর কিন্তু একটা স্বাধীন চেতনা ছিল। যদিও ছেলেবেলা থেকেই ধর্মের দোহাই পেড়ে সেটাকে ঘুম পাড়িয়ে রাখা হয়েছিল এতদিন। প্রতি রবিবার প্রার্থনা সভায় তাকে শুনতে হয়েছে: 'তুমি তোমার পিতামাতাকে মান্য করবে আর মান্য করবে যারা তোমার শাসক তাঁদের।' তাছাড়া আফ্রিকানদের কি কি বিলিতি আচার আচরণ রপ্ত করা উচিত সেটাও তাকে পাখীপড়া করে শেখানো হয়েছিল। ওয়ারিউকি কিন্তু তার র‍্যালে বাইসাইকেল নিয়ে গোয়ালার গান গেয়ে আর ঢলঢলে তাপ্পিমারা প্যাণ্ট পরে নাচ দেখিয়ে সব উল্টোপাল্টা করে দিল। ডগলাস জোন্সের বন্ধ্যা জগতের বাইরে সে আরেকটা জগতের সন্ধান পেল। এখানে আলো আছে, প্রাণ আছে, স্বাধীনতা আছে। ওয়ারিউকির নোংরা ছেঁড়া জামাকাপড় মিরিয়ামুকে কিঞ্চিত দ্বিধাগ্রস্ত করেনি তা নয়। তবু

সে তার সঙ্গ ছাড়েনি। নিজের দৃঢ়তায় নিজেই অবাক হয়ে গেছিল মিরিয়ামু। ডগলাস জোন্সেকও শেষ পর্যন্ত খানিকটা সুর নরম করতে হয়েছিল। মেয়ের তিনি খারাপ চাননি। এমন অপদার্থ ছেলে বলেই তাঁর যত আপত্তি। পুরো শিক্ষাও পায়নি—কাজের মধ্যে কেবল ইংরেজ ক্ষেত খামারের সুষ্ঠু শান্তিপূর্ণ জীবনে আর উন্নতির পথে বাধা সৃষ্টি করা। জেলার অফিসারও একই কথা বলতেন: 'হাজত বাস ছাড়া এদের আর কোন গতি নেই।' শুধু লোভের বশে এরা নাকি সাদাসিধে অশিক্ষিত মজুরগুলোকে খেপায়। শ্বেতাঙ্গ বাসিন্দা আর ধর্মীয় প্রচারকদের নামে কুৎসা রটায়। কাজেই ওয়ারিউকিকে অত্যন্ত বিপজ্জনক ধরনের একটি মানুষ ছাড়া অন্য কিছু মনে কবার কোন উপায় ছিল না।

মিরিয়ামুর বাবা অতঃপর ওয়ারিউকিকে ডেকে পাঠালেন। একবার স্বর্ণমূল্যের ওজনে যাচাই করে নিতে চাইলেন তাকে। ওয়ারিউকি সযত্নে তার প্যান্ট রিপু করল, চিরুনি দিয়ে চুল আঁচড়ে বুরুশ দিল। খুবই স্বাভাবিক—এমন একজন ধনী ক্রিশ্চান ব্যক্তির মুখোমুখি দাঁড়াতে হবে ভাবতেই তার অস্বস্তি হচ্ছিল। ওয়ারিউকি এল। তাকে কেউ বসবার কথা বলল না, নীরবে খানিকক্ষণ শুধু আপাদমস্তক নিরীক্ষণ করে গেল। তারপর অবশ্য একটা চেয়ার এল। দেওয়ালের দিক থেকে সে আর চোখ ফেরাতে পারেনি। তবু সে স্পষ্ট বুঝতে পারছিল উপস্থিত যত মান্যগণ্য লোক তার দিকে স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে। তাদের চোখ দিয়ে শুধু অবজ্ঞা ঝরে পড়ছে। ডগলাস জোন্স কিন্তু খাঁটি ক্রিশ্চান। উদারতায় ভরপুর। 'চা দাও, চা দাও! আমাদের জামাই বলে কথা! তা, কি কাজ করো বাবা? দুধ বিক্রির হিসেব রাখো? ও—ও—তা বেশ। এতো সত্যি কথা যে কোন মানুষই জন্মেই বড়লোক হতে পারে না। বাহুবল থেকেই সব আসে। আর তুমি তো জোয়ান। তা বাবা, মাইনে কত? মাসে তিরিশ শিলিং? তাতে কি হয়েছে। এর

চেয়েও কত খারাপ অবস্থা থেকে কত মানুষ ওপরে উঠেছে। সবই ঈশ্বরের কৃপা।'

ওয়ারিউকি জোন্সের কথায় খানিকটা স্বস্তি বোধ করেছিল। সাহস করে হাসি মুখে চোখ তুলে তাকিয়েছিল। কিন্তু ওই একবারই। জোন্সের চোখের দৃষ্টি সঙ্গে সঙ্গে তাকে দেওয়ালের দিকে মুখ ফিরিয়ে নিতে বাধ্য করেছিল। এরা ওর ঘাতক। কিন্তু ঘাতকরা খুব শান্ত মানুষ—ঝকঝকে ইস্পাতের ফলাটা নির্বিকারে ধীরে সুস্থে আমূল বিঁধিয়ে দিল। 'আচ্ছা ওয়ারিউকি, তুমি এত কম বয়সে বিয়ে করতে চাও কেন? অবশ্য একথা জিগ্যেস করাও ঠিক নয়। আজকালকার ছেলে তোমরা। আমাদের দিন তো আর নেই। আর আমরাই বা বলবার কে? বিয়েতে আমাদের কোন আপত্তি নেই। তবে একটা কথা। ক্রিশ্চান মতে বিয়ে করতে হবে। গীর্জেয় বিয়ে করা মানেই টাকাপয়সা বেশ কিছু দরকার। আর ঠিক সেইজন্যেই তোমায় আজ আমরা এখানে ডেকেছি। কিছু যদি মনে না করো বাবা, পোস্ট-অফিসে তোমার অ্যাকাউন্টে কত টাকা আছে সেই সেভিংস-বইটা একবার দেখাও। আমরা নিশ্চিন্ত হই।'

ওয়ারিউকিকে ওরা পিষে দিয়েছিল। ও একবার তাকিয়ে দেখল, সবার চোখে কৌতুক যেন হাসছে। ও যেন শিকার, আর শিকারীরা তাকে কোণঠাসা করে ফেলে রুদ্ধশ্বাসে প্রতীক্ষা করছে। শিকার বধের প্রতিটি মুহূর্ত উপভোগ করছে। ওয়ারিউকির দৃষ্টি ঝাপসা হয়ে গেছল, ডগলাস জোন্সের কথাগুলো অস্পষ্টভাবে কানে আসছিল। মেয়েকে তিনি এরকম দীনহীন জীবনের মধ্যে কোনো মতেই ঠেলে দিতে রাজী নন। ওয়ারিউকি চোখ তুলে দেখল সামনেই খোলা দরজা, দরজার ওপারে ফাঁকা উন্মুক্ত প্রান্তর।

ওয়ারিউকি পালিয়ে বেঁচেছিল। প্রাণভরে শ্বাস নিয়েছিল আবার নিজের পরিচিত জগতে পা রেখে। তবু কোথায় যেন একটা

আঘাতের ক্ষত রয়ে গেল। আগের মতো তার দৃষ্টি আর সেই আনন্দের সন্ধান পেল না।

মিরিয়ামু ওর পিছনে পিছনেই ছুটে বেরিয়ে এসেছিল। ডগলাস জোন্সকে তখনকার মতো পরাস্ত করার একটা আনন্দ ক্ষণেকের জন্যে উপভোগ করেছিল ওয়ারিউকি। মিরিয়ামুকে নিয়ে ও পালিয়ে গেল। ইলমোর্গ বনে সিয়ানা কাঠের ব্যবসায়ীদের কাছে কাজ নিল ওয়ারিউকি। একটা জরাজীর্ণ ঘর হল তাদের আস্তানা। তবু ভারতীয় মালিকদের নিত্য নৈমিত্তিক গালিগালাজের পর ঘরে ফিরে অত্যন্ত নিশ্চিন্ত বোধ করত ওয়ারিউকি। দিনে দিনে ওয়ারিউকি অপমান হজম করার কায়দাটাও আয়ত্ত করে ফেলল। করাত টানাটানির ছন্দে ছন্দ মিলিয়ে সে গান গাইতে শুরু করল। একদিকে ও কাঠের গুঁড়ির নিচে হাঁটু গেড়ে বসত, অন্যদিকে আরেকজন দাঁড়িয়ে থাকত গুঁড়িতে পা দিয়ে। ওয়ারিউকি গল্প ফাঁদত। গাছের গুঁড়ি আর অরণ্যের রূপকথা। কখনো কখনো তার গল্পের শেষে বিষাদের সুর বাজতো—করাত আর বনের মধ্যে বিয়ে হবার প্রসঙ্গ উঠত তখন। গল্পে গানে মনটা তার হাল্কা হয়ে যেত। কাঠের গুঁড়োয় সারা গা ভরে গেলেও কোন নজর দিত না। তারপর যখন তার গুঁড়ির ওপর দাঁড়িয়ে কাঠ চেরাইয়ের করার পালা আসত, একটা বন্য শক্তি যেন তাকে ভর করত। কাঠ কাটতে কাটতে এক পা এক পা করে পিছনে সরতো আর ডেমিনা মাথাথির গান গাইত। বহু কাল আগে ইলমর্গের চেয়েও অনেক বড় আর অনেক ঘন বনজঙ্গল সাফ করেছিলেন কিংবদন্তির ডেমিনা মাথাথি।

বাতাসের গুঞ্জনে বা গর্জন ছাপিয়ে মিরিয়ামুর কানে আসত সেই গান। উথাল পাতাল করত তার বুক। সত্যি গীর্জার সেই বিষাদময় স্তোত্রপাঠের সঙ্গে এর আকাশ-পাতাল পার্থক্য। আর এই পার্থক্যটাকেই সে ভালবাসত, মনপ্রাণ দিয়ে ভালবাসত। শনি আর রবিবার ওয়ারিউকি তাকে বনের মধ্যে নাচের আসরে নিয়ে

যেত। বাড়ি ফেরার পথে বনের মধ্যে দেখেশুনে তারা একটা ঘাসের বিছানা খুঁজে বার করত। তারপর প্রেম। সুখে আর বিস্ময়ে ভরে থাকত রাতগুলো। ওয়ারিউকির দেহের চাপে সে গুড়িয়ে উঠত আর একই সঙ্গে পিঠে ফুটত কাঁটায় ভরা পাইন পাতা। তারপর ওয়ারিউকি যখন তার জ্বলন্ত পৌরুষ দিয়ে তাকে বিদ্ধ করত, মিরিয়াম্ চেঁচিয়ে উঠত, 'উহ্ মাগো—ও মা!'

ওয়ারিউকিও কম খুশী ছিল না। সমস্ত ব্যাপারটাই ওর বিস্ময় বলে মনে হত। অমন উঁচু ঘরের মেয়ের ভালবাসা পেল কী করে! সে তো রাস্তার ছেলে, বাবাকে হারিয়ে রাস্তায় রাস্তায় ঘুরে বড় হয়ে উঠেছে। (ওর বাবা প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময় জার্মানদের বিরুদ্ধে বৃটিশদের হয়ে অস্ত্র আর খাদ্য বইতে গিয়ে টাঙ্গানাইকায় মারা যান।) তবু ওয়ারিউকি আর আগের মানুষ ছিল না। থেকে থেকে হঠাৎ ওর মনে পড়ে যেত ডগলাস জোন্স আর তার পরিজনদের সঙ্গে সাক্ষাৎকারের কথা। ও কোনদিন সে কথা ভুলতে পারবে না— ডগলাস জোন্স আর তার বন্ধুরা খলখলিয়ে হেসে উঠছে, তার পৌরুষ আর আত্মসম্মানকে হেয় প্রতিপন্ন করতে চাইছে মিরিয়াম্ আর তার মার সামনে!

না। কক্ষনো না। ওয়ারিউকি তা হতে দেবে না। সে ওদের দেখিয়ে দেবে। ওদের মুখের ওপরে বিদ্রূপের হাসি ছুঁড়ে দেবে।

কিছু দিনের মধ্যেই ওয়ারিউকির গানের মধ্যে একটা অস্থিরতা প্রকাশ পেল—আশা ভঙ্গের আর প্রতিজ্ঞা পালনের ব্যর্থতার। করাতের দাঁতের মতো কর্কশ শোনাতে লাগল তার গলা। সিয়ানা ব্যবসায়ীদের ওখান থেকে কাজ ছেড়ে মিরিয়ামুকে নিয়ে চলে এল লিমুরুতে।

মিরিয়ামুকে তার বুড়ী মার কাছে ফেলে রেখে সে কোথায় উধাও হয়ে গেল। প্রথমে খবর এল নাইরবি থেকে তারপর মোম্বাসা, না কুরু, কিসুমু এমন কি কাম্পালা থেকেও খবর পাওয়া গেল।

এক সময় গুজব ছড়াল ও নাকি বন্দী হয়েছে। একটি মুগাণ্ডা মেয়েকে নাকি বিয়েও করেছে। মিরিয়ামুর তবু প্রতীক্ষার শেষ নেই। ওর মনে পড়ে যেত ইলমর্গ বনে ফার্ন আর ঘাসের মধ্যে সেই ব্যথায় ভরা সুখের দিনের কথা। সেই স্মৃতি নিয়েই ও নিঃসঙ্গ শয্যার যন্ত্রণা আর জুন জুলাই মাসের লিমুরুর হাড় কাঁপানো ঠাণ্ডার কাছে নতি স্বীকার করেনি। বাবা-মার কাছে ফিরে যাওয়ার কোন প্রশ্নই ওঠে না, তারা ওকে ত্যাগ করেছে। ওর দেহে যে বীজ বপন করে গেছে ওয়ারিউকি তারই উষ্ণতা ওকে সব ভুলিয়ে দিয়েছিল। যথাসময়ে সন্তানের জন্ম আর সরল প্রাণ শাশুড়ির বন্ধুত্ব মিরিয়ামুর কাছে বিরাট সান্ত্বনা স্বরূপ ছিল। এরপর আরো গুজব শোনা গেল—সাদা মানুষদের মধ্যে সাজ সাজ রব পড়ে গেছে। তাদের নিজেদের মধ্যেই নাকি যুদ্ধ লাগবে। দেশের কালো মানুষদেরও সেই মারণ যজ্ঞে অংশ নেবার জন্যে দলভুক্তি শুরু হয়ে গেছে। এমন সময় ওয়ারিউকি ফিরে এল। সে কিন্তু পুরো বদলে গেছে। আগের মতো আর সে গান গায় না। মেপে মেপে কথা বলে। দিন সাতেক বাদেই আবার সে চলে গেল। বলে গেল যুদ্ধে যোগ দিতে যাচ্ছে। মিরিয়ামু বুঝতে পারল না কেন এই পরিবর্তন। তবু তার প্রতীক্ষার শেষ নেই। খেতের কাজে দিন কাটাতে লাগল।

ওয়ারিউকির একটিই চিন্তা। কি করে ওর অপমানের শোধ তুলবে। ওই ঘৃণাভরা দৃষ্টির ছবি তাকে মন থেকে যে করে হোক মুছে ফেলতেই হবে। মিশরে, প্যালেস্টাইনে, বর্মায়, ম্যাডাগাস্কারে—এক যুদ্ধক্ষেত্র থেকে আরেক জায়গায় সৈনিক ওয়ারিউকি বিচরণ করে। যুদ্ধ সম্বন্ধে তার বিশেষ কোন ধারণা ছিল না, কোন দিন প্রশ্নও করেনি এই যুদ্ধে কালো মানুষদের কি লাভ। ওর একমাত্র ইচ্ছা, যুদ্ধটা তাড়াতাড়ি শেষ হোক। ঘরে ফিরে আবার তার অভিযান শুরু হবে। বলা কি যায়, হয়তো যুদ্ধের পরে লুঠের ভাগ

পাবে খানিকটা। এতদিন তো পরাধীন কেনিয়ার শহরে শহরে মিথ্যেই সে ভাগ্যান্বেষণ করে ফিরছে। এবার হয়তো জীবন শুরু করার মতো রসদ সত্যিই জুটে যাবে। তাছাড়া ইংরেজরা প্রতিশ্রুতি দিয়েছে, একবার শয়তান জার্মানরা পরাজিত হক, ভাল ভাল চাকরি দেবে ওদের, অর্থ পুরস্কার দেবে। যুদ্ধ শেষে লিমুরুতে ফিরে এল ওয়ারিউকি। ক'দিনের জন্যে তার চোখে যেন ফের পুরোনো আগুন ধিকিধিকি করে জ্বলে উঠল। মিরিয়ামুকে ছেড়ে একটুও থাকতে চাইত না। মজা করে যুদ্ধের গল্প শোনাত, ছেলেকে শোনাত সৈনিকদের গান। মিরিয়ামুর দেহে সে অবার প্রেমের একটি বীজ বপন করল। ওয়ারিউকি আবার চাকরির খোঁজ নিতে শুরু করল। খবর পেল লিমুরুতে জুতোর কারখানায় ধর্মঘট চলছে। যত শ্রমিক ছিল সবাইকে ছাঁটাই করা হয়েছে। ওয়ারিউকি আরো অনেক বেকার লোকের দলে ভিড়ে কারখানার গেটে এসে দাঁড়াল কাজ করবে বলে। ধর্মঘটী শ্রমিকরা কিছুতেই ওদের কারখানায় ঢুকতে দিতে রাজী নয়। তাদের চোখে এরা বেইমান। কিন্তু হলে কি হবে, মাথায় হেলমেট চড়ানো পুলিশের দল বেটন চার্জ করে ধর্মঘটী কর্মীদের সরিয়ে দিয়ে নতুন কর্মীদের কারখানার ভেতরে ঢুকিয়ে দিল। ওয়ারিউকি অবশ্য কাজে যোগ দেয়নি। সে নাইরোবি চলে এল। যুদ্ধের পর দেশে ফিরে যারা কোন চাকরি পায়নি, নাইরোবির রাস্তায় রাস্তায় ঘুরে বেড়াচ্ছে, ও তাদের মধ্যে মিশে গেল। চাকরি নেই, কোন অর্থ পুরস্কারও নেই। 'ভালো' ইংরেজরা আর 'খারাপ' জার্মানরা এখন হাসিমুখে পরস্পরের সঙ্গে করমর্দন করছে। কিন্তু কেন কালো মানুষরা চাকরি পাচ্ছে না, এ প্রশ্ন ওয়ারিউকিকে বিব্রত করেনি। এই প্রশ্নের উত্তর চেয়ে যেসব মানুষ পুমওয়ানি, কাবিওকর, শাউরি ময় ও অন্যান্য জায়গায় জটলা করছিল ও তাদের সঙ্গে যোগ দেয়নি। ওর মনে হয়েছিল এর কোন মূল্য নেই। আগেও তো ও খেত মজুরদের সঙ্গে কত বিক্ষোভে

অংশ নিয়েছে। কোন ফল হয়েছি কি তাতে? কিছু না। তার চেয়ে বরং আগে যদি ওইভাবে বেকার ঘুরে বেড়িয়ে সময় নষ্ট না করে কিছু একটা করবার চেষ্টা করত, তাহলে মিরিয়ামু আর তার মার সামনে অমন অপদস্থ হতে হত না। তরুণদের মুখে শোভাযাত্রা, আবেদনপত্র আর বোমা-বন্দুকের কথা—দেশ থেকে সাদা চামড়াদের পিটিয়ে বিদায় করার কথা ওয়ারিউকি শুনত বটে কিন্তু এর সঙ্গে তার উচ্চাকাঙ্খা আর অর্থ অন্বেষণের কোন সংশ্রব ছিল না। ওয়ারিউকিকে সম্পূর্ণ নিজের চেষ্টায় প্রাচুর্যের রাজ্যের অধিশ্বর হতে হবে। ডগলাস জোন্সের মুখের সামনে অত্যন্ত তাচ্ছিল্যভরে তার প্রাচুর্যের বিজ্ঞাপন দাখিল করতে হবে। এক একটা করে দিন পেরিয়ে গেছে আর তার মনে এই ধনী লোকটির হাতে নিগৃহীত হবার স্মৃতি চিত্রটা যেন ক্রমশ আরো তীক্ষ্ণ হয়ে উঠেছে। নিদ্রাহীন রাতেও বারবার তাকে হনন করেছে এই স্মৃতি। ওয়ারিউকি একবারো ভাবেনি যে আসলে সাদা চামড়ারা আর ভারতীয়রাই সব জমিজমা সম্পত্তি আর ব্যবসার অধিকারী। তার চোখে শুধু ডগলাস জোন্সেরই ছবি ভাসত—পরনে খয়েরী স্যুট, ওয়েস্ট কোট, মাথায় টুপি, হাতে গোটানো ছাতা। এর সাফল্যের গোপন কথাটি কি? কি সেই গোপন কথা?

এইসব প্রশ্নের উত্তর খুঁজে পাবার আগেই মাউ মাউ যুদ্ধ শুরু হল। শ্রমিকদের একটা বিরাট অংশকে জোর করে ঢুকিয়ে দেওয়া হোল কন্‌সেন্ট্রেশন্‌ ক্যাম্পে। কোনোরকমে এই জাল থেকে সে নিজেকে বাঁচাল। ফিরে এল আবার লিমুরুতে। ভয়ঙ্কর ক্রোধে সে ফেটে পড়ল। না, সাদা চামড়া বা ভারতীয় কারুর ওপর তার কোনো রাগ নেই। এদের উপস্থিতি তার কাছে গাছপালা, পাহাড় ও নদীনালার মতই স্বাভাবিক। তার সমস্ত অসন্তোষ এ দেশের মানুষের প্রতি। শান্তি ও নিরাপত্তা বিঘ্নিত করার কি অধিকার আছে তাদের? আর তাও ঠিক এই সময়ে? যখন সে

সবেমাত্র ছ'চার আনা লাভ করতে শুরু করেছে? ঠিকই তো, কালো মানুষদের জন্য সুযোগ ও সাফল্য চারিদিকে ছড়িয়ে আছে। ব্রিটিশদের এই মিথ্যে কথাগুলোকে সে আজকাল সত্যি বলে ভাবতে শুরু করেছে। এভাবে প্রায় বছরখানেক সে তার চারপাশের ঘটনা সম্পর্কে একেবারে নিস্পৃহ, উদাসীন হয়ে রইল। সমস্ত মনপ্রাণ ঢেলে দিল ব্যবসায়। নিজেকে সঁপে দিল ঔপনিবেশিক শাসকের হাতে। এইজন্যই অল্পদিনের মধ্যেই সে ফল লাভ করতে শুরু করল। অন্য সকলে যখন কনসেন্ট্রেশান ক্যাম্পে পচে মরছে, জঙ্গলে লুকিয়ে থেকে শত্রুর মোকাবিলায় জীবন পণ লড়াইয়ে নেমেছে, সে তখন নিশ্চিন্ত, সহজ জীবনযাপন করতে ব্যস্ত। তার প্রতিবেশী যখন শেষ সম্বল জমিটুকু হারাচ্ছে, সে তখন পুরস্কারস্বরূপ লাভ করছে বাড়তি একটুকরো জমি। কিন্তু ওয়ারিউকির স্বভাবে কোনো নিষ্ঠুরতা নেই। সে শুধু চায় এই দুঃস্বপ্নময় দিনগুলির অবসান। তাহলেই সে তার ব্যবসা আবার পুরোদমে চালাতে পারবে। সে যে ডগলাস্ জোন্সকে কিছুতেই চোখের সামনে থেকে মুছে ফেলতে পারে না। সেই অপমান চাবুকের মত দেহে মনে জ্বালা ধরায়। অবশ্য সে এই যন্ত্রণাকে বাঁচিয়েই রাখতে চায় তার স্মৃতিতে। সে জানে একদিন আসবেই যখন সে মাথা উঁচু করে দাঁড়াতে পারবে ওই লোকটির পাশে।

মারালাল থেকে ঘরে ফিরে এল জোমো কেন্ইয়াত্তা। ওয়ারিউকির উৎসাহে একটু বুঝি ভাঁটা পড়ল। তার ভয় ভয় করতে লাগল। এইসব সংগ্রামী যোদ্ধারা কি চোখে তাকে দেখবে কে জানে। আশ্চর্য, সে তো ধরে নিয়েছিল যে সাদা চামড়াদের কেউ এদেশ থেকে তাড়াতে পারবে না। এ অসম্ভব সম্ভব হল কি করে? অবশ্য পালিয়ে যাবার আগে শাসক দল ওয়ারিউকিকে পুরস্কার হিসেবে টাকা ধার দিল। সে তাই দিয়ে কিনল একটা মোটর চালিত করাত। কাঠের ব্যবসায়ী হোল ওয়ারিউকি।

স্বাধীনতার পর যখন বন্যার স্রোতের মত দেশের মানুষ ঘরে ফিরে আসতে লাগল তখন সে ভেবেছিল তার কাজকর্মের জন্য তাকে হয়ত শাস্তি দেওয়া হবে। কিন্তু ওরা তখন ক্লান্ত, বিধ্বস্ত। ন্যায় যুদ্ধে জয়লাভ করে তাদের হৃদয়ে আর কারুর জন্য কোনো হিংসা বা ঘৃণা ছিল না। সুতরাং ওয়ারিউকি খুব সহজে বিনা বাধায় সাফল্যের চরম শিখরে পৌঁছে গেল।

বারবার ঈশ্বরকে ধন্যবাদ জানাল সে। কৃতজ্ঞতা জানাতে নিয়মিত গীর্জায় যাওয়া শুরু করল। মিরিয়ামুকেও সঙ্গে নিয়ে গেল। মিরিয়ামু কিন্তু যেত সম্পূর্ণ অন্য এক প্রার্থনা নিয়ে। ঈশ্বরের কাছে তার করুণ আবেদন সে যেন তার পুরোনো ওয়ারিউকিকে আবার তার কাছে ফিরে পায়। তার ওয়ারিউকি এখন আর আগের মত প্রাণখোলা হাসে না, খুশীতে গান গেয়ে ওঠে না, উল্লাসে নাচে না। তার চোখের দিকে তাকাতে পর্যন্ত আজকাল মিরিয়ামুর বুক দুরু দুরু করে ওঠে। কেমন যেন ঠাণ্ডা কঠিন, মরা মাছের মত দৃষ্টি সে চোখের।

ক্রমে ক্রমে ওয়ারিউকি গীর্জায় বিশিষ্ট স্থান অধিকার করল। সেই দিনটি ছিল তার কাছে এক মহৎ দিন যেদিন সে তার পুরোনো নাম 'ওয়ারিউকি'-কে চিরকালের মত ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে গ্রহণ করল নতুন নাম—ডজ, ডব্লিউ, লিভিংস্টোন, জুনিয়র।

এদিকে তার শ্বশুরবাড়ির লোকেরা তার খ্যাতি ও প্রতিপত্তির কথা শুনে তাদের মেয়েকে বাড়ি আসতে আমন্ত্রণ জানাল। মিরিয়ামু উপেক্ষা করল তাদের নিমন্ত্রণ। ডজ লিভিংস্টোন ক্ষিপ্ত হোল। তার স্ত্রী কি ভুলে গেছে যে খ্রীষ্টধর্মের মূল কথা ক্ষমা। তার পেড়াপীড়িতে অবশেষে রাজী হোল মিরিয়ামু। লিভিংস্টোন যতই খুশী হক, পুরোনো অপমানের জ্বালাটা তবু কিছুতেই ভুলতে পারছে না।

লিমুরুতে ব্যবসার কেন্দ্র হলেও প্রায়ই তাকে ব্যবসার কাজে

এদিক ওদিক যেতে হয়। আর যেতে হয় বলেই ব্যবসা-সংক্রান্ত নানারকম খবরাখবর সংগ্রহ করতে পারে। সে বছরই সিয়েনার বণিকদের লাইসেন্স নিয়ে নেওয়া হোল। কারণ তারা কেনিয়ার অধিবাসী নয়। তাড়াতাড়ি এরা লিভিংস্টোনকে আধাআধি ভাগে অংশীদার হতে প্রস্তাব জানাল। ঈশ্বরকে হাজারো প্রণাম, তাঁর জয়গানে মুখরিত হোক পৃথিবী! এক বছরের মধ্যে সে বড় রকম ধার পাবার ব্যবস্থা করে ফেলল। কিনল বিশাল বিশাল জমি। আগে এসব জমির মালিক ছিল সাহেবরা।

মিরিয়ামু কিন্তু এখনও বসে আছে তার ওয়ারিউকির প্রতীক্ষায়। অন্য সকলের কাছে সে আদর্শ স্ত্রী। তার নম্র, বিনীত ব্যবহারে সকলে প্রশংসায় পঞ্চমুখ। কিন্তু হায়, কেউ যদি জানত তার গভীর বেদনার কথা! ঈশ্বর যেন তাকে অতীত স্মৃতির কবল থেকে মুক্ত করেন। এটা মিরিয়ামুর একান্ত প্রার্থনা। মিরিয়ামু সম্পূর্ণ অন্য প্রকৃতির নারী। তার মধ্যে কোনো মিথ্যে ভান নেই। প্রতিদিন সকালে সে 'কিয়োণ্ডা' হাতে চা-বাগানে কাজ করত। এখনো সে ভুলতে পারেনি তার সেই একফালি জমির কথা। মাঝে মাঝে সে দুপুরের চা খাবার, নিজে হাতে তৈরি করে শ্রমিকদের খাওয়াত। এতে তার স্বামী তো রীতিমত ক্রুদ্ধ, বিরক্ত। কেন সে এইসব লোকের সামনে তাকে অপদস্থ করে? সে কি একজন সত্যিকারের ক্রিশ্চান মহিলার মত আচরণ করতে পারে না? সে যখন সকাল থেকে সন্ধ্যে মাথার ঘাম পায়ে ফেলে কাজ করত, তখন কোন্ মালিকের দয়ালু স্ত্রী তার জন্য শানকায় করে খাবার নিয়ে মুখের কাছে ধরত? মিরিয়ামু এদের মাথাটা খাচ্ছে। কিন্তু মিরিয়ামুর পক্ষে অসম্ভব হাত গুটিয়ে বসে থাকা। শ্রম যে তার মজ্জায় মজ্জায়। মাটির স্পর্শ তাকে দোলা দেয়। তার ভাল লাগে এইসব সরল মানুষদের প্রাণখোলা, দিলখোলা কথা, হাসি, গান। তাদেরও এই সাদাসিধে মহিলাটিকে খুবই ভাল লাগে। যদিও তার স্বামী ওদের কাছে

অসহ্য। লিভিংস্টোনের কাছে এরা এক অলস কুঁড়ের দল। তার ধারণা ওরা ওর মত কঠিন পরিশ্রম করতে পারে না। তার প্রতি এদের নীরব ঘৃণার কথা সে বোঝে। ভাবে এই বোধহয় প্রকৃতির নিয়ম। ধনারা চিরকালই গরীবদের ঘৃণার পাত্র।

মিরিয়াম্ ওদের সামনে দাঁড়ালেই ওদের মুখগুলি আনন্দে উজ্জ্বল হয়ে ওঠে। সবাই হাসি, ঠাট্টা, গানে মেতে ওঠে। ক্রমে ক্রমে মিরিয়াম্ হয়ে যায় ওদের একান্ত আপনজন। ওরা ওকে জানায় ওদের গোপন কথা। ওরা একটা গোপন সংস্থার সদস্য। এই সংস্থার বিশ্বাস যীশু মৃত্যুবরণ করেছেন দরিদ্রের স্বার্থে। এদের ধর্ম 'দুঃখের ধর্ম'। লিভিংস্টোন তার ব্যবসার কাজে বাইরে গেলে মিরিয়াম্ ওদের প্রার্থনা সভায় যোগ দেয়। অদ্ভুত এক জগতের বাসিন্দা এরা। নিজেদের লেখা ও সুর দেওয়া গান গায়—ড্রাম, গীটার, জিঙ্গিল, তাম্বুরিনের হৃদয় আলোড়নকারী ঐকতান। মিরিয়ামুর সমস্ত দেহে শিহরণ জাগে। তার মনের সুপ্ত ইচ্ছাগুলি মুক্ত বিহঙ্গের মত ডানা মেলে উড়ে যেতে চায় আকাশে। সে অনেক আশা নিয়ে ঘরে ফেরে। কিন্তু স্বামী ফেরে সেই ডজ, লিভিংস্টোন হয়েই। তার মনে শুধু ব্যবসার হিসেব আর লাভ-লোকসানের চিন্তা। তাদের জীবন দিনের পর দিন একই খাতে বয়ে চলে।

একদিনের ঘটনা বলি। লিভিংস্টোন অন্য দিনের তুলনায় সেদিন তাড়াতাড়ি বাড়ি ফিরে এল। চোখ, মুখ খুশীতে ঝলমল। এই দিনটির প্রতীক্ষায়ই তো এতকাল বসে আছে মিরিয়াম্। আজ বোধহয় তার সমস্ত দুঃখের অবসান হবে। কিন্তু পরমুহূর্তেই তার সমস্ত আশা গেল নিভে। ডগলাস জোন্স তাদের নিমন্ত্রণ জানিয়েছেন। চিঠিটা জোরে জোরে পড়তে লাগল লিভিংস্টোন। মিরিয়াম্ যন্ত্রণায় অস্থির হয়ে উঠল। সত্যিই কি তার স্বামীর হৃদয় পাষাণে পরিণত হতে চলেছে? কি ভাবে সে আলোর সন্ধান পাবে? সে যে শুধু এক টুকরো আলোর প্রত্যাশী।

শ্বশুরবাড়ি যাবার দিন এগিয়ে আসে, লিভিংস্টোন আর তার উত্তেজনা চেপে রাখতে পারে না। তার এতদিনের স্বপ্ন আজ স্বার্থক হতে চলেছে। একদিন সে ছিল এক আস্তাকুঁড়ের ছেলে, সাধারণ দুধের ডিপোর কলমপেষা কেরানী, তালি-মারা প্যাণ্ট পরা হাস্যকর এক যুবক। আর আজ? অতীত ও বর্তমানের মধ্যে আকাশ-পাতাল তফাত।

অবশেষে বিশেষ দিনটি এল। মার্সিডিজ বেন্‌জ্‌ গাড়িতে চড়ে শহরের সম্মানিত ব্যক্তি লিভিংস্টোন তার স্ত্রী, পুত্র সঙ্গে নিয়ে গেল মোলো'তে। দেখা হোল ডগলাস জোন্সের সঙ্গে। বৃদ্ধ শ্বশুরের সঙ্গে একত্রে অতীতকে প্রার্থনা ও চোখের জলে ধুয়ে দেবার আপ্রাণ চেষ্টা করল। মিরিয়াম্‌ কিন্তু কিছুই ভুলতে পারে না। তার স্মৃতিতে অতীত বেঁচে আছে প্রতিটি মুহূর্ত নিয়ে।

লিভিংস্টোনের মনে হোল বুকের মধ্যে কোথায় যেন একটা কাঁটা খচ্‌খচ্‌ করছে। এমন নয় যে সে বৃদ্ধের ওপর কোনো রাগ পোষণ করছে। বৃদ্ধের অতীতের আচরণ অত্যন্ত ন্যায়সঙ্গত। কে-ই বা চায় নিজের মেয়েকে এক সাধারণ দরিদ্র কেরাণীর হাতে শখ করে তুলে দিতে! কিন্তু এমন একটা কিছু করা দরকার যাতে সে এই কাঁটাটাকে চিরকালের মত উপড়ে ফেলতে পারে। সে বৃদ্ধের কাছে এক প্রস্তাব করল। সে আবার নতুন করে ক্রিশ্চান মতে মিরিয়ামুকে বিয়ে করতে চায়। ডগলাস জোন্স এতে পূর্ণ সম্মতি জানালেন। প্রত্যেকেই ঈশ্বরকে অকুণ্ঠ ধন্যবাদ জানাল। সত্যিই ঈশ্বরের লীলা বোঝা দায়। মিরিয়ামুর কোনো প্রতিবাদই গ্রাহ্য হোল না।

আজ লিভিংস্টোনের সব থেকে আনন্দের দিন। সে প্রতিটি মুহূর্তকে উপভোগ করতে লাগল। সে যেন তার পুরনো যৌবনকে ফিরে পেয়েছে আবার।

কার্ড ছাপানো হোল—সাড়ম্বরে বিয়ের আয়োজন শুরু হল। মিরিয়ামুকে সঙ্গে নিয়ে সে এল নাইরোবি। তার জন্য কিনল

অত্যন্ত দামী একটি সাদা সার্টিনের পোশাক, মাথার উড়্নি, হাতের সাদা গ্লাভস্, সাদা জুতো. মোজা, প্লাস্টিকের সাদা ফুল কিনতেও ভুলল না সে।

মিরিয়ামু কিন্তু কাউকে আমন্ত্রণ জানায়নি। সে শুধু ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা জানায় তিনি যেন তাকে সহ্য করার শক্তি দেন। যেন এই ভয়ঙ্কর দিনটি স্বপ্নের মত এসেই মিলিয়ে যায়। সে দুই সন্তানের জননী। যৌবনের সীমারেখা পার হয়ে প্রৌঢ়ত্বের দ্বারপ্রান্তে দাঁড়িয়ে কি করে সে আজ এক লাজুক কুমারীর অভিনয় করবে? হয়ত অন্য সকলেই ঠিক। সে-ই ভুল করছে। এমন কি পবিত্র গীর্জাও এই বিবাহে খুশী। প্রতিবেশী মহিলারা এমন স্বামী লাভ করার জন্য অভিনন্দন জানাতে আসছে। এরা সকলে তার আনন্দের অংশীদার হতে চায়।

দিনটি ছিল উজ্জ্বল। মোলোর ঢেউ খেলানো মাঠগুলি দেখে মিরিয়ামুর ছেলেবেলার নানান কথা মনে পড়ছে। সে চেষ্টা করল খুশী হবার। কিন্তু কোথায় হাসি? বারবার দু'চোখ যে জলে ভরে উঠছে। এই দীর্ঘ প্রতীক্ষায় কি লাভ হল? কিসের আশায় সে এতগুলি বছর কাটালো? তার বৃদ্ধ পিতা জমকালো স্যুট্, ওয়েস্ট কোট ও টুপি পরে উপস্থিত হলেন। মিরিয়ামু লজ্জায় মাথা নিচু করল। সে আর একটু শক্তি পেতে চায়। তার চারপাশের কাউকেই সে চিনতে পারছে না। এমনকি তার সহকর্মীদের পর্যন্ত নয়। ওরা বাইরে সকলে একসঙ্গে অপেক্ষা করছিল।

লিভিংস্টোনের কাছে এই মুহূর্তটি তার জীবনের শ্রেষ্ঠ মুহূর্ত। প্রতিশোধ গ্রহণের থেকে অনেক বেশী মধুর। এতকাল সে এই মুহূর্তটির অপেক্ষায় ছিল। আজ সেই শুভক্ষণ উপস্থিত। আজকের জন্য সে বিশেষ সাজে সজ্জিত। তার চারিদিকে গণ্যমান্য অতিথির সমাবেশ। শ্রমিকরা ও সাধারণ লোকেরা বাইরে অপেক্ষা করছে।

'দুঃখের ধর্মে'র সদস্যরা আজ লাল রঙ-এর পোশাক পরেছে। তাদের হাতে গীটার, ড্রাম আর তাম্বুরিন। ওদের পাশ দিয়ে যেতে যেতে লিভিংস্টোন বেশ কঠিন দৃষ্টিতে এক নজর দেখে নিল। সেও শুধু এক মুহূর্তের জন্য। সে আজ ভীষণ খুশি।

মিরিয়ামু ক্রশের সামনে দাঁড়াল। সাদা উড়নির আড়ালে তার মুখ। তার হৃদয় কেঁপে উঠল। ঠাকুমার বয়সী কনে, বয়স্ক একদল মিতকনে পরিবৃত হয়ে লাজুক কনে সাজার চেষ্টা করে চলেছে! চিন্তাটা তাকে লজ্জায়, দ্বিধায় মাটির সঙ্গে মিশিয়ে দিল। পুরোহিত বলে চলেছে: 'ডজ লিভিংস্টোন, তুমি কি এই মহিলাকে তোমার স্ত্রী হিসেবে গ্রহণ করবে? মৃত্যু পর্যন্ত কি তুমি এর সুখ দুঃখে অংশীদার হবে?'

লিভিংস্টোন্ পরিষ্কার গলায় বলল, 'হ্যাঁ।'

এবার তার পালা। মিরিয়ামু কি এই মানুষটিকে তার স্বামী হিসেবে গ্রহণ করতে প্রস্তুত? সে বলতে চেষ্টা করল। কিন্তু জিভ জড়িয়ে আসছে, গলায় কি যেন আটকে যাচ্ছে। কবরের নীরবতা ঘিরে ধরল সবাইকে। রুদ্ধশ্বাসে সকলে মিরিয়ামুর উত্তরের অপেক্ষা করছে।

ঠিক এমন সময় গীর্জার বাইরে কারা যেন এই পাথরের মত ভারী স্তব্ধতাকে খান্ খান্ করে ভেঙে ফেলল। সকলে দরজার দিকে দৃষ্টি ফেরাল। কিন্তু 'দুঃখের ধর্মে'র সদস্যরা এদের সম্বন্ধে সম্পূর্ণ অসচেতন। ড্রাম বেজে উঠল, তাম্বুরিন বেজে উঠল, গীটার বেজে উঠল। যন্ত্রগুলি একসঙ্গে এক সুরে বেজে উঠল। গীর্জার তত্ত্বাবধায়কদের দল ছুটে গিয়ে তাদের জানাল যে এখনও পবিত্র বিবাহ উৎসব শেষ হয়নি, কিন্তু ওরা তখন সবকিছুর উর্ধ্বে। ওদের মুখ আকাশের দিকে উদ্যত। পাগুলি মাটিতে তালে তাল মিলিয়ে পড়ছে। সমস্ত পৃথিবী কাঁপিয়ে তুলেছে তাদের গলার আওয়াজ।

এই প্রথম মিরিয়ামু মুখ তুলে চাইল। অস্পষ্ট ভাবে মনে পড়ল যে সে তার বন্ধুদের নিমন্ত্রণ পর্যন্ত করেনি। ওরা মোলো-তে এল কি করে? হঠাৎ তার মধ্যে অপরাধবোধ জেগে উঠল। সেও মুহূর্তের জন্য। কিছুই এসে যায় না আর। না, এখন তো নয়-ই। সেই বহু পুরোনো দৃশ্য আবার চোখের সামনে ভেসে উঠল। সে দেখল ক্রশের সামনে তার ওয়ারিউকি দাঁড়িয়ে আছে। দাঁড়াবার ভঙ্গিটি ঠিক আগের মত। ভীড়ের মধ্যে একটা বাইসাইকেল চালাচ্ছে। খেলা দেখাচ্ছে। মিরিয়ামু বুঝতে পারছে ওয়ারিউকি তাকেই বেছে নিয়েছে এই ভীড়ের মধ্যে থেকে। এল সেই সন্ধ্যা--যেদিন ওয়ারিউকি তার সঙ্গে প্রথম নাচল। সে নিশ্চিত করে বলতে পারে যে সে তাকে ভালবাসে। হা, ঈশ্বর। মিরিয়ামু যে অনেক আগে থেকেই আর একজনের ভালবাসা পেয়েছে। সে নিজে যে বহুদিন আগে থেকেই আর একজনকে মনপ্রাণ দিয়ে ভালবেসে ফেলেছে। তার প্রেমিক ওয়ারিউকি—আর কেউ নয়, আর কেউ হতে পারে না। হে ঈশ্বর, ইলমার্গ বনের ভেতরের সেই দিনগুলি যে শুধু তার, একান্তভাবে তার নিজের। কি যন্ত্রণা—ড্রাম আর তাম্বুরিনের সুরেও যেন সেই একই যন্ত্রণা। মিরিয়ামু শক্তি ফিরে পাচ্ছে। গর্বের সঙ্গে মাথা উঁচু করে দাঁড়াল সে। পুরোহিত তখন চিৎকার করে বলে চলেছে 'তুমি মিরিয়ামু——'

সমবেত সকলে তখনও ওর উত্তরের অপেক্ষায়: সে লিভিংস্টোনের দিকে তাকাল, দেখল তার বাবাকে। কোনো পার্থক্য; খুঁজে পেল না। সে খুব জোরের সঙ্গে ফিসফিস করে বলল, 'না।'

হঠাৎ একটা বিদ্যুৎ প্রবাহ খেলে গেল গীর্জার ভেতরে। তারা কি ঠিক শুনেছে? পুরোহিত তখন প্রায় উন্মাদের মত আওড়ে চলেছে, 'তুমি মিরিয়ামু——' সে তার মুখের ওপর থেকে উড়নি সরিয়ে ফেলল। সকলের দিকে তাকিয়ে বলল, 'না, আমি পারব

না। আমি কখনই লিভিংস্টোনকে স্বামী হিসেবে গ্রহণ করতে পারব না। কারণ——কারণ——আমার অনেকদিন আগেই বিয়ে হয়ে গিয়েছে। আমার বিয়ে হয়েছে——ওয়ারিউকির সঙ্গে। সে আজ মৃত।'

লিভিংস্টোন পাথরের মত দাঁড়িয়ে রইল। তার মা ও বাবা কান্নায় ভেঙে পড়েছে। বাইরে এখনও কিন্তু ড্রাম ও তাম্বুরিনের সুরে সুর মিলিয়ে গান গেয়ে চলেছে ওরা।

অনুবাদ | মালা ভট্টাচার্য

পবিত্র

জেসাস কোলন

বেশ হাসি-খুশী মেয়ে লুসিয়া। মসৃণ, গোল গড়নের মুখ। পোয়ার্তোরিকোর তরুণী। আমাদের বাড়ির লাগোয়া বেশ সাজানো-গোছান দুটি ঘরের ফ্ল্যাট নিয়ে সে থাকে। স্বামীর সঙ্গে ছাড়াছাড়ি হয়ে যাবার পর ওর এখন একমাত্র স্বপ্ন দুটি শিশু সন্তানকে সে তার কাছে এনে রাখবে।

লুসিয়া একাই থাকে। তবে ওর একটা ক্যানারি পাখি আছে। ঘরে ঊনবিংশ শতাব্দীর শ্বেত পাথরের ফায়ার প্লেস। তার ওপর একটা কাঁচের জারের মধ্যে ছোট ছোট সোনালী মাছগুলো খেলা করে। এছাড়া লুসিয়ার একটা ছোট ভিক্‌ট্রোলা আছে। একটা কাপড়-ধোয়ার কারখানায় কাজ করে লুসিয়া। কাজ থেকে ফিরে এসে ও তার ছোট্ট ভিক্‌ট্রোলাতে ম্যামবোন আর ছা-ছা-ছা-র অত্যাধুনিক সুর তোলে।

লুই নামে একটি মেকানিক ছেলে ওই পাড়াতেই দুটো ঘর নিয়ে থাকে। ও যখন কাজ সেরে ফেরে লুসিয়া তখন ওর ঘরে বসে ভিক্‌ট্রোলা বাজাতে বাজাতে উদাস চোখে রাস্তার দিকে চেয়ে থাকে।

প্রতিবার রাস্তা পার হতে গিয়ে ক্ষণিকের জন্য লুই রাস্তায় দাঁড়িয়ে পড়ত। লুসিয়ার দৃষ্টি আকর্ষণ করার জন্যে ভিক্‌ট্রোলার তালে তালে পা ফেলত! প্রথম কদিন লুসিয়া ওর দিকে তাকাতে চায়নি।

তারপর একদিন লুসিয়া ঠিক করল যে সে লুই-এর নাচ দেখবে। লুই ঠিক ছ'টা পনের থেকে ছ'টা ষোল অবধি নাচে। আজ সে তার এই এক মিনিটের নাচ সোজা চোখেই দেখবে, খোলা মনে উপভোগ করবে। লুই-এর প্রতিদিনের নাচের মধ্যেই বৈচিত্র থাকত। একদিন এই এক মিনিটের নাচের পর লুসিয়া তাকে অভিনন্দন জানাল—তারপর যা হবার তাই হল।

পরের দিন লুসিয়া লুই-এর জন্য অপেক্ষা করতে লাগল। ছা-ছা-ছা-র সর্ব শেষ হৃদয় বিদারক সুর বাজাতে বাজাতে সে তার সমস্ত আকুতি নিয়ে উন্মুখ হয়ে ছিল লুইস-এর জন্য। উৎসুক দুটো চোখ আকুল হয়ে চেয়েছিল রাস্তার দিকে। লুইস ওখানেই এসে রোজ রুটিন মাফিক নাচ করে। সেদিনও লুই রোজকার মতো নাচল। তারপর যাওয়ার জন্য পা বাড়াল। লুসিয়ার চোখে চোখ পড়াতে সে জানলার কাছে এগিয়ে এল। জানলার কাছে বসেছিল লুসিয়া। মামুলি দু-একটা কথা ছাড়া তেমন কোন কথা হল না—তোমার নাম কি—পোয়ার্তোরিকোর কোন্ শহর——তুমি কি—এই ধরনের সাদা মাটা কথা——তার বেশি কিছু নয়। লুই-এর সমস্ত প্রশ্নের উত্তর দিল লুসিয়া।

পরের দিন ঠিক সোয়া ছ'টায় লুই ফিরছিল তার কাজ থেকে। লুসিয়া তখন তার ছোট্ট ভিক্‌ট্রোলায় মামবোন্ বাজিয়ে চলেছে। লুই তার নির্দিষ্ট জায়গায় এসে রোজকার মতো এক মিনিটের নাচ নাচল—তারপর নাচতে নাচতে লুসিয়ার ঘরে ঢুকল। লুসিয়াও ওর সঙ্গে নাচে যোগ দিল।

এরপর থেকে লুই-এর রাস্তায় নাচা বন্ধ হল। লুসিয়া তার ছোট্ট

ক্যানারি, জারে রাখা সোনালী মাছ আর তার ভিক্‌ট্রোলার সঙ্গে লুইকেও আপন করে নিল। ওর উৎসুক প্রতিবেশীকে লুসিয়া বলল, কর্মঠ তরুণ শ্রমিক লুই ওকে কথা দিয়েছে, পোয়ার্তোরিকো থেকে ওর শিশুদের সে ওর কাছে নিয়ে আসবে। লুসিয়ার কথা শুনে একজন বৃদ্ধা পোয়ার্তোরিকান বলল—কথা শুধ্ কথাই——। কিন্তু লুসিয়ার খুশি তাতে একটুও কমেনি। লুসিয়া সুখী——খুব সুখী সে তার ছোট্ট ক্যানারি, সোনালী মাছ আর তার লুইকে নিয়ে।

লুসিয়াব বাড়ি ভাড়া মিটিয়ে দিল লুই। খাবার দাবারের পয়সাও। কিছু জামা কাপড়ও কিনে দিল লুসিয়ার জন্য। পোয়ার্তোরিকোয় ওর বাচ্চাদের জন্য কিছু জিনিস কিনে পাঠিয়ে দিল। তারপর শনিবারের রাত্রে যখন একসঙ্গে বেড়াতে বেরোল তখন তাদের দেখে মনে হল সত্যিই তারা একটি সুখী দম্পতি।

প্রায় দেড় বছর হল লুসিয়া আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রে এসেছে। পোয়ার্তোরিকোয় এক ধর্মীয় পরিবারের আবহাওয়ায় সে মানুষ হয়েছে। কিন্তু এখানে আসার পর সে বহুদিন ধরে গির্জায় যায়না। তার জন্য তার মনে একটা ভয় ভয় ভাব ক্রমশ দানা বাঁধতে শুরু করেছে। একদিন লুসিয়া কাজে কামাই করে কাছের একটা গির্জায় গেল। গির্জায় প্রবেশ করেই তার সেই পুরনো দিনের ধর্ম ভাব জেগে উঠল। মুহূর্ত মধ্যে তার মনে একটা দ্রুত পরিবর্তন ঘটল। এখন সে আর একজন কাপড়-কাচা কারখানার শ্রমিক নয়—সে যেন ফেলে আসা শহরের একটি ছোট্ট মেয়ে। গির্জার চারপাশ ঘুরে ঘুরে সাধু সন্তদের মূর্তি দেখে বেড়াচ্ছে। তার অনেকদিন আগেকার সেই ক্যাথলিক মনটা যেন আবার ফিরে এসেছে। অনুভবের অতলে ডুবে গেল লুসিয়া।

ধীর পায়ে লুসিয়া এগিয়ে এল কন্‌ফেসান্ হল্-এর সামনে। আরো দু একজন তখনও অপেক্ষা করছে। লাইনে এসে দাঁড়াল

সে। লুসিয়ার সময় এলে পাদ্রী জিজ্ঞাসা করলেন—'তুমি কি বিবাহিতা?'

উত্তরে লুসিয়া বলল—'আমি একজন মানুষের সঙ্গে থাকি। সে খুব ভালোমানুষ। আমরা পরস্পরকে অত্যন্ত ভালবাসি।'

'কিন্তু তুমি কি তাকে বিয়ে করেছ? তুমি কি ক্যাথলিক গির্জায় তার সঙ্গে পবিত্র বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হয়েছ?'

'না, তাকে আমি বিয়ে করিনি, কিন্তু আমরা স্বামী-স্ত্রীর মতোই একসঙ্গে বসবাস করি।'

'মহাপাপ, মহাপাপ করেছ। আর সেই পাপের মধ্যেই দিন কাটাচ্ছ। একজন পবিত্র ক্যাথলিক হিসেবে তোমার উচিৎ এই অপবিত্র দেহ সংশ্রব ত্যাগ করা। আর দেরী নয়, এখনই, এই মুহূর্তেই ওই সংশ্রব ত্যাগ কর।' স্বীকারোক্তি শেষে লুসিয়া ঘর থেকে বেরিয়ে এল। লুইসকে কি বলবে এখন সে!

বেশ কিছুদিন ধরে বিষন্নতায় ডুবে রইল লুসিয়া। গির্জায় যাওয়া আসা তার নিত্যকর্ম হয়ে উঠল। খুব ভোরে উঠে সে গির্জায় ছুটত, নয়তো কারখানা থেকে ফিরে। ভিকট্রোলা বাজান বন্ধ হল লুসিয়ার, কারণ পাদ্রী বলেছে সে মহাপাপের মধ্যে ডুবে আছে। এই পাপের সংশ্রব তাকে ত্যাগ করতে হবে। একদিন সন্ধ্যায় লুসিয়া ঠিক করল লুইকে সব বলবে। সব কথা খুলে বললও লুইকে। আর বলল—'লুই, হয় তুমি এখনই আমাকে ছেড়ে চলে যাও, নয়তো কালই আমাকে বিয়ে কর।'

'কেন? কি ব্যাপার?'

'তুমি এখনই চলে যাও লুই—তোমার যা আছে সব নিয়ে তুমি চলে যাও।'

'কেন বলবে তো?'

'আমরা মহাপাপের মধ্যে ডুবে আছি। শুধু দেহের জন্যে আমরা পরস্পরকে চাইছি—আত্মাকে নয়। পাদ্রী আমাকে আদেশ

করেছেন, যদি নিজেকে বাঁচাতে চাই তবে এই মুহূর্তেই আমাকে পবিত্র ক্যাথলিক মতে বিয়ে করতে হবে। নইলে তোমার সংশ্রব ত্যাগ করতে হবে।'

লুসিয়ার কথা শুনে মিষ্টি করে হাসল লুই। বলল—'ও, তাই কদিন ধরে তোমাকে এমন বিষণ্ন দেখছি। কয়েকটা কথা আমি তোমাকে বলতে চাই লুসিয়া। পাহাড়ের ওপর যেখানে আমার জন্ম হয়েছে—সেখানে আমার মা আর বাবা থাকতেন। আমাকে ছাড়াও তাদের আরো এগারোটি সন্তান ছিল। তারা সবাই এখনো বেঁচে আছেন। আমার বাবা এবং মা বেশ সুখে শান্তিতেই তাদের দিনগুলো কাটিয়েছেন। প্রায় দীর্ঘ পঞ্চাশ বছর তারা একসঙ্গে ছিলেন—মার মৃত্যুর আগে পর্যন্ত। জানো তো তারা কিন্তু বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ ছিলেন না। আমার ভাই বোনেরা পাহাড়েই থাকে। সেখানে তারা প্রত্যেক মেয়ে আর পুরুষ একসঙ্গে জীবন কাটাচ্ছে। তারা কখনো পাঁচ ডলার পাদ্রীকে দিয়ে বাবুয়ানী করার জন্য শহরে আসেনি আর সে সময়ও তাদের নেই। তারা কিন্তু বেশ সুখেই দিন কাটাচ্ছে—অবশ্য সেখানে যে জীবন সুখের বলে ভাবা হয় সেই জীবন। আমি জানি, আমরা বিদেশে আছি। কিন্তু তবু, আমার বাবা মা যদি বিয়ে না করে দীর্ঘ পঞ্চাশ বছর একসঙ্গে সুখে শান্তিতে জীবন কাটাতে পারেন, আমি বুঝতে পারছি না আমার বিয়ে করার কি প্রয়োজন আছে। আমার অনুভব আমাকে দিয়ে এই কথাই বলাচ্ছে। আমি তোমার বাচ্চাদের এখানে—আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রে নিয়ে আসব। আমি নিজের সন্তানের মতো তাদের মানুষ করবো। আমি কথা দিচ্ছি, সারা জীবন আমি তোমার সঙ্গেই থাকব—কিন্তু আমি তোমায় বিয়ে করতে পারবো না।'

লুসিয়া তার শেষ কথা লুইকে স্পষ্টই জানিয়ে দিল—'তাই যদি হয়, তবে তুমি আমাকে ছেড়ে চলে যাও। আমি পাপের মধ্যে দিন কাটাতে চাইনা।'

শীত এল। লুসিয়া নিজের মধ্যে নিজেকে হারিয়ে ফেলল। তার ভিকট্রোলায় আর সুর বাজল না। সব সময়ই লুসিয়াকে দেখা যেত হয় সে কাজ থেকে ফিরছে নয় গির্জায় যাচ্ছে। রাত্রে তুষার পাত হলে দেখা যেত লুসিয়া জানলার ধারে বসে আত্মার শান্তি কামনায় কোন ধর্মীয় বই পড়ছে। যেন কোন্ অশরীরী এক শক্তি তার হাসি, আনন্দ, নাচ গান, সব গ্রাস করে নিয়েছে। "পবিত্র জীবন" পাবার সাধনায় কঠিন তপস্যায় নিজেকে পুরোপুরি উৎসর্গ করেছিল লুসিয়া।

কিন্তু, শীতের পরই বসন্ত আসে।···আর বসন্তে সব কিছুই আবার নতুন করে জন্ম নেয়। পৃথিবী তার নতুন উপাচার নিয়ে শীতের শেষে জেগে ওঠে। গাছে গাছে সবুজ পাতা. নব নব পুষ্পোৎগমন। মনে হয় পৃথিবীর আবার পুনর্জন্ম হল।

বসন্তের পরে আসে গ্রীষ্ম। গ্রীষ্মের উত্তাপে উত্তপ্ত নিউইয়র্কের সব গৃহেরই জানলা খোলা থাকে। লুসিয়াও ওর ঘরের জানলা খুলে দেয়।

লুই কিন্তু লুসিয়ার বাড়ির সামনে দিয়ে ছ'টা পনেরোয় যাওয়ার ব্যাপারটা আজও বন্ধ রাখেনি। একদিন লুই দেখতে পেল লুসিয়া জানলার ধারে বসে আছে। যদিও লুসিয়ার ভিকট্রোলা সেদিন বাজছিল না, তবু লুই তার নির্দিষ্ট জায়গায় দাঁড়িয়ে তার এক মিনিটের নাচ নাচল। কিন্তু সে নাচ লুসিয়াকে আর আগের মতো মুগ্ধ করতে পারল না। এরপর দু' তিন সপ্তাহ ধরে লুই প্রতিদিন বাজনা ছাড়াই ছ'টা পনেরোয় তার নিয়ম মাফিক নাচ নেচে যেতে লাগল। লুই লক্ষ্য করল শেষের ক'দিন লুসিয়া তাকে আড় চোখে দেখছে। অবশেষে একদিন সোয়া ছ'টায় লুসিয়ার ভিকট্রোলা বেজে উঠল। জানলার কাছে দাঁড়িয়ে ছিল সেদিন লুসিয়া। লুই নতুন ছন্দে নব ভঙ্গিমায় সেদিন নাচতে আরম্ভ করল। নৃত্যের তালে তালে তার প্রতিটি অঙ্গ সেদিন নেচে উঠল। নৃত্যরত লুই দেখল লুসিয়ার সুগঠিত হাত তাকে অভিবাদন জানাচ্ছে।

লুই ছুটে চলল। তার পরিচিত দালানের মাঝখান দিয়ে সিঁড়ি ভেঙে লুসিয়ার সাজান ঘরে ঢুকল লুই। উদভ্রান্ত লুই লুসিয়ার বাহুতে নিজের বাহু জড়িয়ে নাচতে লাগল। ছা-ছা-ছা রেকর্ড বাজছিল তাদের নাচের তালে তালে। লুই শুধু একবার অস্ফুটে বলল—'আমি তোমায় ভালোবাসি লুসিয়া।'

লুসিয়া ফিসফিস করে বলল—'আমিও, আমিও তোমাকে ভালোবাসি লুই। সব, সব কিছু থেকে বেশী।'

লুসিয়ার বাচ্চা দুটিকে পোয়ার্তোরিকো থেকে নিয়ে এল লুই। একদিন রবিবার লুসিয়াকে নিয়ে বেড়াতে বেরোল ও। আজ ওদের পরনে নতুন জামা-কাপড়। দেখে মনে হল ওরা যেন এক নব বিবাহিত সুখী দম্পতি।

অনুবাদ | কমলেশ সেন

নায়ক-নায়িকা

সুশীল জানা

কাচ্চাবাচ্চা মেয়ে মরদ করে জনা বারো হবে। সড়কের ধারে গাছের ছায়ায় বসে পান্তা ভাত খেয়ে উঠলো আবার বোঁচকা বুঁচকি হাঁড়ি কলসী নিয়ে। চললো পুব মুখো।

'কুথাকে যাও বটে গো ?' ওদের পাশ দিয়ে যেতে যেতে গাড়ি থেকে জিজ্ঞেস করলে হট্‌লগর মাঝি।

জবাব এলো, 'খড়্গপুর।'

'হা-ত্তোর খড়্গপুর—খড়্গপুর।' হঠাৎ ক্ষেপে যায় হট্‌লগর। পিটোতে থাকে গাড়ির গোরু দুটোকে। এলোপাথাড়ি। খড়্গপুর নামটা শুনলেই আজকাল ক্ষেপে যায় সে। দলকে দল--দিনের পর দিন--সব চললো বন বাদাড় গ্রাম ঘর ভেঙে মেয়ে মরদ কাচ্চাবাচ্চা নিয়ে সেই কোন্ জাত খোয়ানোর বাজারে—ইজ্জত বেচার কারখানায়। যাক চুলোয়! শয়তান ওদের পেছু নিয়েছে নির্ঘাৎ।

সকৌতূহলে শুধোয় তবু সে, 'কুথা থেকে এলেক বটে ?'

'পাথরডাঙা গো!' জবাবের সঙ্গে ক্লান্ত বিষণ্ণ দীর্ঘশ্বাস মেশানো। কোথায় সেই পাথরডাঙা—লাল মাটির দেশ। আরও পশ্চিমে। তবু তো গ্রাম . দেশ! তার জন্যে হট্‌লগরের অদ্ভুত এক মমতা ঃ

পূর্বপুরুষের গ্রাম, হাতে তৈরী পাথর ভাঙা জমি, জাতের মানুষ—সব ছেড়ে চললো কি-না ওরা অজাতের দেশে! হট্‌লগর গর্‌গর্‌ করে ক্ষেপে পায়ের গুঁতো মারে গোরু দুটোকে। বললে, 'তো সব ছেড়ে চললে তুমরা! যাও ক্যানে?'

'যাই ক্যানে?'

নেংটি-আঁটা চওড়া-কাঁধ যে আধবুড়ো লোকটা কথা কইছিল হট্‌লগরের সঙ্গে, সে তাকালো এবার চোখে চোখে ক্ষোভে, ক্রোধে। খোঁচা লেগেছে যেন, বললে ঃ

'তোর ঘর কুথা হে? জানিস তুই, মোদের মেয়েগুলার ইজ্জৎ কেড়ে লিলেক, ঘর জ্বালাই দিলেক, তিনটো মরদ খুন হয়ে গেল বন্দুকের গুলীতে!' লোকটা গর্‌গর্‌ করে উঠলো খোঁচা খাওয়া হুলো বেড়ালের মতো, 'আর মোরা! মোরা জঙ্গল সাফ করলম, পাথর ভাঙলম, জমিন করলম, চাষ করলম। আর বাস্‌! সিংজী বলে দিলেক কিনা—জমিন তোদের লয়, পালা! জঙ্গলেও ঢুকতে দিলেক না, কাঠও কাটতে দিলেক না।'

'বটা—বটা—বটা।'—

সপাসপ মার খেয়ে গোরু দুটো ছুটল গাড়ি নিয়ে। মুখে অদ্ভুত একটা গোরু খেদানো শব্দ হট্‌লগরের। সাঁওতালদের দলটাকে ছাড়িয়ে চলে গেল তার গাড়ি।

'বটা—বটা।'—মেজাজ খিচড়ে গেছে হট্‌লগরের।

চলে যাচ্ছে এমনি দলকে দল সাঁওতালরা, শুধু আজ নয়—এমনি বহু দিন। হট্‌লগর দেখেছে আর ক্ষেপে গেছে। যাচ্ছে কোথায় কোন্‌ খড়গপুর—রেল কারখানা—কলোনী। আরও দূরে কোথায় খনি অঞ্চলে। মেয়েদের কালো কালো চওড়া পিঠে কচি কচি ছেলে বাঁধা। নেংটি-আঁটা পুরুষগুলোর কাঁধে ভার—তাতে ঘর-সংসার সব বাঁধা ছাঁদা ঃ ছেঁড়া কাঁথা, খেজুর পাতার চ্যাটাই, মায় ভাতের হাঁড়িটা পর্যন্ত। মেয়েদের গায়ে কোমরে যা হোক কাপড় আছে

একটু। মরদের শুধু কাছা অাঁটা—ইঞ্চি কয়েক নোংরা কাপড়ের ফালি এক-একটা ঘুরে গেছে দু'পায়ের ফাঁক দিয়ে সামনে থেকে পেছনে। এমনি দলকে দল চলে যাচ্ছে পুবমুখো এই সড়ক ধরে। কাঁকর-ভাঙা চওড়া লাল সড়কটা ঠেলে বেরিয়ে এসেছে ছোটনাগপুরের পাহাড়ী অঞ্চল আর বনবাদাড় ভেঙে। ঘুরে, এঁকে-বেঁকে ছুঁয়ে ছুঁয়ে গেছে রেল লাইন এক একটা ষ্টেশনে। সাঁওতালরা এ সব ষ্টেশন থেকে ট্রেনে চাপে না, হাঁটা-পথ ধরে। ট্রেনে চাপলে চাপে গিয়ে একেবারে খড়্গপুরে, সেখান থেকে ছিটকে ছড়িয়ে যায় কে কোথায়, কেউ কেউ থেকে যায় হয়তো বা খড়্গপুরের কুলি লাইনে। সেই খানে পচে মরে ঃ হট্‌লগরের কথায় জাত খোয়ায়।

হট্‌লগর এসব সহ্য করতে পারে না। কারুর চলে যাওয়া দেখলেই সে ক্ষেপে যায় মনে মনে আর নিজেও যেতে পারে না। মাস গেল। বছর গেল। থেকে থেকে শুধু সে তেতেই উঠতে লাগলো।

গাড়ি হাঁকিয়ে বড় সড়ক ছেড়ে সে ঘুরে গেল ডান দিকে—ষ্টেশন মুখো। সামনেই ষ্টেশন। ঘেঁষাঘেঁষি লাল টালির চালা, ষ্টেশন কোয়ার্টার, দু-একটা গোলপাতার চালার চায়ের দোকান—এক আধটুক মানুষের সাড়া। তারপর আর সবটা ফাঁকা—পোড়া প্রান্তর। তামাটে মাটি ঠেলে বুক চিতিয়ে চিতিয়ে আছে এখানে ওখানে মাটির তলার পাথুরে তরঙ্গ। ষ্টেশন থেকে কিছুটা তফাতে একটা পোল পেরিয়ে গাছের ছায়ায় গাড়ি থামালো হট্‌লগর। গোরু দুটোকে খুলে বটগাছের ঝুরিতে বেঁধে দিল। পোলের তলা দিয়ে একটা ঝোরা চলে গেছে চওড়া সোঁতার ওপর দিয়ে উধাও পোড়া প্রান্তরের দিকে, বালি আর কাঁকর ঠেলে সেই ঝোরার জলে স্নান করে এলো সে, তারপর গাড়ির ছাউনির ভেতর থেকে টেনে বার করলো ঘটি, থালা, কড়াই, পুঁটলিতে বাঁধা চাল ডাল। রাঁধবে এবার।

গাছের তলায় উনুন পাড়াই আছে—ভাঙা, আস্ত, এমন অনেক উনুন সড়কের ধারে ধারে—গাছের তলায় তলায়। পোড়া কালি মাখা মাটিতে রাঁধাবাড়ার চিহ্ন—কে কবে রেঁধে-বেড়ে খেয়ে গেছে। যত দেশছাড়া সাঁওতালদের দল। একটা ভালো মতো উনুন বেছে নিয়ে কড়াই চাপিয়ে দিলে হট্‌লগর।

কিন্তু উনুন আর ধরে না কিছুতেই। শুকনো পাতা ডালপালা এনে উনুন প্রায় ভরিয়ে ফেলল সে। ফুঁ দিয়ে গলা শুকিয়ে গেল, ধোঁয়ায় জ্বলে জ্বলে চোখ দুটো লাল হয়ে গেল, নাকের জলে চোখের জলে ভেসে গেল সারা মুখ। উনুন আর ধরে না। গাছের তলা আর শড়কের কিছুটা ভরে গেল ধোঁয়ায়, ধোঁয়ার তাল্ উঠতে লাগলো আকাশে—হাওয়ায়।

একটি মেয়ে এসে দাঁড়ালো হট্‌লগরের পেছনে। সঙ্গে একটি শুকনোমুখো ছেলে বছর বারো চোদ্দর। ওরা বসে ছিল অন্য এক গাছতলায়। ধোঁয়া দেখে এ গাছের তলায় এসে বসলো। বসেই থাকলো। চুপ চাপ। এদিকে হট্‌লগর তখন উনুনে ফুঁ দিচ্ছে প্রাণপণে।

মেয়েটি বলে উঠলো সহসা, 'উ ধরবেকনি।'

হট্‌লগর মুখ ফিরিয়ে চেয়ে দেখলো। দেখলো তো দেখলোই। চৌকো মুখ একটা মেয়ে, গাল দুটো একটু বসে গিয়ে মুখে এনে দিয়েছে বিষণ্ণ কাঠিন্য—বছর কুড়ি বয়স হবে জোর। শুকনো শুকনো মুখ, শুকনো শুকনো চুল। তার জাতের মেয়ে। যদিও পরনের কাপড় তার খাটো নয় হাঁটু পর্যন্ত, চুলগুলো কট্‌কটিয়ে বাঁধা নয়—খোলা! পরদেশী পরদেশী ভাব। কেমন যেন ঢিলেঢালা—ক্লান্ত। তবু জাতের মেয়ে চিনতে কষ্ট হয় না হট্‌লগর মাঝির।

উনুনের দিকে চেয়ে হট্‌লগর বললে, 'শালার ধরতে চাইছে না কিছুতেই। দেখ দিকিন হাল্লাকের কাণ্ড!'

'আমি ধরিয়ে দিচ্ছি। সরে যাও।'

হট্‌লগর খুশি হলো। সরে দাঁড়ালো।

উনুনের ভেতরে যতো পাতা আর ডালপালা ঠাসা ছিল সব টেনে বার করলো মেয়েটি। নিপুণ হাতে উনুন সাজালো আবার। বললে, 'ছুটো শুকনো পাতা লাগবেক।'

গাছের তলা থেকে শুকনো পাতা হাটকে আনলো হট্‌লগর যত পারলো। কিন্তু ছুটি পাতা উনুনে ফেলে দিয়ে ফুঁ দিতেই দাউ দাউ করে জ্বলে উঠলো আগুন।

হট্‌লগর হেসে উঠলো। বললে, 'শালার যার কাজ তাকে সাজে।'

উনুন ধরিয়ে দিয়ে মেয়েটি আবার বসলো গিয়ে ছেলেটির গা-ঘেঁসে।

হট্‌লগর জিজ্ঞেস করলে, 'কুথাকে যাবি গো তোরা ?'

'পচ্ছিম। সে অনেক দূর।'

পুবে নয়। সেই হতচ্ছাড়া খড়গপুরের দিকে নয়! ···এতদিনে তবু একটা জাতের মেয়েকে দেখলে সে—যে নাকি দেশে গাঁয়ে ফিরে যাচ্ছে।

খুশি হলো হট্‌লগর। শুধোলে ঃ

'কুথা থেকে এলি বটে ?'

'খড়গপুর।'

'ভাল—ভাল।'

যাক, একটা জাতের মেয়ে তবু হতচ্ছাড়া ওই খড়গপুর থেকে চলে এলো তো—এ খুব ভালো কথা। মনে মনে ভারী খুশি হয়ে জিজ্ঞেস করলো হট্‌লগর, 'চলে এলি কেন ?'

'কারখানা থেকে বের করে দিল মোদের। মিলিটারী এল। বাপটাকে মোর মেরে ফেললেক উয়ারা। কারখানা বন্ধ করে দিলেক।—সে অনেক কাণ্ড।'

আরো খুশি হলো হট্‌লগর ; এই সেই হতচ্ছাড়া খড়গপুর—

বেজাতের বাজার। সেখানে এমন ধারা কাণ্ড হবেই তো। থু।—

'কি নাম তোর?'

'কম্‌লা।'

ভালো লাগছে মেয়েটিকে হট্‌লগরের—দরদী, উপকারী। এবার ছেলেটির দিকে মুখ তুলে বললে, 'উ চ্যাংড়াটো কে?'

'মোর ভাই।'

উনুনে বসানো কড়াইয়ের জল গরম হয়ে উঠেছে। সেই দিকে একভাবে চেয়ে আছে কম্‌লা। চেয়ে চেয়ে বললে, 'সেই খড়্গপুর থেকে মোরা চলে এলম। দু দিন মোর ভাইটা খায় নাই কিছু। দুটি চাল লেবে তোমার সঙ্গে? শুধু ওর জন্যে।'

তাই!—গায়ে পড়ে উনুন ধরানোর আসল কারণটা এতক্ষণে যেন সাফ হয়ে গেল হট্‌লগরের কাছে। কারখানা-বাজার থেকে ঘুরে আসা ফন্দিবাজ মেয়ে—সেয়ানা খুব!—হট্‌লগর সন্দিগ্ধ চোখে চেয়ে বললে:

'চাল আছে?'

কম্‌লা মাথা নাড়লে চাল নেই।

'তবে? পইসা আছে?'

তাও নেই। কম্‌লা ফের মাথা নাড়লে।

'তবে?'—

কম্‌লা ঘাবড়ানো চোখে তার দিকে শুধু চেয়ে রইলো। তারপর আস্তে আস্তে বললে, 'শুধু মোর ভাইটার জন্যে।'—

'শুধু এই কটি চাল আছে বেশী।' বলে দেখালো হট্‌লগর বাড়তি চাল কটি। গর্‌-গর্‌ করতে করতে ঢেলে দিল সেই চাল কটি কড়াইতে। বললে, 'দু-দিন খাস নাই—অনেক খাবি তোরা। তো এতে হবে কেনে? হাঁ।'

তারপর একটা চুটা ধরিয়ে গাছতলায় চেপে বসলো সে। শুধোলো:

'আর কে আছে তোর ?'

'কেউ নেই আর।'

'তবে ? যাচ্ছিস যে—থাকবি কুথা ?'

'জাতের মানুষ-জন আছে তো।'—

'যাঃ, উনুনটা নিবে গেল আবার।' হট্‌লগর উঠলো।

'বস তুমি—বস।' কম্‌লা উঠলো তাড়াতাড়ি। বললো, 'আমি ধরিয়ে দিচ্ছি।'

উনুন ধরিয়ে এবার উনুনের পাশে চেপে বসলো কম্‌লা।

ভালো লাগে মেয়েটাকে হট্‌লগরের। আবার ভালোও লাগে না। বাজার-কারখানা ঘোরা মেয়ে—ফন্দিবাজ। কেমন যেন কায়দা করে তার ভাতে ভাগ বসিয়ে দিল এই কিছুক্ষণ আগে। এমনিতে বেশ লাগে—যেমনটি তার জাতের মেয়ে হয়। কিন্তু তবু কোথায় যেন খচ্ খচ্ করে বেঁধে কাঁটার মতো। জাত খোয়ানো বাজার-কারখানা ঘোরা মেয়ে হাজার হোক।

তবু কথা কয় ওরা—আলাপ করে। আড়ষ্টতা কেটে যায়। হট্‌লগর গাছের গুঁড়িতে ঠেস দিয়ে বসে চুটা টানে। কম্‌লা উনুনের পাশে পা ছড়িয়ে ভাত রাঁধে। হট্‌লগরের খবর নেয়।

'ই গাড়ি আর গোরু তোমার ?'

'তবে ?' সন্দিগ্ধ চোখে তাকালো হট্‌লগর : মেয়েটা বিশ্বাস করছে না না-কি !

'বেশ ভালো গোরু—চম্‌ফল আছে।' কমলা বললে, 'চাষও করে ?'

'করে।' তারপর কত জমি চাষ করে, তাও গম্ভীরভাবে শুনিয়ে দিল হট্‌লগর, 'পাঁচ বিঘা।'

কম্‌লা সশ্রদ্ধ গলায় বললে, 'তুমি মাতব্বর ?'

'না।'

তবু খুশি হয়ে হাসে হট্‌লগর। মেয়েটাকে অবাক করে দিয়েছে।

'বউ আছে তোমার ?'

'না।'

'অ।'

কিছুক্ষণ কেউ আর কোন কথা বলে না। হট্‌লগর খুশি হয়ে চুটার ধোঁয়া ছাড়ে। কম্‌লা নীরবে উনুনে জ্বালানি দেয়। ভাত ফুটছে। কম্‌লার ভাইটা গভীর চোখে চেয়ে আছে কড়াইর দিকে আর জিভের তলায় জমা হাওয়া লালা গিলে ফেলছে থেকে থেকে।

হঠাৎ কম্‌লা বলে উঠলো, 'তুমি সুখী লোক—মাতব্বর মানুষ।'

হট্‌লগর কোন কথা বলে না। কম্‌লাও চুপ ক'রে যায়। তারপর আস্তে আস্তে সে তার নিজের কথা বলে। কাটা কাটা—ছেঁড়া ছেঁড়া। জবরদস্ত কারখানা বন্ধ—বাপের গুলি খেয়ে মরা—বেকারী—বেইজ্জত। তার রুক্ষ চুল—ক্লান্ত বিষণ্ণ মুখটার গাম্ভীর্য আর ছেঁড়া ছেঁড়া কথা—সবটা তার মুখে এনে দেয় কঠিন এক শ্রীময়তা। সামনের পোড়া প্রান্তরের দিকে তাকিয়ে কথা বলে সে। বলে :

'মোর ভাইটা যদি মরদ হত !'

'কি হত তা হলে ?'

'কাম খুঁজে নিতাম। কাম করতাম। ভরসা হত !' কম্‌লা একটু থেমে বললে, 'ইজ্জত দিয়ে কাম করতে নারলাম। শেষ চলে এলাম জাতের মানুষের কাছে।'

হট্‌লগরের মন সত্যি সত্যিই নরম হয়ে যাচ্ছে। আহা, একলা মেয়েলোক। বললে, 'তোদের তালুকের নাম কি বটে ?'

'পাথরডাঙ্গা।'

'পাথরডাঙ্গা !'

যে অঞ্চল ছেড়ে চলে যাচ্ছে দলকে দল—মেয়ে মরদ, আর তাই দেখে দেখে ক্ষেপে গেছে হট্‌লগর এতদিন—কম্‌লা ফিরে চলেছে সেই অঞ্চলে! মনে মনে থমকে যায় হট্‌লগর। চুপ করে যায়। কি বলবে ভেবে পায় না। অথচ কিছু একটা বলার জন্যে মনে মনে সে আকুপাকু করে। তারপর বলে ফেলে:

'যাসনি।'

'কেন?'

পাথরডাঙার খবর বললো হট্‌লগর।

'তবে?' চোখ ভরা প্রশ্ন তুলে কম্‌লা তাকিয়ে রইলো হট্‌লগরের মুখের দিকে।

হট্‌লগর চুপ।

ভাত হয়ে গেছে। সূর্য ঢলে পড়েছে মাথার উপর থেকে পশ্চিম দিকে। মাটির উপরে শালপাতা পেড়ে বসলো হট্‌লগর। কম্‌লা বললে, 'মোর ভাইটাকে শুধু অল্প করে তুটি দিয়ে দাও।'

'দিয়ে দে না তুই। মোকেও দে—তুইও তুটি খা।'

তুদিনের না-খাওয়া মানুষ অনেক খাবে, এই বলে এই কিছুক্ষণ আগেই গরগর করেছে হট্‌লগর। তাই, যদি দিতেই হয়তো তার ভাত-ডাল সেই ভাগ করে দিক। কমলা দেবে না কিছুতেই। তফাতে দাঁড়িয়ে রইলো কিছু সংকোচে—কিছুটা লজ্জায়। অগত্যা উঠলো হট্‌লগর। খেতে বসলো তিন ভাগ করে। খেতে খেতে কিন্তু ওরা কথা বলে বহুদিনের পরিচিত বন্ধুর মতো। মেয়েটাকে ভালো লাগছে হট্‌লগরের।

কম্‌লা জিজ্ঞেস করলো, 'ঘরে রেঁধে দেয় কে?'

'নিজেই রাঁধি।'

'বহিন, মা—কেউ নাই?'

'না।'

'তবে তো বড় কষ্ট। তোমার জমি, ঘর, গাড়ি, গোরু সব

আছে—শুধু, একটা মেয়েলোক নাই। বেশ শক্ত, কাজের মেয়ে দেখে সাদি কর মাতবর।'

'হুঁ'

তারপর চুপচাপ কেটে যায় কিছুক্ষণ। দু-জনেই তলিয়ে যায় যেন নিজের কথার মধ্যে।

কম্‌লা বললে, 'আমি যে কী করি!'—বলে সাগ্রহে তাকালো সে হট্‌লগরের মুখের দিকে। হট্‌লগর কিছুই বললে না।

খাওয়া শেষ করে গাছের ছায়ায় শুয়ে পড়েছিল হট্‌লগর। তন্দ্রার মতো এসে গিয়েছিল একটু। চট্ করে ভেঙে গেল সেটুকু। হঠাৎ মনে হলো তার—কড়াই, ঘটি, থালা নিয়ে কম্‌লা গেছে ধুতে—আধমরা সোঁতায়—অনেকক্ষণ। তার ভাইটাকেও দেখা যাচ্ছে না ধারে-পাশে। সব নিয়ে সরে পড়লো না তো মেয়েটা? ধড়মড়িয়ে উঠে পড়লো সে। এগিয়ে গিয়ে তাকালো পোলের নীচে। থমকে দাঁড়ালো কয়েক মুহূর্তের জন্যে। কম্‌লা গা ধুচ্ছে। পরনের কাপড় পড়ে আছে ওপরে—নেমেছে সে আধমরা সোঁতায়! সারা গায়ে জল ছিটোচ্ছে সে পাখীর মতো। নগ্ন অনাবৃত নিটোল দেহ—হাত নাড়ার সঙ্গে সঙ্গে নেচে উঠছে তার কর্মঠ দেহের পেশীগুলো! উথলে উথলে উঠছে তার যৌবনপুষ্ট দেহ। হট্‌লগর ফিরে এলো গাছতলায়। শুয়ে পড়লো আবার—নিশ্চিন্তে। যাক—মেয়েটা পালাযনি তা হলে। চিত হয়ে শুয়ে চোখ বুজলো আবার।

হট্‌লগরের থালা-বাসন সাফ করে গা ধুয়ে গাছতলায় ফিরে এলো কম্‌লা। গাড়ির ভেতরে বাসনগুলো গুছিয়ে রাখলো পরিপাটি করে। হটলগর চোখ বুজেই পড়ে আছে। মুখে, গলায় গাছপালার আড়াল দিয়ে এক চিলতে রোদ এসে পড়েছে। লোকটা ঘুমুচ্ছে : কম্‌লা দেখলো। ভেজা কাপড় একটা শুকোতে দেওয়া ছিল হটলগরের। এখন শুকিয়ে গেছে। সেটা খুলতে লাগলো কমলা গাছের ঝুরি

থেকে। আবার ছ্যাঁৎ করে উঠলো বুকটা হটলগরের—পিট-পিট করে চেয়ে দেখলো ঃ কাপড়টা পরে বসবে নাকি মেয়েটা অথবা সরে পড়বে নিয়ে! না। কাপড়টা অন্য দিক দিয়ে ঘুরিয়ে বাঁধলো আবার কম্‌লা। হট্‌লগরের মুখের ওপর এসে-পড়া রোদটুকু বন্ধ হয়ে গেল।

তারপর কম্‌লা এসে বসলো গাছের তলায়। বসে রইলো চুপ করে। চেয়ে আছে পোড়া প্রান্তরের দিকে, যেন ভাবছে। ওই রকম অথৈ শূন্যের মধ্যে যেন কুল-কিনারা পাচ্ছে না কিছু।

হট্‌লগর চোখ বুজে ভাবতে লাগলো, মেয়েটা জিজ্ঞেস করবে আবার হয়তো—কি করবে সে তাহলে ? কোথায় যাবে ?

কিন্তু সে আর কিছুই জিজ্ঞেস করলো না। হট্‌লগর উঠে জিনিস-পত্র গুছলো, হিসেব করলো। সব ঠিক আছে।

কম্‌লা ঝুরি থেকে কাপড়টা গুছিয়ে এনে দিল। বললে, 'তোমার কাপড়।'

ঠিক। ভুলে গেছলো হট্‌লগর।

নাঃ, মেয়েটা ভালোই! খারাপ মতলব নাই।

সূর্য ঢলে পড়েছে একেবারে পশ্চিম দিগন্তে। ট্রেন আসবার সময় হলো। হট্‌লগর গোরু দুটোকে জোয়ালে বাঁধলো একে একে। তারপর শেষবার চারদিকে একবার চোখ চারিয়ে দেখে নিল—কিছু পড়ে রইলো কি-না। আর কেমন একটা অস্বস্তি বোধ করতে লাগলো মনে মনে।

এমন সময় মেয়েটা কথা কয়ে উঠলো আবার ঃ

'আমিও চলে যাই আবার খড়গপুরে—না হয় খাদে। যা হয় হবেক।'

ভাইটা ঘেঁসে বসেছে আবার দিদির পাশে। হট্‌লগর চুপ করে দেখলো দু-জনকে। বললে, আস্তে আস্তে, 'ভগমান করুক, তোর ভাল কাম জুটে যাক একটা।'—তারপর চুপ করে গেল। আর কি

বলবে সে—একটা শুভেচ্ছা জানানো ছাড়া? জিভে চুক-চুক করে শব্দ করলোঃ গোরু দুটো চলতে সুরু করলো। দু-পা এগিয়ে হট্‌লগর মুখ ফিরিয়ে বললে আবারঃ

'যাই আমি। রেল গাড়ি এসে পড়বেক।'—

হট্‌লগরের গাড়ি চলতে শুরু করলো ষ্টেশনমুখো। আরও একবার পেছন ফিরে তাকালো হট্‌লগর কিছুটা গিয়ে। কম্‌লা আর তার ভাই চলতে শুরু করেছে পুব মুখো। খড়গপুর।—ক্লান্ত, মন্থর।

না—গরু দুটোকে আর পেটায় না সে ক্ষেপে। সে-ও যেন ক্লান্ত হয়ে পড়েছে। গোরু দুটো গাড়িটাকে টেনে নিয়ে চলেছে ঢিকিয়ে ঢিকিয়ে। হট্‌লগর চেয়ে আছে তীব্র চোখে রেল লাইনের দিকে। ধোঁয়া দেখা যাচ্ছে যেন অনেক দূরে।

লালাজী আসবে। তার মনিব। শহরে মাল করতে গেছে—ফিরে আসবে মাতোয়ারা হয়ে। সুতো আর কাপড়ের মস্ত কারবার তার। কারবার থেকে হয়েছে তালুক-জমিদারী, ফাঁপাই মহাজনী। শহর থেকে ফিরে আসে মদে চুর হয়ে—গাড়িতে বসে আরও মাতোয়ারা হয়। ষ্টেশন ঘেঁসা কসবী গ্যাঙ-এর বুনো টঙগুলো থেকে টেনে নিয়ে আসে নাগপুরী হাঘরেদের কোনো একটা বেপরোয়া যুবতী মেয়েকে—গোরুর গাড়িতে চলে ফুর্তি করতে করতে। আর দরাজ হাতে মদের বোতল উপুড় করে দেয় মাঝে মাঝে হট্‌লগরের আঁজলাতেঃ

'পিয়ো—তোম ভি পিয়ো বেটা।'

তারপর জড়িত কণ্ঠে দিল্‌দরিয়া ভাবে হট্‌লগরকে ফি-বারই দানপত্র করে পাঁচ বিঘা জল জমি, বাস্তু, এই গাড়ি, গোরু—মায় সাদি পর্যন্ত। কখনো বা অপুত্রক লালাজীর একমাত্র ধর্মপুত্র হওয়ার আশ্বাসঃ 'দিল যব খুল যায় রূপেয়া পইসা ক্যা চিজ হট্‌লগর!'

সেই লালাজীর জন্যে ওত পেতে অপেক্ষা করে আজ হট্‌লগর। ট্রেন আসছে না। অসহিষ্ণু হয়ে ওঠে আজ।

খানিক বাদে ট্রেন এলো। গোধূলির আকাশ তখন কালো হয়ে এসেছে। যথারীতি মাতোয়ারা হয়ে গোরুর গাড়িতে এসে উঠলো লালাজী—সঙ্গে হাঘরেদের মেয়ে পুন্নি। লালাজী ঢলানো গলায় বললে, 'চল বে হটলগর।'

'আমি যাবনি! লিয়ে যা তোর গাড়ি। আমি চলে যাব।' গোঁয়ারের মত বলে উঠলো হট্‌লগর সহসা। বহুদিন পরে।

'আহ্‌হা! গোসা হৈল হট্‌লগর। কেয়া হুয়া?'

'ঝুটমুট বাত বলিস তুই। জমি দিবি বল্লি, গোরু দিবি, ঘর দিবি, সাদি—'

'আহ্‌হা! লে লে মেজাজ ঠাণ্ডা কর্ বেটা। সব দিব। দিল্ যব খুল যায়—' বলে একটা মদের বোতলই গুঁজে দিলে লালাজী হট্‌লগরের হাতে, 'পিয়ো।'

ক্ষেপে ছুঁড়ে ফেলে দেয় বোতলটা হঠাৎ হট্‌লগর। বললে, 'ঝুটমুট বাত। মোর বাপকে বলেছিলি এই বাত—মোকে বলছিস দেড় কুড়ি ছু বছর ধরে।'

তার রাগ আর কথা শুনে খিক্-খিক্ করে হেসে উঠল পুন্নি। ঢলে পড়ল লালাজীর গায়ে, 'হায় লালাজী!'

লালাজীর চোখের ইঙ্গিতে মেয়েটা তারপর ঢলে আসে হট্‌লগরের দিকে—দু-হাত মেলে। মাতোয়ারা হয়ে গেছে মেয়েটা। কিন্তু হঠাৎ হট্‌লগরের ক্ষেপে যাওয়া ধাক্কায় ছিটকে পড়লো এসে আবার লালাজীর কোলের উপরে। হাউমাউ করে উঠলো অন্ধকারে।

লালাজী ভয়ে ভয়ে তাকালো হট্‌লগরের দিকে। ক্ষেপে গেছে। ফুঁসে উঠেছে বত্রিশ বছরের অপেক্ষমান শান্ত মানুষটা আজ বুনো ভঁইসের মতো, 'ঝুট বলেছিস তু মোকে—ঝুটমুট।'

লালাজী পুন্নির আড়ালে ভয়ে আর্তনাদ করে উঠলো হঠাৎঃ ক্ষ্যাপা বুনো ভঁইসটা এগিয়ে আসছে।

তারপর কি ভেবে হঠাৎ মুখ ঘুরিয়ে চলে গেল সে রাগে গর্‌গর্‌ করতে করতে। সিধে—পুব মুখো, যেদিকে একলা চলে গেছে কম্‌লা।

কতদূর যেতে পারে--কতদূরই বা গেছে সেই মেয়েটাঃ যার একটা মরদ দরকার, সাহস দরকার—সঙ্গী দরকার তার একলা মেয়ে লোকের জীবনে !--

লাইসেন্স

সাদাত হোসেন মন্টো

অব্বু কোচওয়ান ছিল খুবই সুপুরুষ। তার টাঙ্গার ঘোড়াও ছিল শহরের এক নম্বর ঘোড়া। যে-সে সওয়ারী সে কখনও নিত না। বাঁধা ধরা খদ্দের ছিল। এই বাঁধা-ধরা খদ্দেরদের কাছ থেকে সে দিনে দশ-পনেরো টাকা পেত। অব্বুর কাছে তাই যথেষ্ট। অন্যান্য কোচওয়ানদের মতো নেশা-ভাঙ সে করত না। সব সময় পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন জামা-কাপড় পরে সেজে-গুজে থাকতে খুব পছন্দ করত।

তার টাঙ্গা যখন ঘুংঘুরের আওয়াজ তুলে রাস্তা দিয়ে চলে যেত তখন আপনা-আপনি সবার চোখ তার টাঙ্গার ওপর গিয়ে পড়ত। 'ঐযে, ফুলবাবু অব্বু যাচ্ছে। দেখ কেমন ডাঁট নিয়ে বসে আছে। পাগড়িটা দেখ, কেমন তেরছা করে বেঁধেছে!'

লোকের মুখের এই ভাষা যখন অব্বু শুনত, তখন তার ঘাড়টা এক আভিজাত্যবোধে ফুলে উঠত এবং তার ঘোড়ার চালও আরও আকর্ষণীয় হয়ে উঠত। ঘোড়ার লাগাম অব্বুর হাতে এমন কায়দায় ধরা থাকত, যেন তা ধরার কোন প্রয়োজনই নেই। মনে হত, ঘোড়া যেন বিনা ইশারায় চলেছে। তার মালিকের হুকুমের কোন প্রয়োজন নেই। কখনও কখনও এমন মনে হত যে অব্বু আর তার ঘোড়া চুন্নী যেন অভিন্ন। যেন পুরো টাঙ্গাটাই একটি জীবন। আর এই জীবন অব্বু ছাড়া আর কে হতে পারে!

যে সব সওয়ারীদের অব্বু নিতে অস্বীকার করত তারা মনে মনে অব্বুকে গালি দিত। কেউ কেউ আবার অভিশাপও দিত,—'ভগবান করে এর অহঙ্কার নষ্ট হয়। টাঙ্গা ঘোড়া যেন নদীতে পড়ে।'

অব্বুর ঠোঁটের ওপর যে হাল্কা-হাল্কা গোঁফের রেখা ছিল, তাতে আত্মবিশ্বাসের এক মিষ্টি হাসি লেগে থাকত। তাকে দেখে কোন কোন কোচওয়ান জ্বলে-পুড়ে মরত। অব্বুর দেখাদেখি কয়েকজন কোচওয়ান এদিক-সেদিক থেকে ধার-দেনা করে টাঙ্গা বানাল। টাঙ্গাকে পিতলের সাজ দিয়ে সাজাল। কিন্তু তবু তাদের টাঙ্গা অব্বুর সাজ-বাটের কাছে দাঁড়াতে পারল না। তাদের টাঙ্গা ঘোড়ার চেয়ে অব্বুর টাঙ্গা-ঘোড়াকে লোকে বেশী পছন্দ করত।

একদিন দুপুরে অব্বু এক গাছের ছায়ায় তার ঘোড়াকে বেঁধে টাঙ্গার ওপর বসে একটু ঝিমোচ্ছিল, এমন সময় একটি শব্দ তার কানের কাছে গুনগুন করে উঠল। অব্বু চোখ মেলে তাকাল। দেখল, একজন মহিলা টাঙ্গার পাশে দাঁড়িয়ে আছে। অব্বু এক ঝলক তাকে দেখে নিল। মহিলার উচ্চারিত যৌবন তার হৃদয়কে এফোঁড়-ওফোঁড় করে দিল। মহিলা বলা উচিত নয়, ষোল-সতেরো বছরের এক তরুণী। ছিপছিপে কিন্তু সুগঠনা। উজ্জ্বল শ্যামবর্ণ। কানে রূপোর ছোট ছোট দুল। সোজা সিঁথি। তীক্ষ্ণ নাক। আর নাকের ডগায় উজ্জ্বল একটি তিল। পরনে লম্বা কামিজ আর নীল রঙের গারারা। মাথায় ওড়না।

মেয়েটি তরুণ-কণ্ঠে অব্বুকে জিজ্ঞেস করল, 'এই, স্টেশন যেতে কত নেবে?'

অব্বুর ঠোঁটের মুচকি হাসি এক নিমেষে দুষ্টুমির হাসিতে পরিণত হল। বলল, কিচ্ছু লাগবে না।

মেয়েটির শ্যামবর্ণ মুখের ওপর লালিমা ছেয়ে গেল,—'কত নেবে স্টেশন যেতে?'

অব্বু তার চোখ দিয়ে তাকে অবগাহন করতে করতে বলল, 'তোর কাছ থেকে আমি কি নেব রে! চলে আয়—টাঙ্গাতে বস্।'

মেয়েটি সন্ত্রস্ত হয়ে তার হাত দুটি নিজের সুডৌল বুকের ওপর রেখে যতটুকু সম্ভব ঢাকার চেষ্টা করল। 'তুমি কেমন ধরনের কথা বল?'

অব্বু হেসে বলল, 'আয়, উঠে বস। তুই যা দিবি তাই নিয়ে নেব।'

মেয়েটি একটু চিন্তা করল। তারপর পাদানিতে পা দিয়ে টাঙ্গাতে উঠে বসে বলল, 'জলদি স্টেশনে নিয়ে চল।'

অব্বু পেছন ফিরে তাকিয়ে বলল, 'তোর খুব জলদি আছে, তাই না!'

'হায়, হায়, তুই ....' মেয়েটি আরও কিছু বলতে গিয়ে থেমে গেল।

টাঙ্গা ছুটতে লাগল——ছুটতেই লাগল। ঘোড়ার খুরের নাচ দেখতে দেখতে কয়েকটি রাস্তা ছুটে পার হয়ে গেল। মেয়েটি লজ্জায় জড়-সড় হয়ে বসে রইল। অব্বুর ঠোঁটে দুষ্টু দুষ্টু হাসি ঝিলিক দিচ্ছিল। বেশ দেরী হয়ে যাচ্ছিল বলে মেয়েটি ভয়ার্ত কণ্ঠে তাকে জিজ্ঞেস করল, 'স্টেশন এখন পর্যন্ত আসেনি?'

অব্বু বেপরোয়া ভাবে উত্তর দিল, 'এসে যাবে। তোর-আমার স্টেশন তো একই।'

'মানে?'

অব্বু পেছন ফিরে মেয়েটির দিকে তাকিয়ে বলল, 'তুই কি এতটুকু বুঝিস না, তোর-আমার একই স্টেশন! অব্বু যখন তোকে দেখেছে তখনই এক হয়ে গিয়েছে। তোর জানের কসম, তোর গোলাম ঝুট বলছে না।'

মেয়েটি তার মাথার ওড়না টেনে দিল। ওর চোখই ওকে বলে দিচ্ছিল অব্বু কী বলতে চায় তা ও বুঝে ফেলেছে। তার মুখ

দেখে মনে হচ্ছিল অব্বুর কথায় সে একটুও ক্ষুণ্ণ হয়নি। কিন্তু তার দ্বিধা ছিল দু'জনের স্টেশন এক হোক আর না হোক, অব্বু তো সুন্দর। কিন্তু বিশ্বাসের মর্যাদা রাখবে তো অব্বু? স্টেশনে গিয়ে আর কি হবে, তার গাড়ি কখন চলে গিয়েছে কে জানে।'

অব্বুর প্রশ্নে সে হঠাৎ চমকে উঠল, 'কি এতো ভাবছিস?'

ঘোড়া বেশ মেজাজে দুল্‌কি চালে চলছিল। ভিজে ভিজে হাওয়া বইছিল। রাস্তার দু' ধারের গাছগুলি ছুটে ছুটে চলে যাচ্ছিল। ডালগুলি ঝুঁকে ঝুঁকে ছিল। ঘুংগুরের শব্দ ছাড়া আর কোন শব্দ ছিল না। অব্বু ঘাড় ফিরিয়ে মেয়েটির শ্যামবর্ণ সৌন্দর্যকে নিজের হৃদয়ে গেঁথে নিচ্ছিল। কিছুক্ষণ পর সে জানলার একটি শিকের সঙ্গে ঘোড়ার লাগাম বেঁধে দিয়ে একলাফে পেছনের সিটে মেয়েটির পাশে গিয়ে বসল। ও চুপচাপ বসে ছিল। অব্বু ওর হাত দুটি ধরে বলল, দে, 'তোর লাগাম আমার হাতে দে।'

মেয়েটি শুধু বলল, 'ছেড়ে দে।' কিন্তু তার আগেই সে অব্বুর বাহুপাশে আবদ্ধ হল। সে কোন আপত্তি করল না। নিশ্চয়ই সেই সময় তার হৃদয় স্পন্দন দ্রুততর হয়ে উঠেছিল। যেন নিজেকে ছেড়ে তা উড়ে যেতে চাইছিল।

অব্বু ধীরে ধীরে আবেগ-জড়িত কণ্ঠে তাকে বলতে লাগল; 'এই টাঙ্গা-ঘোড়া আমার জীবনের থেকেও প্রিয়। আমি একাদশ পীরের কসম খেয়ে বলছি, এই টাঙ্গা-ঘোড়া বেচে তোর জন্যে সোনার বালা গড়ে দেব। নিজে ছেঁড়া-ফাটা কাপড় পরব, কিন্তু তোকে রাজকুমারী সাজিয়ে রাখব। ওয়াদহু লা-শরিকের কসম খেয়ে বলছি জীবনে এই আমায় প্রথম প্রেম। তুই যদি আমার না হস, তবে তোর সামনেই আমার গলা কেটে ফেলব।'

মেয়েটিকে সে নিজের বাহুপাশ থেকে মুক্ত করে দিল। বলল, 'জানি না আমার কি হয়ে গিয়েছিল। চল্, তোকে স্টেশনে ছেড়ে আসি।'

মেয়েটি ধীরে ধীরে বলল, 'না, তা আর হয় না। তুমি আমার গায়ে হাত দিয়েছ।'

অব্বুর মাথা নিচু হয়ে গেল, 'আমাকে মাফ করে দে—ভুল হয়ে গিয়েছে।'

'ভুলটাকে কি শেষ পর্যন্ত মানিয়ে নিতে পারবে?'

মেয়েটির কণ্ঠে চ্যালেঞ্জ ছিল। অব্বুকে কে যেন বলল, আদেশ করল, 'এই টাঙ্গা থেকে এগিয়ে নিয়ে যাও নিজের টাঙ্গা।' অব্বুর হেঁট মাথা সোজা হল। তার চোখ ঝিলিক দিয়ে উঠল।

অব্বু তার বলিষ্ঠ বুকের ওপর হাত রেখে বলল, 'অব্বু তোর জন্যে নিজের জান দিয়ে দিবে।'

মেয়েটি তার হাত অব্বুর দিকে প্রসারিত করে দিয়ে বলল, 'এই নে আমার হাত।'

অব্বু তার হাত দৃঢ়তার সঙ্গে চেপে ধরে বলল, 'কসম আমার যৌবনকে, অব্বু তোর গোলাম।'

পরের দিন অব্বু আর সেই মেয়েটির নিকা হয়ে গেল। মেয়েটি গুজরাটের কোন এক জেলার মুচির মেয়ে ছিল। তার নাম ছিল ইনায়ত বা নীতি। নিজের আত্মীয়দের সঙ্গে সে এখানে এসেছিল। ষ্টেশনে ওরা যখন প্রতীক্ষা করছিল তখন অব্বুর সঙ্গে তার সাক্ষাৎ হয়। আর এই সাক্ষাৎই সঙ্গে সঙ্গে ভালোবাসার প্রাসাদ গড়ে তোলে। অব্বু টাঙ্গা-ঘোড়া বেচে দিয়ে যদিও নীতির জন্যে কোন সোনার বালা গড়ে দেয়নি, কিন্তু তার জমানো টাকা দিয়ে সে তার জন্যে সোনার দুল কিনেছিল। রেশমের কয়েকটি জামা-কাপড়ও তৈরি করেছিল।

রেশমী জামা-কাপড় পরে সে যখন অব্বুর সামনে এসে দাঁড়াত তখন তার হৃদয় নেচে উঠত,—'কসম পবিত্র পঞ্জতনের নামে, দুনিয়াতে আমার চেয়ে খুশীতে পাগল মানুষ আর দুটি নেই।' নীতিকে সে তার বুকে জড়িয়ে বলত, 'তুই আমার দিল্ কী রাণী।'

দুজনেই যৌবনের পাগলামিতে একেবারে ডুবে ছিল। গাইত, হাসত, ঘুরে বেড়াত আর দুজন দুজনের শুভ কামনা করত। এক মাস এমনি ভাবে কেটে গেল। কিন্তু একদিন হঠাৎ পুলিশ এসে অব্বুকে গ্রেফতার করল। নীতিকেও ধরে নিয়ে গেল। অব্বুর ওপর অপহরণের মামলা চলল। নীতি একটুও টলল না। কিন্তু তা সত্ত্বেও অব্বুর দু বছরের কারাদণ্ড হল। আদালত যখন এই ফরমান দিল, তখন নীতি অব্বুকে জড়িয়ে ধরল। কাঁদতে কাঁদতে সে শুধু বলল, 'আমি আমার মা-বাবার কাছে যাব না—ঘরে বসে তোমার জন্যে অপেক্ষা করব।'

অব্বু তার পিঠে চাঁটি মেরে বলল, 'বেঁচে থাক্,—টাঙ্গা ঘোড়া আমি দীনার জিম্মায় রেখে গেলাম—ভাড়া ওসুল করে নিস।'

নীতির বাবা-মা তাকে অনেক বোঝাল, কিন্তু ও কিছুতেই তাদের সঙ্গে গেল না। ক্লান্ত হয়ে অবশেষে তার হাল ছেড়ে দিল। নীতি একাই থাকতে লাগল। সন্ধ্যার সময় দীনা তাকে পাঁচ টাকা করে দিয়ে যাচ্ছিল। এই পাঁচ টাকা তার খরচ-খরচার পক্ষে যথেষ্ট ছিল। আর তাছাড়া মোকদ্দমার জন্যে প্রতিদিন পাঁচ টাকা থেকে খরচ করে যা বাঁচত তাও ওর কাছেই ছিল।

সপ্তাহে একবার জেলখানায় নীতি আর অব্বুর দেখা-সাক্ষাৎ হত। এই সময়টুকু ছিল ওদের কাছে খুবই সংক্ষিপ্ত। নীতির কাছে যতটুকু জমা টাকা ছিল তা অব্বুর আরামের জন্যে খরচ হয়ে গেল। এক দিন সাক্ষাৎকারের সময় অব্বু নীতির খালি কানের দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করল, 'নীতি, তোর কানের দুল কোথায়?'

নীতি হেসে ফেলল। হেসে শান্ত্রীর দিকে একবার তাকিয়ে অব্বুকে বলল, 'চুপ করে গেলে কেন?'

অব্বু বেশ কিছুটা রুষ্ট হয়ে বলল, 'আমার কথা তোকে এত ভাবতে হবে না। যেভাবেই থাকি না কেন ভালোই আছি।'

নীতি কোন জবাব দিল না। সময়ও শেষ হয়ে গিয়েছিল। হাসতে

হাসতে সে জেল থেকে বেরিয়ে এল। কিন্তু বাড়িতে এসে কান্নায় ভেঙে পড়ল নীতি। অনেক—অনেকক্ষণ ধরে কাঁদল, কারণ অব্বুর শরীর একেবারে ভেঙ্গে গিয়েছিল। এবারের সাক্ষাতের সময় ও অব্বুকে প্রায় চিনতেই পারছিল না। দোহারা চেহারার অব্বু ভেঙে অর্ধেক হয়ে গিয়েছিল। নীতির মনে হচ্ছিল অব্বুকে অব্বুর দুঃখই কুরে কুরে খাচ্ছে। তার বিচ্ছেদই অব্বুকে এমন করে দিয়েছে। কিন্তু সে জানত না অব্বুকে ক্ষয়রোগে ধরেছে। এ অসুখ সে উত্তরাধিকার সূত্রে পেয়েছে। অব্বুর বাবা অব্বুর চেয়ে বলিষ্ঠ ছিল, কিন্তু ক্ষয়রোগ তাকেও অল্প দিনের মধ্যে কবরে নিয়ে গিয়েছিল। অব্বুর বড় ভাইও সুন্দর জোয়ান ছিল। কিন্তু পরিপূর্ণ যৌবনে এই অসুখ তাকেও পিষে মারে। কিন্তু অব্বু এ ব্যাপারে সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞ ছিল। তাই জেলের হাসপাতালে সে যখন শেষ নিঃশ্বাস নিচ্ছিল, ক্ষোভে দুঃখে সে বলল, 'ওয়াদহু লা শরিকের কসম খেয়ে বলছি, যদি জানতাম এত তাড়াতাড়ি মারা যাব তবে তোকে কখনও বিবি করতাম না—আমি তোর ওপর জুলুম করেছি—আমাকে মাফ করে দে—আর আমার এক নিশানা আছে—আমার টাঙ্গা ঘোড়া---একটু নজর দিস—আর চুন্নীর বেটার মাথায় হাত বুলিয়ে বলিস, অব্বু তোকে ভালোবাসা পাঠিয়েছে।

অব্বু মারা গিয়েছিল—সঙ্গে সঙ্গে নীতিরও সব কিছু মারা গিয়েছিল। কিন্তু ও ছিল সাহসী মহিলা। এই দুঃখকে সে সহ্য করে নিয়েছিল। ঘরে একা একা পড়ে থাকত। সন্ধ্যার সময় দীনা আসত। তাকে ভরসা দিয়ে বলত, 'কোন কিছু ভেব না ভাবী, খোদার আগে কারও হাত নেই। অব্বু আমার ভাই ছিল—আমার পক্ষে যা করা সম্ভব, খোদার হুকুমে আমি তা করব।'

প্রথম প্রথম নীতি কিছুই বুঝতে পারত না। কিন্তু যখন শোকের দিন পুরো হল, তখন দীনা খোলাখুলি তাকে বিয়ে করতে বলল। দীনার কথা শুনেই নীতির মনে হল ওকে ঘাড় ধাক্কা দিয়ে বাইরে

বের করে দেয়। দীনাকে শুধু সে বলল, ভাই, আমি বিয়ে করব না।

সেই দিন থেকেই দীনার ব্যবহারও পাল্টে গেল। আগে প্রতিদিনই সন্ধ্যায় পাঁচ টাকা আদায় হত। এখন কোন দিন চার টাকা, কোন দিন তিন টাকা করে দিতে লাগল। বাহানা দিতে লাগল, খুব মন্দা চলছে। আবার কখনও কখনও দু-দু, তিন-তিন দিন বেপাত্তা হয়ে থাকতে লাগল। কখনও বলত অসুখ করেছে, কখনও বাহানা দিত গাড়ি খারাপ হয়ে গিয়েছে সেজন্যে ঘোড়া জুততে পারিনি। ব্যাপারটা যখন নীতি বুঝতে পারল, তখন সে দীনাকে বলল. ভাই দীনা, তোমার আর হয়রান হওয়ার প্রয়োজন নেই। টাঙ্গা-ঘোড়া আমাকে জমা দিয়ে যাও।

অনেক টালবাহানার পর মুখ কাচুমাচু করে 'সে টাঙ্গা এবং ঘোড়া নীতিকে ফেরত দিল। যাওয়ার সময় দীনা মাঝেকে দিয়ে গেল। মাঝে ছিল অব্বুর বন্ধু। সেও কয়েকদিন পরে নীতির কাছে বিয়ের প্রার্থনা করল। নীতি অস্বীকার করলে তার চোখের ভাষাও পাল্টে গেল। সব সহানুভূতি উবে গেল। তার কাছ থেকেও নীতি টাঙ্গা-ঘোড়া ফেরত নিয়ে নিল এবং এক অচেনা কোচওয়ানকে দিল।

এক সন্ধ্যায় সে যখন পয়সা দিতে এল তখন সে নেশায় বুঁদ ছিল। দরজার পা দিয়েই সে নীতির গায়ে হাত দেওয়ার চেষ্টা করল। নীতি তাকে খুব একচোট নিল এবং কাজ থেকে ছাড়িয়ে দিল।

আট দশ দিন টাঙ্গা-ঘোড়া এমনিই আস্তাবলে পড়ে রইল। ঘাস এবং দানার খরচ ছাড়াও আস্তাবলের ভাড়া ছিল। নীতি এক অদ্ভুত চিন্তায় দিন কাটাচ্ছিল। কেউ বিয়ের প্রার্থনা করে, কেউ অসম্মতির ওপর হাত লাগানোর চেষ্টা করে, কেউ পয়সা মেরে দেয়। বাইরে বের হলে মানুষ খারাপ নজরে ঘুরে ঘুরে দেখে। এক রাতে তার এক প্রতিবেশী দেয়াল টপকে তার ঘরে এল এবং তার গায়ে

হাত দিল। ভাবতে ভাবতে নীতির পাগল হয়ে যাবার উপক্রম, এখন সে কি করে।

একদিন বসে ভাবতে ভাবতে তার মাথায় এল, আমি কেন নিজেই টাঙ্গা জুতি না—নিজেই চালাই। যখন সে অব্বুর সঙ্গে বেড়াতে বের হত তখন তো সে নিজেই টাঙ্গা চালাত। শহরের রাস্তা-ঘাটও তো জানা। কিন্তু সে আবার ভাবল, লোকে কি বলবে? তার মন এবং চেতনাই তাকে উত্তর জোগাল,—তাতে কি হয়েছে, মেয়েরা মেহনত করে রোজগার করে,—কয়লার খনিতে কাজ করে, অফিসে দপ্তরে কাজ করে, ঘরে বসেও কাজ করার মেয়েতো হাজার হাজার আছে। যেমন করেই হোক পেট চালাতে হবে।

কয়েক দিন ধরে নীতি চিন্তা-ভাবনা করল। শেষে সে ঠিক করল, টাঙ্গা সে নিজেই চালাবে। খোদার নাম নিয়ে সে আস্তাবলে গেল। তাকে টাঙ্গা জুততে দেখে সমস্ত কোচওয়ানরা স্তম্ভিত হয়ে রইল। কেউ মজার ব্যাপার ভেবে খুব একচোট হাসল। যারা বয়স্ক ছিল তারা নীতিকে এ কাজ না করার জন্যে বোঝাল। এ ঠিক নয়। কিন্তু নীতি তাদের কথায় কান দিল না। টাঙ্গা ঠিক-ঠাক করে নিল। পিতলের তকমাগুলি পরিষ্কার করে ঘোড়াকে খুব আদর করল, আর অব্বুর সঙ্গে মনে মনে ভালোবাসার কথা বলতে বলতে আস্তাবলের বাইরে বেরিয়ে এল। কোচওয়ানরা আশ্চর্য হয়ে গিয়েছিল টাঙ্গা চালানোর কৌশলে নীতির নিপুণ হাত দেখে।

শহরে হৈ-চৈ পড়ে গেল, এক সুন্দর মেয়েমানুষ টাঙ্গা চালাচ্ছে। সমস্ত জায়গায় শুধু এই একই আলোচনা চলছিল। লোক এই আলোচনা শুনছিল আর প্রতীক্ষা করছিল কখন এই রাস্তা দিয়ে ও টাঙ্গা ছুটিয়ে যাবে।

প্রথমে প্রথমে পুরুষ সওয়ারীরা টাঙ্গায় উঠতে দ্বিধা করছিল, কিন্তু অল্প দিনেই সে দ্বিধা দূর হয়ে গেল। এবং খুব রোজগার হতে

লাগল। এক মিনিটের জন্যেও নীতির টাঙ্গা খালি থাকত না। এক সওয়ারী নামতে না নামতেই আর একজন উঠে বসত। কে তাকে প্রথম ডেকেছে তাই নিয়ে কখনও কখনও সওয়ারীদের মধ্যে লড়াই পর্যন্ত হয়ে যেত।

কাজের চাপ যখন বেড়ে গেল তখন নীতি টাঙ্গা চালানোর সময় ঠিক করে নিল। সকাল সাতটা থেকে দুপুর বারোটা পর্যন্ত, এবং দুটো থেকে সন্ধ্যা ছটা পর্যন্ত। এই সময়টুকুই তার নিজের কাছে সুখকর মনে হত। চুন্নীও খুশী ছিল। ও কিন্তু অনুভব করতে লাগল অধিকাংশ মানুষই তার নৈকট্যতার জন্যে টাঙ্গায় চড়ত। বিনা উদ্দেশ্যে তাকে এদিকে-ওদিকে নিয়ে যেত। নিজেদের মধ্যে কুৎসিত ঠাট্টা তামাশা করত। শুধু তাকে শোনানোর জন্যেই এসব কথা বলত। তার মনে হতে লাগল সে নিজেকে না বেচলেও মানুষ চুপে চুপে তাকে কেনা-কাটি করছে। তা ছাড়া সে জানত শহরের সমস্ত কোচওয়ানরা তাকে ভালো চোখে দেখছে না। এসব জানা সত্ত্বেও সে এতটুকু উৎকণ্ঠ ছিল না। নিজের আত্ম-বিশ্বাসের জন্যে সে সন্তুষ্ট ছিল।

একদিন মিউনিসিপ্যাল কমিটি নীতিকে ডেকে পাঠাল এবং তার লাইসেন্স কেড়ে নিল। কারণ হিসেবে বলল, মেয়েমানুষ টাঙ্গা চালাতে পারে না। নীতি জিজ্ঞেস করল, জনাব, মেয়ে মানুষ টাঙ্গা কেন চালাতে পারবে না ?

কমিটি জবাব দিল, আইন যা আইন। আইন বলছে চালাতে পারে না, তোমার লাইসেন্স বাজেয়াপ্ত।

নীতি বলল, হুজুর, আপনি টাঙ্গা ঘোড়াও বাজেয়াপ্ত করে নিন। কিন্তু আমাকে অন্তত এইটুকু বলুন, মেয়েমানুষ কেন টাঙ্গা জুততে পারবে না ? মেয়েরা চরকা চালিয়ে পেট চালাতে পারে, টুকরি বয়ে রোজগার করতে পারে ; লাইনের ওপর কয়লা কুড়িয়ে নিজের পেটের জন্যে খাবার সংগ্রহ করতে পারে, তবে আমি কেন টাঙ্গা

চালাতে পারব না ? আমি আর কোন কাজ জানি না। টাঙ্গা-ঘোড়া আমার স্বামীর। কেন আমি তা চালাতে পারব না ? হুজুর, আপনি দয়া করুন। মেহনত মজদুরি আপনি কেন বন্ধ করে দিচ্ছেন ? আমি কি করব ? আমাকে বলে দিন।

অফিসার বলল, যাও, বাজারে গিয়ে বস। ঐখানে ভালো কামাই হবে।

অফিসারের কথা শুনে নীতির ভেতর যে আসল নীতি ছিল তা জ্বলে ছাই হয়ে গেল। খুব ধীরে ধীরে 'আচ্ছা জী' বলে ও বেরিয়ে এল। জলের দামে টাঙ্গা-ঘোড়া বিক্রি করে দিয়ে সে সোজা অব্বুর কবরের কাছে গেল। কিছুক্ষণ নিস্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে রইল। ওর চোখের জল একেবারে শুকিয়ে গিয়েছিল—যেমন বর্ষার পর প্রচণ্ড রৌদ্রের তাপ খেতের নরম ভাবকে শুকিয়ে দেয়। ওর বন্ধ ঠোঁট খুলে গেল। কবরকে সম্বোধন করে বলল, অব্বু তোর নীতি আজ কমিটির দপ্তরে মারা গিয়েছে।

শুধু এইটুকু বলে সে চলে এল। পরের দিন সে আর্জি পেশ করল। নিজের দেহ বেচার লাইসেন্সও সে পেয়ে গেল।

অনুবাদ | কমলেশ সেন

ম্যাক্সিম গোর্কি/রাশিয়া

নিপীড়িত মানুষের সর্বাধিক প্রিয় লেখক। গোর্কির পরিচয় জ্ঞাপন করা যতটা নিষ্প্রয়োজন, একটি পৃষ্ঠার ভগ্নাংশিক পরিসরে তা বিবৃত করা ততটাই দুঃসাধ্য।

জারোস্লাভ হাসেক/চেকোস্লোভাকিয়া

সত্তরটি ভাষায় অনূদিত 'গুড সোল্‌জার শোয়াইক্' নামক যুদ্ধবিরোধী উপন্যাসের জন্য প্রসিদ্ধ। চেক নাগরিক হলেও ১৯১৭-য় অক্টোবর বিপ্লবে অংশগ্রহণ করেন। ক্ষুরধার ব্যঙ্গ তাঁর অস্ত্র আর শত্রু—সামাজিক দুর্নীতি ও বিভেদ, শোষণ ও নিপীড়নমূলক ব্যবস্থা আর তার স্রষ্টিকর্তারা। 'ট্যুরিস্ট গাইড' নামে গল্প সঙ্কলন থেকে সঙ্কলিত গল্পটি গৃহীত।

জ্যাক লণ্ডন/আমেরিকা

আমেরিকার প্রথম বিদ্রোহী সমাজতান্ত্রিক লেখক। রুদ্র প্রকৃতি ও সামাজিক দুঃশাসনের মুখে মানুষের ও জীবনের জয়গান তাঁর রচনার উপজীব্য। উল্লেখযোগ্য উপন্যাস—'মার্টিন ইডেন', 'আয়রন্ হিল্', 'বার্নিঙ ডে লাইট' ইত্যাদি। বাঙলা ভাষায় লভ্য 'জ্যাক লণ্ডনের শ্রেষ্ঠ গল্প'।

ব্রুনো আপিৎজ্/জার্মানী

সমাজতান্ত্রিক জার্মানীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ সাহিত্যিক। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের কালে কনসেনট্রেশান ক্যাম্পের ভয়ঙ্কর অভিজ্ঞতাজাত 'নেকেড্ অ্যামঙ দা উলভ্‌স্' এক অনন্য স্বষ্টি। বাঙলায় 'অমৃতস্য পুত্রাঃ' নামে অনূদিত। জন্ম ১৯১০ সালে লাইপ্‌জিগ শহরে।

ভ্লাদিমির বগোমালভ/রাশিয়া

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পটভূমিতে অসংখ্য সার্থক ছোটগল্প ও কয়েকটি উপন্যাস রচনা করেছেন। বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য বিশটি ভাষায় অনূদিত ও চলচ্চিত্রায়িত 'ইভান' নামে একটি উপন্যাস। এক কিশোর বীরের আত্মোৎসর্গের জ্বলন্ত কাহিনী।

অ্যালবার্ট মাল্ট্স্/আমেরিকা

ত্রিশ দশকের প্রগতিবাদী মার্কিন লেখকদের অন্যতম। ১৯৪৭ সালে মার্কিন সরকার বিরোধী কার্যকলাপের জন্য অভিযুক্ত ও বারো বছরের জন্য নির্বাসিত। সর্বাধিক পঠিত উপন্যাস 'ক্রশ অ্যাণ্ড দা অ্যারো'। লেখকের উপন্যাস 'জীবন অদম্য' ও ছোটগল্প সঙ্কলন 'অরণ্যে এক সন্ধ্যা' বাঙলায় অনূদিত।

গী দ্য মোপাসাঁ/ফ্রান্স

বিশ্ব-সাহিত্যের অঙ্গনে ছোট গল্পকে যাঁরা দৃঢ়হস্তে বপন করেছেন তাঁদের মধ্যে অন্যতম। সমসাময়িক জীবনের বলিষ্ঠ চিত্রকর। বুর্জোয়া সমাজ ব্যবস্থার অসচেতন সমালোচক।

ডরোথি হিউয়েট/অস্ট্রেলিয়া

'ওয়েস্ট কোস্ট রাইটার্স' গোষ্ঠীর নিবেদিত প্রাণ লেখিকা। অস্ট্রেলিয়ার নিচুতলার মানুষ, বিশেষ করে উপেক্ষিত আদিবাসীরা তাঁর রচনায় বিশিষ্ট স্থানাধিকারী। 'ববিন্ আপ্' নামে উপন্যাসটি জার্মানীর 'সেভেন্ সীজ্' প্রকাশক সংস্থা কর্তৃক প্রকাশিত। একই প্রকাশনের 'অস্ট্রেলিয়ান্স হ্যাভ এ ওয়ার্ড ফর ইট্' গ্রন্থ থেকে এই সঙ্কলনের গল্পটি অনূদিত।

লি ওয়াই লুন/চীন

স্বপ্নের দেশ সমাজতন্ত্রী চীনের স্বল্পখ্যাত আধুনিক লেখক। ফরেন ল্যাঙ্গুয়েজ পাবলিশিঙ হাউস, পিকিঙ, থেকে ১৯৫৮ সালে প্রকাশিত 'ইয়ঙ কোল্ মাইনার অ্যাণ্ড আদার স্টোরিজ' নামক গল্পগ্রন্থ থেকে সঙ্কলিত গল্পটি সংগৃহীত।

বুই ন্‌গোক তান্/ভিয়েতনাম

১৯৫৮ সালে ইয়েন বাই-য়ে রচিত ও 'দা বেকন্ ব্যানার্' নামে স্থানয় থেকে প্রকাশিত প্রতিরোধ যুদ্ধের একটি গল্প সঙ্কলন থেকে সঙ্কলিত গল্পটি গৃহীত। অনবধানতা বশতঃ গল্পটি ছাপার সময় লেখকের নামটি 'অজ্ঞাত' হিসাবে মুদ্রিত হয়েছে।

সাইপ্রিয়ান এক্‌ওয়েন্‌শি/নাইজিরিয়া

নাইজিরিয়ার ছোট গল্পকার মধ্যে প্রসিদ্ধ। প্রথম জীবনে শিক্ষক, তারপর রেডিও-য় ফিচার বিভাগের কর্মী ও বর্তমানে ইন্‌ফরমেশান মন্ত্রণালয়ের ডিরেক্টার। উপন্যাসের মধ্যে 'জাগুয়া নানা' ও 'পিপ্‌ল্ অফ দা সিটি' খ্যাতি লাভ করেছে।

জেম্‌স্ ন্‌গুগি/কেনিয়া

মূল নাম ওয়া থিওঙ্গো ন্‌গুগি। আফ্রিকার অতি সাধারণ যেসব মানুষ উজ্জ্বল ভবিষ্যত সৃষ্টির কাজে মগ্ন, তাদের নিয়েই ন্‌গুগি লেখেন। সহস্র দুঃখ যন্ত্রণা সংগ্রামের মধ্যেও জীবনের প্রতি অকুণ্ঠ আস্থা ও ভালবাসাই তাঁর রচনার বৈশিষ্ট। গল্পটি 'লোটাস' পত্রিকার ২১নং সংখ্যা থেকে গৃহীত।

জেসাস কোলন/পোয়ার্তোরিকো

নিউইয়র্ক শহরের বাসিন্দা, পোয়ার্তোরিকোর অসংখ্য উদ্বাস্তু মানুষের একজন। মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের গিল্টি করা উজ্জ্বলতার নিচে স্বগৃহের অরাজক অবস্থার চিত্র তিনি এঁকেছেন 'এ পোয়ার্তোরিকান ইন্ নিউ ইয়র্ক' গ্রন্থে। গল্পটি উক্ত বই থেকে গৃহীত।

সুশীল জানা/ভারত

চল্লিশ ও পঞ্চাশ দশকের বাঙলা গদ্য সাহিত্যে আলোড়ন সৃষ্টিকারীদের অন্যতম। ১৯১৭ সালে মেদিনীপুরে জন্ম। প্রথম গল্পগ্রন্থ 'পদচিহ্ন'। প্রথম উপন্যাস 'সূর্যগ্রাস'। রূপ ও রস, তিক্ততা ও প্রতিজ্ঞভরা সংগ্রামী গ্রামজীবনের নিপুণ চিত্রকর। উল্লেখযোগ্য গল্পগ্রন্থ—শেওলা, গ্রামনগর, ঘরের ঠিকানা ও চিরদিনের গল্প।

সাদাত হোসেন মন্টো/পাকিস্থান

পাঞ্জাবের এক অখ্যাত গ্রাম সমরালাতে লেখকের জন্ম। পাঞ্জাব বিশ্ববিদ্যালয় থেকে উচ্চ শিক্ষা লাভ করে কয়েক বছর বোম্বাই-এ কাটান। দেশ বিভাগের পর তিনি লাহোরে চলে যান। সেখানেই ১৯৫৬ সালে তাঁর মৃত্যু হয়। উর্দু সাহিত্যের প্রখ্যাত গল্পকার এই নীচু তলার মানুষের লেখক। এত কাছ থেকে বোধহয় খুব কম লেখকই তাদের দেখেছেন—দেখেছেন সেই সমাজ ও তার মন। তিনি সেই মনের গভীরে ডুবুরির মতো সাঁতার দিয়ে তুলে এনেছেন অজস্র মুক্তা। রাজনৈতিক নেতা এবং তাদের ভণ্ডামি এবং ধর্মীয় গোঁড়ামিকে তিনি আঘাত হেনেছেন।